বিনির্মাণ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা সংসদের নিয়মিত প্রকাশনা

বিনির্মাণ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা সংসদের নিয়মিত প্রকাশনা

প্রথম বর্ষ ● প্রথম সংখ্যা ● ঢাকা ● নভেম্বর ২০১৯

বিনির্মাণ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা সংসদের নিয়মিত প্রকাশনা

নভেম্বর সংখ্যা, ২০১৯

সম্পাদক
কবীর হোসাইন

উপদেষ্টা পর্ষদ
অধ্যাপক ড. মোঃ আখতারুজ্জামান, উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুস সামাদ, প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমদ, প্রো-উপাচার্য (একাডেমিক), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
অধ্যাপক ড. শিবলী রুবাইয়াতুল ইসলাম, ডীন, বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
অধ্যাপক ড. এস এম জাবেদ আহমেদ, তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
অধ্যাপক ড. মো. মফিজুর রহমান, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
এ কে আজাদ, সভাপতি, ঢাকা ইউনিভার্সিটি এ্যালামনাই এসোসিয়েশন
শান্তা তাওহিদা, সহকারী অধ্যাপক, যোগাযোগ বৈকল্য বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
শাকিল মালিক, সহ-প্রতিষ্ঠাতা, গ্লোবাল সেন্টার ফর ইনোভেশন এন্ড লার্নিং, যুক্তরাষ্ট্র
কাজী সামিও শীশ, সিনিয়র রিসার্চ ফেলো, কারাস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

নামলিপি
মাসুক হেলাল

প্রচ্ছদ
মোহাম্মদ আলী

সার্বিক তত্ত্বাবধান
অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মনজুরুল করিম
অধ্যাপক ড. ফাজরীন হুদা

বিনির্মাণ সমন্বয়ক
সাইফুল্লাহ সাদেক

শুভেচ্ছা মূল্য: ১০০ টাকা

Binirman: A Regular Publication of Dhaka University Research Society (DURS)
November Issue, 2019, Editor: Kabir Hossain, Price: 100 BDT
TSC, 1st Floor, University of Dhaka
Email: duresearch16@gmail.com
Web: www.dursbd.com

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ০১

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের গবেষণা সংগঠনের যৌক্তিকতা ০২
সাইফুল্লাহ সাদেক

স্নাতক গবেষকদের জন্য অপরিহার্য ৫টি দক্ষতা ০৭
শাকিল মালিক

কেন পাকিস্তানিরা চার লক্ষ ধর্ষণ করেছিল? ১৩
আরিফ রহমান

সংস্কৃতির ব্যাপ্তি এবং আমাদের শেকড়চ্যুতি ২৩
ফারহান কবীর সিফাত

বাংলা গান সৃজনে নজরুল-বিশেষত্ব ৩০
ইদরিস আলী

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক চলচ্চিত্রে নারীর উপস্থাপন ৩৭
জান্নাতুল আনজুম অর্পি

বাংলায় পালযুগে বৌদ্ধ ঐতিহ্যের প্রভাব: একটি সমীক্ষা ৪৭
রোমানা পাপড়ি

বাংলাদেশের রাজনীতির ভাষার পটভূমি ও স্বরূপ ৫৪
মোছাঃ রেখা ইয়াসমিন

ইসলাম ও জঙ্গিবাদ ৬২
আবু সালেম হোসাইন

ধর্ম ও নৈতিকতার সন্দর্শন ও বিচারমূলক খণ্ডায়ন ৬৬
সুমাইয়া বিনতে আলী শৈলী

অস্তিত্ববাদের প্রাথমিক পাঠ ৭০
তৌকির হোসেন

দর্শন, ধর্ম ও মানবতা ৭৫
সায়মা সাদিয়া মুনা

স্বাধীনতার তথ্যচিত্র 'স্টপ জেনোসাইড' ৭৮
সাইয়্যিদ শাহজাদা আল কারীম

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পুষ্টিমান ও খাদ্যতালিকাগত অভ্যাস পরিমাপ: দুইটি আবাসিক হলের ওপর ভিত্তি করে গবেষণা ৮৪
খাদিজা তাহেরা তরী

ছাত্ররাজনীতি এবং ছাত্রসংগঠন সমূহের উপর একটি পর্যালোচনা ৯০
পলিটিক্স টিম

সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা এবং স্বতন্ত্র সত্তা বিশ্বায়নের প্রবাহে ক্রমশ ম্রিয়মান হয়ে যাচ্ছে: পর্যবেক্ষণভিত্তিক পর্যালোচনা ৯৬

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্য শিল্পের নান্দনিকতা ১০৩
নৃবিজ্ঞান টিম

সূচিপত্র

ভাষাবিজ্ঞান প্রসঙ্গে ১১০
তানজিয়া সিদ্দিকা

প্রাথমিক শিক্ষায় প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জিত হচ্ছে না কেন? ১১২
আল ফয়সাল বিন কাশেম কানন

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মধ্য দিয়ে নিরক্ষরতামুক্ত বাংলাদেশ বিনির্মাণ ১১৪
নওরীন সুলতানা

বাংলা ভাষানীতি পরিকল্পনা: একটি সমন্বিত প্রস্তাবনা ১১৭
মো. দিদারুল ইসলাম

ছোট দেশের বড় স্বপ্ন ১২১
রউফুল আলম

সত্যের অন্বেষণ: অনুসন্ধান ও গবেষণা ১২২
মোঃ ইউনুছ

হতাশায় নয়, প্রত্যাশায় বাঁচুন ১২৭
শান্তা তাওহিদা

গবেষণা ও পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে অনলাইন শিক্ষা ১৩০
জাহিদুজ্জামান

উচ্চশিক্ষায় উৎসাহীদের অনলাইনে আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ ১৩৪
জুনাইদ আল মামুন

সাক্ষাৎকার

ড. আনিসুজ্জামান ১৪০

ড. সৌমিত্র শেখর ১৪৩

অধ্যাপক মঞ্জুরুল করিম ১৪৭

ইলিয়াস কাঞ্চন ১৫০

দ্বিজেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী ১৫৪

আয়মান সাদিক ১৫৬

GLOBAL CENTER FOR INNOVATION AND LEARNING

Improving Lives Through Innovation & Learning

Global Center for Innovation and Learning (GCFIL) is a social enterprise working on global human development across a variety of civil sectors. We have our roots in Bangladesh, beginning in the early 1990's. Currently, GCFIL has areas of operation through regional offices in Bangladesh, Tanzania and USA HQ. GCFIL strives for a world where all people are skilled, capable and can improve their lives and the lives of their community. With expanded networks in 75+ Countries, we pride ourselves with co-creating new ideas and implementing them successfully.

Our Vision

We believe all human beings have the right and obligation to become their most effective selves and to support others in their organizations and communities. This enables all people to truly thrive and strive for a better world.

Our Mission

GCFIL strives for a world where all people are SKILLED, CAPABLE and can THRIVE to their fullest POTENTIAL to improve themselves and the lives of their communities.

Contact Us

Global Center for Innovation and Learning (GCFIL)

USA HQ
9414 Jackson Ct
Laurel, MD 20723
USA
Phone: +1-202-288-9158
Email: sakil@gcfil.com
Skype: sakilmalik
Web: www.gcfil.com

Central Asia Regional Office
Tashkent, Uzbekistan
Email: info@gcfil.com

South Asia Regional Office
24/1 Eskaton Garden Rd
Dhaka 1000
Bangladesh
Email: info@gcfil.com

East Africa Regional Office
Usa River, Tanzania
Email: info@gcfil.com

সম্পাদকীয়

রিসার্চ ফর অ্যা বেটার ওয়ার্ল্ড তথা একটি সুন্দরতম পৃথিবীর জন্য গবেষণা; স্লোগান নিয়ে ২০১৬ সালে বিজয়ের মাস ডিসেম্বরের ৬ তারিখে যাত্রা শুরু করে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা সংসদ'। ৩৩ জন প্রদীপ্ত তরুণ; তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা মেধাবী মস্তিষ্ক, প্রতিশ্রুতিশীল প্রাণ, উজ্জ্বল উদ্যম আর স্বাপ্নিক সারথীদের সম্মিলনের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় এই সংসদ। প্রতিষ্ঠালগ্নে যদিও বুঝে উঠতে পারা যায়নি, অতি অল্প কালেই এতটা হুলস্থুল সাড়া পড়ে যাবে সর্বত্র! তবে শিক্ষার্থী-শিক্ষকদের ভেতর একটি অন্তর্গত সাড়া অন্তত পড়া উচিত- এটুকু কিন্তু পূর্বানুমিতই ছিল।

একটা স্বল্পালোকিত- স্বল্পবায়ুর দমবন্ধলাগা কক্ষ, ঢাউস সব পুস্তক, মোটা ফ্রেমের ভারী চশমা, বিবর্ধক কাচ; গবেষণা বলতে শিক্ষার্থীদের ভেতর এরকম যে ভীতিকর কল্পিত দৃশ্যের ধারণাটি বদ্ধমূল হয়ে ছিল এতদিন, আমরা সেই ধারণার দেয়াল ভেঙ্গে জীবনানন্দ নিয়ে কক্ষটিতে প্রবেশ করতে চেয়েছি। আনন্দের সঙ্গে গবেষণা কিংবা গবেষণার সঙ্গে আনন্দ- করতে চেয়েছি। বিপুল শিক্ষার্থী এবং শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষকদের আন্তরিক সাড়া পেয়ে মনে হচ্ছে, সম্ভবত স্বপ্নযাত্রার সঠিক সিঁড়ি বেয়েই আমাদের গন্তব্যের ঊর্ধ্বমুখী অগ্রযাত্রা অব্যহত রয়েছে। উল্লেখযোগ্য স্বল্প সময়ে, সংসদকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহশিক্ষা কার্যক্রমের সংগঠন হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে সেই স্বপ্নপালে জোর হাওয়া দিয়েছে স্বয়ং বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।

সংসদের বয়স বড্ড কম, মাত্র শিশু। সংসদের নিয়মিত প্রকাশনা হিসেবে 'বিনির্মাণ' প্রকাশের উদ্যোগ আরও আগে নিলেও নানামুখী জটিলতা আর সীমাবদ্ধতায় তা আলোর মুখ দেখেনি। অবশেষে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। জ্যেষ্ঠ গবেষকদের লেখা, গুণীজনদের সাক্ষাৎকার, সংসদের কয়েকটি টিমের যৌথ লেখার পাশাপাশি স্থান পেয়েছে বিভিন্ন বর্ষের তরুণ গবেষকদের দারুণ সব লেখা।

'বিনির্মাণ'কে একটি মানসম্মত প্রকাশনা হিসেবে পাঠকের হাতে তুলে দেবার জন্য আমরা আমাদের মেধা, শ্রম এবং সময়ের উল্লেখযোগ্য অংশ ব্যয় করেছি। মুদ্রণপ্রমাদসমেত সার্বিক ভুলত্রুটি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখে তারুণ্যের উদ্যমকে অভিবাদন জানাবেন- এই প্রত্যাশা রইল।

কবীর হোসাইন

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের গবেষণা সংগঠনের যৌক্তিকতা

সাইফুল্লাহ সাদেক*

বিশ্ববিদ্যালয়ের পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের 'গবেষণা সংগঠন' ধারণাটি বাংলাদেশে একেবারে সাম্প্রতিক হলেও বিশ্বে তা নতুন কিছু নয়। আনুমানিক ১৯৭৮ সালকে 'গবেষণা সংগঠন' এই ধারণার সূচনা বলা যায়। ১৯৭৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রের লিবারেল আর্টস কলেজে যাত্রা শুরু করে কাউন্সিল অন আন্ডারগ্রাজুয়েট রিসার্চ (সিইউআর)। সারা বিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের গবেষণায় উদ্বুদ্ধ করতে গবেষণার মাধ্যমে শেখার ব্রত নিয়ে এই সংগঠন ক্রমাগত এগিয়ে যায়। তারও বহু পরে এসে ২০০৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠিত হয় হার্ভার্ড কলেজ আন্ডারগ্রাজুয়েট রিসার্চ অ্যাসোসিয়েশন। পরবর্তীতে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়াসহ বিশ্বের বহু দেশ ও বিশ্ববিদ্যালয় এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগে শিক্ষার্থীদের জন্য গবেষণা সংগঠনের যাত্রা শুরু হয় এবং তা ক্রমাগত বিকশিত হতে থাকে।

সমাজ, সভ্যতা যতটা উন্নত হচ্ছে শিক্ষার্থীদের গবেষণা সংগঠনের ধারণা ততটাই বিস্তৃত হচ্ছে এবং শিক্ষার্থীদের মাঝে গবেষণার মনোভাব জাগ্রত হচ্ছে। গবেষণা সংগঠনের পরিচয় কোথাও রিসার্চ সোসাইটি, কোথাও রিসার্চ অ্যাসোসিয়েশন, কোথাও রিসার্চ ফোরাম, কোথাও রিসার্চ ক্লাব অথবা কোথাও কোথাও রিসার্চ এন্ড ইনোভেশন সেন্টার প্রভৃতি নামে দ্যুতি ছড়াচ্ছে। নাম পরিচয়, বিশ্ববিদ্যালয় ও দেশ ভিন্ন হলেও সংগঠনগুলোর লক্ষ্য অভিন্ন ও প্রায় এক। প্রত্যেকটি সংগঠনই কাজ করছে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের গবেষণায় উদ্বুদ্ধ করতে। তরুণদের গবেষণামুখী করার জন্য গ্রহণ করছে ব্যতিক্রমধর্মী উদ্যোগ। বিশেষত সংগঠনগুলো স্নাতক শিক্ষার্থীদের গবেষণাকে প্রণোদনা দেয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্ব দিয়ে থাকে।

তরুণদের গবেষণায় উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে ভবিষ্যতে গবেষণামনস্ক, উদার, চিন্তাশীল ও উন্নত প্রজন্ম গড়ে তোলার সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য বাস্তবায়ন করছে সংগঠনগুলো। এমন কিছু গবেষণা সংগঠনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-হার্ভার্ড কলেজ আন্ডারগ্রাজুয়েট রিসার্চ অ্যাসোসিয়েশন, যুক্তরাষ্ট্র। আন্ডারগ্রাজুয়েট রিসার্চ সোসাইটি, ইউনিভার্সিটি অব সাউথ ফ্লোরিডা, ইয়েল আন্ডারগ্রাজুয়েট রিসার্চ অ্যাসোসিয়েশন, ডিইউক আন্ডারগ্রাজুয়েট রিসার্চ সোসাইটি, ডিইউক ইউনিভার্সিটি, স্ট্যানফোর্ড আন্ডারগ্রাজুয়েট রিসার্চ অ্যাসোসিয়েশন (এসইউআরএ), আন্ডারগ্রাজুয়েট রিসার্চ সোসাইটি, ইউনিভার্সিটি রোড আইল্যান্ড, সোসাইটি অফ আন্ডারগ্রাজুয়েট রিসার্চার, যুক্তরাষ্ট্র, আন্ডারগ্রাজুয়েট রিসার্চ অর্গানাইজেশন্স, ফ্লোরিডা, যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়ান্স মেটেরিয়ালস রিসার্চ সোসাইটি, ইয়ুথ রিসার্চ ফোরাম প্রভৃতি।

শুধু গবেষণা সংগঠনই নয়, ইউরোপ, আমেরিকার প্রায় প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের 'অফিস অব আন্ডারগ্রাজুয়েট রিসার্চ' তথা স্নাতক শিক্ষার্থীদের গবেষণার উন্নয়নের

জন্য রয়েছে আলাদা অফিস। যেখান থেকে স্নাতক শিক্ষার্থীদের গবেষণায় উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা যোগানো হয়। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় অতিক্রম করে ইউরোপ ও আমেরিকার বহু স্কুল-কলেজেও গবেষণা সংগঠন কাজ করার দৃষ্টান্ত রয়েছে।

তরুণদের গবেষণায় সচেতন ও আগ্রহী করে তুলতে গবেষণা সংগঠনগুলো আন্তঃবিষয়ক ও বহুমুখী বিষয়ে গবেষণাকর্মকে ত্বরান্বিত করছে। এইসব সংগঠন শিক্ষার্থীদের মধ্যে নিয়মিত আলোচনা, সভা-সেমিনার, কর্মশালার আয়োজন করে থাকে, ক্যারিয়ার গঠনে নানা কর্মশালা শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যকার আলোচনা এবং অভিজ্ঞ গবেষকদের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের নিয়মিত জ্ঞান শেয়ারিং, শিক্ষকদের মেন্টরশিপ গ্রহণ দেশ-বিদেশে গবেষণার প্রতিযোগিতা, আইডিয়া কন্টেস্ট, পোস্টার প্রেজেন্টেশনসহ নানা কাজ পরিচালনার মাধ্যমে তারুণ্যের গবেষণার ক্ষেত্রকে বিস্তৃত করছে।

বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটের সঙ্গে তুলনা করলে গবেষণায় বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো একেবারে আনকোরা। এই দেশে গবেষণার ক্ষেত্র বিশাল হলেও গবেষণার কাজে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নেই বললেই চলে। দেশের প্রত্যেকটি বিদ্যাপীঠের প্রায় একই চিত্র। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫৬ টির মতো গবেষণা সেন্টার থাকলেও সেখানে আদতে শিক্ষার্থীদের কোনো অংশগ্রহণ নেই। ক্যাম্পাসে টিএসসি ভিত্তিক অসংখ্য সংগঠন রয়েছে। যেখানে নাচ, গান, আবৃত্তি, বিতর্ক, ফিল্ম, নাটকসহ নানা বিষয় চর্চা হয়। কিন্তু একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের যে মূল লক্ষ্য- 'নতুন জ্ঞান সৃষ্টি ও তা সমাজে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য যে ধরনের একটি সংগঠনের প্রয়োজন ছিলো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার ৯৪ বছরেও ছিল না।

এমনই একটি প্রেক্ষাপটে শুরু হয়েছে শিক্ষার্থীদের গবেষণা সংগঠন 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা সংসদ (Dhaka University Research Society (DURS)। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের গবেষণায় উদ্বুদ্ধ করার সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য নিয়ে ২০১৬ সালের ৬ ডিসেম্বর এই সংগঠনের যাত্রা শুরু হয়। যেটি বাংলাদেশে প্রথম এ ধরনের সংগঠন। সুন্দরতম একটি পৃথিবীর জন্য গবেষণা' (রিসার্চ ফর অ্যা বেটার ওয়ার্ল্ড) স্লোগানধারী শিক্ষার্থীদের এই সংগঠন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত ও বার্ষিক বাজেটভুক্ত।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত শিক্ষার্থীরা (১ম বর্ষ থেকে চতুর্থ বর্ষ, মাস্টার্স) এই সংগঠনের সক্রিয় সদস্য। এমফিল, পিএইচডি গবেষকগণ সম্মানিত সদস্য হিসেবে বিবেচিত হোন। প্রতি বছর জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে সংগঠনের সদস্য আহ্বান করা হয়। তবে গবেষণায় আগ্রহী ও গবেষণাকর্মের অভিজ্ঞতা সম্পন্নদের বছরের যেকোনো সময় সংগঠনের ওয়েবসাইট (www.dursbd.com) এ গিয়ে অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করে সদস্য হিসেবে সক্রিয় হওয়ার সুযোগ রয়েছে।

বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা সংসদের অনুপ্রেরণায় যাত্রা করেছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা সংসদ, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনাল্স রিসার্চ সোসাইটি ও জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা সংসদ। দেশের অপরাপর বিশ্ববিদ্যালয়েও একই ধরনের গবেষণা সংগঠন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে

উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদের ৩৩ জন গবেষণামনস্ক শিক্ষার্থী নিয়ে শুরু হওয়া গবেষণা সংসদে বর্তমানে সহস্রাধিক তরুণ গবেষক কোনো না কোনোভাবে সম্পৃক্ত। ২০টি বিশেষায়িত দলে বিভক্ত হয়ে তরুণ গবেষকরা নিয়মিত গবেষণার কাজ করছেন। ২০টি গবেষণা দলের প্রত্যেকটিতে একজন করে শিক্ষক সুপারভাইজার, গবেষণায় অভিজ্ঞ শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে রিসার্চ ম্যানেজার ও নেতৃত্বদানে দক্ষ শিক্ষার্থীদের মধ্যে সমন্বয়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

এই সংগঠনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হলেন পদাধিকার বলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। উপদেষ্টা হিসেবে আছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্যবৃন্দ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন জ্যেষ্ঠ অধ্যাপক, যারা দেশবিদেশে গবেষণার মাধ্যমে দ্যুতি ছড়িয়ে চলেছেন। সংগঠনের মডারেটর হিসেবে শিক্ষার্থীদের গবেষণা কাজে সহযোগিতা করছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'জন জনপ্রিয় শিক্ষক- মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মনজুরুল করিম ও বিশ্বধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগের চেয়ারম্যান ড. ফাজরিন হুদা। গবেষণা পরিচালক হিসেবে নিয়মিত শিক্ষার্থীদের সহযোগিতা করছেন কাজী সামিও শীশ (সিনিয়র রিসার্চ ফেলো-কারাস)। এছাড়াও দেশ-বিদেশের অনেক গবেষক, স্কলার ও বিজ্ঞ ব্যক্তি ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা সংসদের অগ্রযাত্রায় সহযোগিতা করছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা সংসদের লক্ষ্য- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি দেশব্যাপী শিক্ষিত তরুণদের গবেষণায় উদ্বুদ্ধ করা। এছাড়া গবেষণায় তরুণদের ক্রমাগত সচেতন করার মাধ্যমে বিশ্বের বুকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে গবেষণা ভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে আরো বেশি সমৃদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে পরিচিত করে তোলা এই সংগঠনের অন্যতম লক্ষ্য।

ধারাবাহিকতাভাবে দেশের অপরাপর বিশ্ববিদ্যালয়েও একই রকম গবেষণা সংগঠন প্রতিষ্ঠা, ক্রমান্বয়ে দেশের স্কুল ও কলেজ ভিত্তিক গবেষণা ক্লাব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশের সর্বত্র শিক্ষিত সমাজের মাঝে গবেষণার প্রবণতা সৃষ্টিও এই সংগঠন প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা প্রদান সর্বোপরি, ছাত্রছাত্রীদের গবেষণা উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে একটি উদার, যৌক্তিক, অসাম্প্রদায়িক, সুন্দর সমাজ, রাষ্ট্র ও পৃথিবী বিনির্মাণে সহযোগিতা করা এ গবেষণার সংসদের মূল লক্ষ্য।

লক্ষ্য বাস্তবায়নে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা সংসদ নিয়মিত গবেষণামূলক বহুমুখী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে। শিক্ষার্থীদের একাডেমিক গবেষণায় সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি গবেষণা ক্যারিয়ার গ্রহণে সহযোগিতা ও পথ রচনায় নেতৃত্ব প্রদান করছে। চলমান প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে একজন প্রকৃত 'গ্লোবাল সিটিজেন' হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যেসব আনুষঙ্গিক বিষয়ে অভিজ্ঞতা, ধারণা লাভ ও জ্ঞানার্জন আবশ্যক তা নিয়ে নানা কাজ করে যেমন- নিয়মিত টিম মিটিং, সম্মিলিত ও ব্যক্তিগত

পর্যায়ে গবেষণামূলক কার্যক্রম পরিচালনা, নিয়মিত সাপ্তাহিক গবেষণা সেশন, মাসিক গবেষণা অনুষ্ঠান (মিট দ্য রিসার্চার), দক্ষতা উন্নয়নে দীর্ঘ ও স্বল্প মেয়াদী কর্মশালার আয়োজন, শিক্ষার্থীদের থিসিস ও গবেষণা মনোগ্রাফ, প্রপোজাল তৈরীর জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ আয়োজন, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গবেষণা সেমিনার, সম্মেলন, যুব গবেষক সম্মেলন, স্কুল-কলেজ ভিত্তিক গবেষণা সম্মেলন, গবেষণা উৎসব, ধারণাপত্র প্রতিযোগিতা ও পোস্টার প্রেজেনটেশন প্রতিযোগিতা ইত্যাদি আয়োজন, বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষণা পরিচালনার স্বার্থে খ্যাতিমান গবেষক, স্কলার, বিজ্ঞানী, শিক্ষক, বিশেষজ্ঞ, নীতি নির্ধারক এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা, শিক্ষার্থীদের ইন্টার্নশীপে সুপারিশ, ফেলোশিপ বা স্বেচ্ছাসেবী অভিজ্ঞতা ইত্যাদি মাধ্যমে বিভিন্ন ক্ষেত্রে চাকরির অভিজ্ঞতা পেতে সহায়তা করা, দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, গবেষণা সংগঠনগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন ও সমন্বয় করে বিভিন্ন আয়োজন করা, নিয়মিত গবেষণামূলক ষান্মাসিক পত্রিকা (বাংলা, ইংরেজি) এবং শিক্ষার্থীদের নিয়ে গবেষণা জার্নাল প্রকাশ, স্নাতক শিক্ষার্থীদের গবেষণায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো 'আন্ডারগ্রাজুয়েট রিসার্চ ফেলোশিপ প্রদান, দেশ-বিদেশে বিভিন্ন গবেষণা সম্মেলন, সেমিনার ও কর্মশালায় অংশগ্রহণ, স্কুল-কলেজ এর শিক্ষার্থীদের গবেষণায় উদ্বুদ্ধ করতে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ইত্যাদি বহুমুখী কর্মকাণ্ড পরিচালনার মাধ্যমে এই সংগঠন কাজ করছে।

গবেষণার বিস্তৃত শাখাকে নির্দিষ্ট করে বিষয়ভিত্তিক ২০টি বিশেষায়িত গবেষণা দল হলো-এডুকেশন রিসার্চ টিম, সায়েন্স, বায়ো-সায়েন্স, ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলোজি, আইসিটি, আর্থ অ্যান্ড এনভায়রন্টমেন্ট, হেলথ এন্ড সোসালওয়ার্ক, ইকোনোমিকস, বিজনেস ট্রেড অ্যান্ড ট্যুরিজম, হিস্ট্রি এন্ড সিভিলাইজেশন্স, পলিটিকস, ল' অ্যান্ড লিগ্যাল সিস্টেম, সোসাল সায়েন্স, গ্লোবাল ব্রান্ডিং, ইথিকস অ্যান্ড রিলিজিয়ন, আর্ট অ্যান্ড কালচার, মিডিয়া অ্যান্ড কমিউনিকেশন্স, জেন্ডার অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট, ওয়ার, পিস এন্ড হিউমেনিটি, ফুড এন্ড নিউট্রিশন এবং এনথ্রোপোলজি এন্ড আর্কিওলজি।

গবেষণা সংসদের ২০টি গবেষণা দল বিভিন্ন বিষয়ের উপর গবেষণা প্রস্তাবনা গ্রহণ করেছে এবং গবেষণা পরিচালনা করছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু গবেষণা প্রজেক্ট হলো হচ্ছে- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের ছাত্রীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ: চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতির মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্জ্য, ময়লা ও পানি ব্যবস্থাপনা ও পর্যালোচনা। ছাত্রছাত্রীদের সহশিক্ষা কার্যক্রমে সুযোগ ও চ্যালেঞ্জ। বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের চ্যালেঞ্জ ও সুযোগ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন ব্যবস্থাপনা: সমস্যা ও সম্ভাবনা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রছাত্রীদের ওপর ফেসবুকের প্রভাব: পর্যালোচনা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রীদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা: একটি পর্যালোচনা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রছাত্রীদের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে শব্দদূষণ ও এর প্রভাব, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের স্ট্রিট ফুড, টিএসসির

সংস্কৃতি চর্চার ইতিহাস পর্যালোচনা, ক্যাম্পাস সাংবাদিকতায় নারীর অংশগ্রহণ ও সীমাবদ্ধতা, বাংলাদেশের টেলিভিশন সাংবাদিকতায় নারী: চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা, তরুণদের চিন্তা-চেতনায় ছাত্ররাজনীতির প্রভাব ও সমস্যা, বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে গবেষণা সংগঠনের অগ্রযাত্রা ও বিকাশ, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের মাদকাসক্তির প্রভাব: পর্যালোচনা ইত্যাদি।

নিজেদের মধ্যে গবেষণা পরিচালনার পাশাপাশি এই সংগঠন দেশ-বিদেশের গবেষণা সংগঠন, প্রতিষ্ঠান ও বিজ্ঞ গবেষক-স্কলারদের সমন্বয়ে কাজ করে থাকে এবং অংশগ্রহণ করে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন গবেষণা সেমিনার ও কর্মশালায়।

এর মধ্যে অন্যতম, যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক শিক্ষা ও গবেষণা সংগঠন-গ্লোবাল সেন্টার ফর ইনোভেশন এন্ড লার্নিং এর সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়টি অন্যতম। এই সংগঠনের সহযোগিতায় গবেষণা সংসদ প্রথমবারের মতো বাংলাদেশে 'আন্ডারগ্রাজুয়েট রিসার্চ ফেলোশিপ-২০১৮ প্রবর্তন করে। এছাড়াও এই সংগঠনের সঙ্গে সমন্বয় করে রিসার্চের বিভিন্ন কর্মশালা, অনলাইন কোর্স আয়োজন করছে গবেষণা সংসদ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা সংসদ প্রথমবারের মতো ভারতের মেঘালয়ের নর্থ ইস্টার্নহিল ইউনিভার্সিটিতে অনুষ্ঠিত ৯ দিনের গবেষণা কর্মশালা ও আন্তর্জাতিক সেমিনারে অংশগ্রহণ করে ২০১৮ সালের আগস্টে। ৩-১১ আগস্ট ভারতের মেঘালয়ের নর্থ ইস্টার্ন হিল ইউনিভার্সিটি, তুরা ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হয় ৯ দিনব্যাপী কর্মশালা ও সেমিনার। যেখানে অংশগ্রহণ করে গবেষণা সংসদের ২২ জন তরুণ গবেষক। তারা সেখানে গবেষণার কর্মশালা করে এবং রিসার্চ পেপার উপস্থাপন করে সুনাম কুড়িয়েছে। চলতি বছর ভারতের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা সংসদের প্রতিনিধি দল গবেষণা সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে। এছাড়া ইতোমধ্যে মালয়েশিয়া, যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা সংগঠনের আয়োজনে সেমিনারে আমন্ত্রিত হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা সংসদ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা সংসদ চায় বাংলাদেশে তরুণদের মধ্যে গবেষণার বিকাশ হোক। এই সংগঠন মনে করে টেকসই, উন্নত, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে গবেষণামনস্ক প্রজন্মের বিকল্প নেই।

সূত্র:
https://www.cur.org/who/organization/
https://www.hcura.org/

সাইফুল্লাহ সাদেক
প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা সংসদ

স্নাতক গবেষকদের জন্য অপরিহার্য ৫টি দক্ষতা

শাকিল মালিক*

গবেষণা খুব একটা সহজ বিষয় নয়। মার্টিন শোয়ার্জ্জ ২০০৮ সালে প্রকাশিত তার একটি প্রবন্ধে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় অজ্ঞতার গুরুত্ব হিসেবে দেখান যে, গবেষণামূলক সমস্যার সমাধান করার জন্য আমাদেরকে অজানার মাঝে গভীরভাবে নিমজ্জিত হতে হবে। তবে, এই অসীম অজ্ঞতা অতিক্রম করার জন্য সে আতঙ্কিত হতে পারে। আমরা বিশ্বাস করি, কিছু বৈশিষ্ট্যের একটি বিশেষ সেট রয়েছে যা একজন স্নাতক অধ্যয়নরত গবেষককে গবেষণামূলক সমস্যার সফলভাবে সমাধানের জন্য প্রস্তুত করবে। সৃজনশীলতা, বিবেচনা, যোগাযোগ, সংগঠন এবং অধ্যবসায় প্রতিটি সমান গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতা- যা অন্যের আবিষ্কার হতে জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে নিজস্ব আবিষ্কার তৈরি করার জন্য উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধন করে। এই দক্ষতা থাকা এবং শাণিত করা, প্রতি অংশে গবেষণার প্রতিটি স্তরকে অন্তর্ভুক্ত করে এমন দক্ষতা, একটি স্নাতক গবেষণার ক্ষেত্রে সফল কর্মজীবনের ভিত্তি গড়ে তোলার মূল চাবিকাঠি। স্নাতক গবেষক এবং পরামর্শদাতাদের একটি দল হিসেবে, আমরা শিক্ষার্থীদের সমস্যার সমাধান এবং আবিষ্কারের জন্য উৎসাহিত করতে চাই এবং গবেষণয় সাফল্যের জন্য প্রতিটি শিক্ষার্থী কীভাবে সঠিক পথে সামনে অগ্রসর হবে- সে বিষয়ে আলোচনা করতে চাই।

নিম্নে একজন গবেষকের প্রধান দক্ষতাগুলোর তালিকা দেয়া হলো-

সৃজনশীলতা

স্নাতক গবেষণার এমন সংজ্ঞা খুঁজে পাওয়া কঠিন, যেখানে সৃজনশীলতার কথা উল্লেখ থাকে না বা যার মধ্যে আসল, মৌলিক, বা অনন্য এই শব্দগুলি থাকে না। স্পষ্টত যে, সৃজনশীলতা স্নাতক গবেষণা প্রক্রিয়ার জন্য একটি ধ্রুবক অংশ। নিউ জার্সি কলেজের ডিন জেফরি এম অসবোর্ন এবং হার্ভে মাড কলেজের রসায়নের অধ্যাপক কেরি কে কারুকসিতস এর একটি প্রবন্ধে, মৌলিকতাকে বলা হয় "সাধারণ গুণ", যা সক্রিয়ভাবে ক্যাম্পাসের প্রতিটি স্নাতক গবেষণা কার্যকলাপে উপস্থিত থাকে।

সৃজনশীলতা ও মৌলিকতা একে অপরের ঘনিষ্ঠ অনুষঙ্গী। সৃজনশীলতা মূলধারার ধারণা অতিক্রম করার ক্ষমতা। কিন্তু এক্ষেত্রে মৌলিকতা প্রয়োজনীয়। কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস জুড়ে মৌলিকতা এত বেশি ছড়িয়ে পড়লে অবাক হওয়ার কিছু নেই। স্নাতক গবেষণা কাউন্সিল একটি সর্বজনীন প্রযোজ্য স্নাতক গবেষণার সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে" একজন স্নাতক শিক্ষার্থী দ্বারা পরিচালিত তদন্ত বা অনুসন্ধান যা উক্ত শাখায় মৌলিক, বুদ্ধিদীপ্ত, সৃজনশীল অবদান রাখেন (ওয়েনজেল, ১৯৯৭, ২০০০) । শুধু স্নাতক গবেষক নয়, আজকের জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে সকল গবেষকদের সৃজনশীল চিন্তাভাবনা এবং প্রক্রিয়া উন্নয়ন প্রয়োজন। সৃজনশীলতা এমন একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য যা স্নাতক গবেষকদের বিকাশ করা উচিৎ এবং তাদের গবেষণার অভিজ্ঞতায় এর ব্যবহার করা উচিত।

গবেষণার প্রথম ধাপ হলো সমস্যার বিশ্লেষণ এর জন্য একটি বিষয় বা পরিকল্পনা তৈরি করা, এবং সৃজনশীলতা এই প্রচেষ্টার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী স্নাতক গবেষণা কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে, আমরা প্রতিনিয়ত এমন সম্ভাব্য স্নাতক গবেষকদের পেয়ে থাকি, যারা কোন জায়গা থেকে শুরু করবেন সে বিষয়ে জানেন না। সব বিভাগের শিক্ষার্থীরা কীভাবে তারা কোনো গবেষণা বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে শুরু করবে সে ব্যাপারে অনিশ্চিত, এমনকি কিছুটা পথভ্রষ্ট। আমরা ছাত্রদের তাদের নিজের শাখায় বিস্তৃতভাবে গবেষণার জন্য, কোন বিষয়ের ওপর গবেষণা করা হয়েছে এবং কোন বিষয়ের ওপর করা হয়নি তা খুঁজে বের করতে এবং তাদের আগ্রহের বিষয় খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে উৎসাহিত করি।এমনকি তাদের নিজস্ব শাখার বাইরের গবেষণা অধ্যয়ন করার মাধ্যমে, উদ্ভাবনী গবেষকরা নতুন সংযোগ তৈরীর জন্য সৃজনশীল প্রক্রিয়া ব্যবহার করতে পারেন, যা গৎবাঁধা আবিষ্কারের সম্ভাবনার বাইরে বের হতে পারে। উদ্ভাবনকুশলতা, স্বাতন্ত্র্য, এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সৃজনশীলতা হচ্ছে সেইসব দক্ষতা যা সেই গবেষণার ধারণা তৈরিতে প্রয়োগ করা হলে একে সবার থেকে আলাদাভাবে দৃষ্টিগোচর করে তোলে।

ছাত্ররা যারা স্বাধীন উদ্যোগের অংশ হিসাবে স্নাতক গবেষণার সৃজনশীল প্রক্রিয়ার বিষয়ে দ্বিধান্বিত, চলমান গবেষণায় অংশ নিয়ে তাদের সৃজনশীলতা বিকাশের চেষ্টা করা উচিত এবং সেই গবেষণা পরিচালনা করার ক্ষেত্রে কোন অনুষদী পরামর্শদাতা বা স্নাতকসম্পন্ন করা ছাত্র কীভাবে সৃজনশীলতা প্রয়োগ করে তা দেখা উচিত। এই সময়ে, স্নাতক গবেষকরা তাদের ক্ষেত্রের প্রসঙ্গে সৃজনশীলভাবে কীভাবে ভাবতে পারেন এবং তাদের আগ্রহের একটি বিষয় আবিষ্কার করতে পারেন যা তাদের একটি স্বাধীন, অনন্য গবেষণার সুযোগ প্রদান করবে। কিন্তু ছাত্রদের তাদের নিজেদেরকে শুধু অনুষদের পরামর্শদাতাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে সীমাবদ্ধ করা উচিত নয়। সত্যিকারের গবেষক হতে, স্নাতকদের সম্ভাব্য ধারণাগুলোর জন্য, তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রের বাইরে যাবার চেষ্টা করা উচিত, হয় ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত শাখা বা এমন কোনো শাখা যা একেবারেই সম্পর্কিত নয়।

বিবেচনা

গবেষণার বিশ্বে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট ধরনের বিবেচনা করা জটিল। ঠিক যেমন একজন পরামর্শদাতা তার পরামর্শগ্রহীতা নির্বাচনের জন্য সিদ্ধান্ত নিতে পারেন,তেমনই একজন স্নাতক পড়ুয়া গবেষকও একইভাবে মূল্যায়ন করতে পারে এবং এমন একজন পরামর্শদাতা বেছে নেন যিনি গবেষককে সম্ভাব্য সর্বোত্তম উপায়ে উন্নতি করতে সহায়তা করবে। পরামর্শদাতা বাছাই করার সময় ব্যক্তিত্ব, প্রকৃতি এবং গবেষণা শৈলী এইসব বিষয় বিবেচনা করা হয়। এর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক কখন সমস্যা সমাধানের জন্য সাহায্য চাইতে হয় তা জানা। গবেষণা থেকে সর্বাধিক অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য, ছাত্রদের বুঝতে হবে কোনো বাধার মুখে পড়লে সমস্যাটি সমাধান করার জন্য কখন সাহায্য চাইবে বা নিজে সমাধান করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার মাধ্যমে সময় ব্যয় করবে। গবেষণার অগ্রগতি এবং সম্ভাব্য প্রকল্পের সফলভাবে সমাপ্ত হওয়ার

সুযোগ তারা কী সিদ্ধান্ত নেয় তার উপর নির্ভর করে।

যাহোক, ছাত্র গবেষকদের একজন পরামর্শদাতার মূল্যবান সময় বেশি ব্যবহার করা উচিত নয়; পরিবর্তে, তাদের স্বাধীনতা এবং সহায়তা চাওয়ার মাঝে ভারসাম্য রক্ষা করা উচিত। যখন স্নাতক গবেষকরা উচ্চ স্তরের গবেষণায় এবং পেশাদার ক্যারিয়ারের দিকে এগিয়ে যান,তারা তাদের নিজেদের এবং অন্যদের চাহিদাগুলি বুঝতে পারার ক্ষমতা এবং এরকম স্বয়ংক্রিয়ভাবে এবং অবচেতনভাবে পরিবর্তনশীল পরিবেশে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা অর্জন করে, তাই তারা প্রতিটি সিদ্ধান্তের খুঁটিনাটি বিবেচনা করে অযথা মূল্যবান সময় এবং শক্তির অপচয় করে না।

স্নাতক গবেষকদের ভালো বিবেচনার গুরুত্ব অনুধাবন এবং অধ্যয়ন করা উচিত কারণ এটি গবেষণায় নৈতিক উভয়সংকট এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ভাল নৈতিক সিদ্ধান্তগুলি অনুশীলনে ব্যর্থতা, শিক্ষার্থী গবেষকদের ক্যারিয়ার এবং সততাকে বিপন্ন করতে পারে এমনকি তাদের পরামর্শদাতাদের, সহকর্মীদের, তাদের কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়েরও ভীষণভাবে ক্ষতি করতে পারে। স্নাতক গবেষকদের শুধু অনুষদের পরামর্শদাতা বা সহকর্মী ছাত্র দ্বারা নির্ধারিত উদাহরণের উপর নির্ভর না করে সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক। উপরন্তু, শিক্ষার্থীদের তাদের নির্দিষ্ট ক্ষেত্রগুলির সঙ্গে সম্পর্কিত নৈতিক বিষয়গুলি সম্পর্কে যথেষ্ট সময় ব্যয় করা উচিত এবং যথাযথ, নিরাপদ এবং নৈতিক উপসংহারে পৌঁছানোর জন্য তাদের নিজস্ব বিবেচিত সিদ্ধান্তগুলি ব্যবহার করা উচিত। আজকের স্নাতক গবেষকদের নৈতিক ব্যর্থতার সাধারণ ক্ষেত্রগুলির ব্যাপারে অবগত এবং ওয়াকিবহাল হওয়া উচিত,যেমন ফলাফলের অপব্যবহার এবং ভুলভাবে এর উপস্থাপন, ভুল প্রকাশ এবং এমনকি অন্যের রচনা চুরি। সম্ভাব্য নৈতিক বিষয়গুলি সম্পর্কে সচেতন হওয়া গবেষণায় জড়িত সকল পক্ষকে গবেষণার সততা বজায় রাখতে সহায়তা করবে। যদিও গবেষণার এই অনিশ্চিত পৃথিবীতে সর্বদা সর্বোত্তম পছন্দ করা কঠিন হতে পারে তবে স্নাতক গবেষকরা অভিজ্ঞ গবেষকদের তত্ত্বাবধানে নিম্ন-স্তরের পরিবেশে নৈতিক ও যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত গ্রহণের দক্ষতা বিকাশ করার সুযোগ পান। তারা ব্যবহারিক প্রয়োগের মাধ্যমে নৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে। তারা এই সমস্যাটি সনাক্ত করতে শেখে (এটি সময় দ্বন্দ্ব বা ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব বা অন্য কিছু হতে পারে); দ্বন্দ্ব মোকাবেলা করার সম্ভাব্য সকল উপায়গুলির খুঁটিনাটি নির্ধারণ করা; গবেষণার অভিজ্ঞদের থেকে পরামর্শ চাওয়া; এবং, প্রয়োজনে মাঝে মাঝে ঝুঁকি নেওয়া । এই ধরনের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রক্রিয়াগুলির অধ্যয়ন (বেনস এট এল ২০১০, ১৯১) শিক্ষার্থীদের বিচারের দক্ষতা বিকাশ করতে সহায়তা করতে পারে যা স্নাতক গবেষকদের জন্য প্রয়োজনীয়। অবশেষে এই দক্ষতাগুলো সহজাত হতে হবে।

যোগাযোগ

এই নিবন্ধের জন্য, আমরা যোগাযোগকে স্নাতক গবেষক এবং তার অনুষদের পরামর্শদাতার মধ্যে কার্যকর সম্পর্ক বিকাশ এবং রক্ষা করার জন্য একটি প্রয়োজনীয় দক্ষতা হিসেবে উল্লেখ করব। সকল স্নাতক শিক্ষার্থীদের কাছে পরামর্শক-পরামর্শগ্রহীতার সম্পর্কের গুরুত্ব UCLA এর আলেকজান্ডার অ্যাস্টিন খুব ভালোভাবে তুলে ধরেছেন।

তিনি এই মিথস্ক্রিয়াগুলোকে শিক্ষার্থীদের স্নাতক অভিজ্ঞতার উন্নয়নে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলির মধ্যে একটি হিসেবে উল্লেখ করেন (অ্যাস্টিন, ১৯৯১)। এই সম্পর্কগুলোর ইতিবাচক প্রভাব স্নাতক গবেষণাতেও পাশাপাশি ভুমিকা রাখে যেহেতু এই মিথস্ক্রিয়াগুলোর স্নাতক গবেষকদের ব্যক্তিগত এবং একাডেমিক উন্নয়নের ওপর সর্বাধিক দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলে (মালকোভস্কি, ১৯৯৬, ৯০)।অনুষদের পরামর্শক হচ্ছেন, শিক্ষার্থী এবং গবেষণার নতুন এবং অপরিচিত বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ।গবেষণা প্রকল্পে অনুষদের পরামর্শকের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনায় মিশেল মালাকোস্কী বলেন, "ছাত্রছাত্রীদের ব্যক্তিগত উন্নতি এবং একাডেমিক উন্নয়নের জন্য উৎসাহিত করেন এবং দিক নির্দেশনা প্রদান করেন এবং চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য শিক্ষার্থীদের সহায়তা করে থাকেন" (মালাখোস্কি, ১৯৯৬, ৯০)।

স্নাতক গবেষণা প্রক্রিয়ার প্রাথমিক পর্যায়ে একজন অনুষদের পরামর্শক এর সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করা একটি ভয়াবহ পরিস্থিতি হতে পারে। শিক্ষার্থীরা কখনো কখনো অনুষদের সদস্যদের সঙ্গে সামান্য অভিজ্ঞতা নিয়ে তাদের সঙ্গে কাজ শুরু করে। প্রথমত, পূর্বনির্ধারিত গবেষণার সময় বাইরে থাকা পরামর্শদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে দ্বিধা বোধ করতে পারে, তারা চিন্তিত থাকে যে তাদের প্রশ্নগুলি 'বিরক্তিকর' বা তাদের উদ্বেগ 'মূর্খতাপূর্ণ' হতে পারে। তবে আমাদের অভিজ্ঞতাতে, পরামর্শদাতারা শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পরিচিত হতে বেশি ইচ্ছুক, সামনাসামনি সাক্ষাৎ এবং ইমেল বিনিময়ের মাধ্যমে বা অনভিজ্ঞ স্নাতক গবেষকদের জন্য অভিজ্ঞ শিক্ষার্থী গবেষকদের 'সহকর্মী পরামর্শদাতা' হিসেবে ব্যবস্থা করে দিতে।

যাহোক, স্নাতক গবেষকদের তাদের পরামর্শক এবং তাদের সময়ের প্রতি সম্মান করা উচিত। অনুষদের পরামর্শকগণ প্রায়ই একাধিক কোর্সের কর্মপরিকল্পনা, তাদের নিজস্ব স্বাধীন গবেষণা প্রয়াস এবং অতিরিক্ত স্নাতক বা স্নাতকোত্তর গবেষকদের পরামর্শ, দিকনির্দেশনা দেওয়া এসবের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে চলেন। স্নাতক গবেষক হিসেবে আমাদের অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে, আমরা দেখেছি যে আমাদের পরামর্শদাতাদের সঙ্গে কার্যকর সম্পর্কগুলি তৈরী ও রক্ষণাবেক্ষণ আমাদের স্বতন্ত্র ক্ষেত্রগুলিতে জ্ঞান এবং বোধশক্তি বৃদ্ধি করেছে, অতিরিক্ত গবেষণার সুযোগ প্রদান করেছে এবং সামগ্রিভাবেক ব্যক্তিগত এবং পেশাদার দক্ষতা বৃদ্ধি করেছে।

সংগঠন

সুপ্রতিষ্ঠিত সাংগঠনিক দক্ষতাগুলো, কার্যকর গবেষণা এবং হিতকর বিজ্ঞানকে সহজতর করে তোলে। পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের ক্লাস, অধ্যয়ন, গবেষণা, সামাজিকীকরণ, শখ, এবং সুস্থ জীবনধারা বজায় রাখার পথ আরও সহজ করে দেয়। ডেটা বিশ্লেষণ, নতুন ধারণা বা প্রস্তাবনা তৈরি করা বা কোনো প্রকল্পে পরবর্তী পদক্ষেপ নির্ধারণের জন্য সমস্ত কাজের একটি সংগঠিত দিনপঞ্জি বা ল্যাব নোটবুক রাখা দরকারি। বিশেষত, সংগঠিত ল্যাব নোট এবং তথ্য, রচনা লেখা এবং প্রকাশনা প্রক্রিয়ার খুব সাহায্য করে। এই দক্ষতা একটি নির্ভরযোগ্য রিপোর্ট এবং একটি অসমর্থিত প্রবন্ধের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে। একজন অসংগঠিত স্নাতক গবেষক কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে কাজ

সম্পন্ন করতে গিয়ে একটি ভীষণ অসুবিধার সম্মুখীন হতে পারে এবং অতীতের বিভিন্ন গবেষণার তথ্য এবং প্রাসঙ্গিক নোট খুঁজে পেতে আরো কঠিন অসুবিধার সম্মুখীন হতে পারে। স্নাতক গবেষক হিসেবে, আমাদের সবারই ডেডলাইনের মধ্যে কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে, কিন্তু আমাদের অনুষদের পরামর্শদাতারা আমাদের ল্যাব নোটবুক বা উৎস সঠিকভাবে রেকর্ড করা হয়েছে কি না তা নিয়মিত পরীক্ষা করে দেখেন না। একটি ভালো সাংগঠনিক কাঠামো ছাড়া, সময় মতো কাজ শেষ করা কঠিন এবং গবেষকের জন্য প্রয়োজন অনুসারে সঠিক তথ্য বা নির্দিষ্ট উদ্ধৃতি এবং লেখকের নাম যথাস্থানে উল্লেখ করা কঠিন হয়ে পরে। গবেষণা এবং অন্যান্য দায়িত্বগুলির একটি সময়সূচি রাখার পাশাপাশি কার্যকর 'কী কী কাজ করতে হবে' তালিকা লেখা ব্যাপকভাবে সাহায্য করবে। শ্রেণীর কাজ, শ্রেণী নোট, ল্যাব নোট এবং ল্যাবের কাজ ভালোভাবে সংগঠিত হওয়া উচিত পাঠক্রম এবং গবেষণা তথ্যের মধ্যে ভালো সমন্বয় সাধন করার জন্য ।
স্নাতক গবেষকরা অন্যান্য বিভিন্ন কাজে জড়িত হওয়ার এবং অবিশ্বাস্যভাবে ব্যস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং তাদের পক্ষে সহজেই খুব ক্লান্ত হয়ে যাওয়া সহজ। সংগঠিত হওয়া হতাশা এড়িয়ে চলার একটি মূলমন্ত্র এবং ছাত্রদের নিজেদের সময়-নির্ধারণের ক্ষেত্রে সাহায্য করে যা তাদের সমস্ত প্রতিশ্রুতিগুলো সময়মত পালন করতে সহায়তা করে বিহুল হওয়ার থেকে রক্ষা করে। যারা গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে তারা একাধিক বা বড় প্রকল্পের ভারসাম্য বজায় রাখার পাশাপাশি গবেষণার বাইরে সুস্থ জীবন লাভের জন্য এই দক্ষতার গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারবে।

অধ্যবসায়

অধ্যবসায় হলো কখনও হাল ছেড়ে না দেওয়ার জন্য প্রেরণা। কিন্তু এটাও মাথায় রাখতে হবে যে, অধ্যবসায়ে ব্যর্থতার মুখোমুখি হওয়াও অন্তর্গত। ব্যর্থতা হতে পারে একটি খারাপ গবেষণামূলক নকশা বাছাই করা, ভবিষ্যতে যে সব বাধা আসতে পারে তা বিবেচনা না করা, বা প্রস্তাবিত গবেষণা প্রকল্পের বিস্তারিত সবকিছু না জানা। যাহোক, ব্যর্থতা হলো অগ্রগতির একটি স্বাভাবিক অংশ এবং আমরা প্রায়ই আমাদের সাফল্যের চেয়ে আমাদের ভুলগুলি থেকে আরো বেশি শিখি, বিশেষত গবেষণায়, যেখানে তদন্তকারীকে অবশ্যই সমস্যার অনেক দিক বিবেচনা করতে হয়। অনেক শিক্ষার্থী গবেষণা করার সুযোগ পেলে তা প্রত্যাখ্যান করে যদি সফল না হবার কোনো একটি সম্ভাবনা থাকে।শেখার জন্য ভুলগুলোকে সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করা উচিত এবং ব্যর্থতার ভয়কে অযথা প্রশ্রয় দেওয়া বন্ধ করা উচিত। যদিও মাঝে মাঝে অধ্যবসায়ী থাকা কঠিন, তবে শিক্ষার্থীদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে এটি শেষ পর্যন্ত মানসম্মত তথ্য, একটি নির্ভরযোগ্য সমন্বয় বা এমনকি শিক্ষাগত অভিজ্ঞতারূপে মঙ্গলজনক ফলাফল প্রদান করবে।
অধ্যবসায় বিশেষভাবে নবীন স্নাতক গবেষক যাদের শক্তিশালী বায়োডাটা বা পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতা নেই তাদের জন্য দরকারি। এই গুণটি বেশিরভাগ অনুষদ পরামর্শক লক্ষ্য করে থাকেন। যদিও মাঝে মাঝে অনুষদের পরামর্শদাতা কম অভিজ্ঞতাসম্পন্ন শিক্ষার্থীকে তার গবেষণাগারের কাজে নিযুক্ত করেন তার দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধতা দেখে।

পরবর্তীতে, যখন একজন ছাত্র গবেষণার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রকল্প উন্নয়ন এবং পরিচালনা করার জন্য অধ্যবসায় অপরিহার্য। যারা গবেষণা সাহিত্য পড়তে এবং তাদের অনুষদের পরামর্শদাতার দিকনির্দেশনা অনুযায়ী কঠোর পরিশ্রম করতে পারে, তারা সফলভাবে সব প্রতিকূলতা, বাধা অতিক্রম করে এবং তাদের কাজ উপস্থাপন করার সময় প্রশ্নগুলির উত্তর করা সহজ হয়। কারণ শিক্ষার্থীদের আগেই প্রাথমিক জ্ঞান সম্পর্কে যথেষ্ট ধারণা আছে। শিক্ষার্থী গবেষকদের স্নাতকোত্তর স্কুল এবং ভবিষ্যত একাডেমিক প্রচেষ্টার ক্রমবর্ধমান অগ্রগতি হিসাবে অধ্যবসায় গবেষণার অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে। বেশিরভাগ গবেষকদের তাদের গবেষণা শুরু করার জন্য বিভিন্ন অনুদান চেয়ে আবেদন করতে হয়। এই প্রক্রিয়াটিতে অবশ্যম্ভাবীভাবে প্রত্যাখ্যান জড়িত এবং অতএব, অনুদানের দরখাস্তগুলো পুনঃলিখন এবং সম্পাদনা করার প্রেরণা গবেষণা প্রক্রিয়া এবং কার্যকর গবেষণা ক্যারিয়ার চালু করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

উপসংহার

উপরে বর্ণিত পাঁচটি দক্ষতার প্রয়োগ একজন স্নাতককে শিক্ষার্থী থেকে গবেষক হতে এবং শিক্ষা অর্জন থেকে আবিষ্কার করার পথে অগ্রসর হতে সহায়তা করবে। যদিও আমরা বিভিন্ন ব্যাকগ্রাউন্ড এবং গবেষণা ক্ষেত্র থেকে এসেছি এবং সবাই বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের, আমরা দেখেছি যে, এই দক্ষতাগুলি আমাদের সাফল্যের জন্য কমবেশি সাধারণ। মনোবিজ্ঞানে মানবিক বিষয়গুলোর সম্মেলনগুলোতে অংশ নেয়ার থেকে, ইতালীয় স্থাপত্যের উপর থিসিস লেখার, ঝিনুকের প্রবালপ্রাচীর পুনরুদ্ধার করতে, এমনকি জার্মানিতে আণবিক সুপ্রজননবিদ্যা অধ্যয়নে।

সৃজনশীলতা, বিচার বিবেচনা, যোগাযোগ, সংগঠন এবং অধ্যবসায় সর্বজনীনভাবে একজন উন্নত গবেষক হওয়ার সাধনার জন্য প্রযোজ্য। আমরা আশা করি যে, অপরিহার্য দক্ষতার এই সেটটি শুধু স্নাতক গবেষক হওয়ার জন্য নয় বরং স্নাতক থেকে অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, সকল স্তরের গবেষকদের মধ্যে একটি সংলাপের সুযোগ সৃষ্টি করবে কীভাবে স্নাতক গবেষকরা সত্যিই সফল হতে পারে সে ব্যাপারে।

অনুবাদক:
সানেমুন ক্যামেলিয়া, শিক্ষার্থী, মনোবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
নির্বাহী সদস্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা সংসদ

শাকিল মালিক
সহ-প্রতিষ্ঠাতা, গ্লোবাল সেন্টার ফর ইনোভেশন এন্ড লার্নিং, মেরিল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র।

কেন পাকিস্তানিরা চার লক্ষ ধর্ষণ করেছিল?

আরিফ রহমান*

'পৃথিবীর সমস্ত যুদ্ধেই ধর্ষণ হয়, আমাদের যুদ্ধেও হয়েছে এটা স্বাভাবিক, না হওয়াটাই অস্বাভাবিক।' মুক্তিযুদ্ধে ধর্ষণ সম্পর্কে অনেক বাঙালিই এমন ধারণা করে থাকেন। কথা সত্য, যুদ্ধ মাত্রই ধর্ষণ। সম্ভবত পৃথিবীতে বড় পরিসরে ঘটে যাওয়া এমন একটি যুদ্ধও পাওয়া যাবে না যেখানে কোনো ধর্ষণ হয়নি। আমাদের মুক্তিযুদ্ধেও প্রচুর ধর্ষণ হয়েছে বলেই দাবি করা হয়ে থাকে। অনেক নিরপেক্ষ গবেষকের মতে, ধর্ষণেরই প্রকৃত সংখ্যা হতে পারে এমনকি ছয় লক্ষেরও উপরে। স্বাভাবিকভাবেই সংখ্যাটা অস্বাভাবিক মনে হতে পারে। বিরানব্বই হাজার পাকিস্তানি সৈনিক এবং তাদের এদেশীয় দোসরদের হাতে এত বিরাট অঙ্কের ধর্ষণ হতে হলে প্রত্যেককেই একাধিক ধর্ষণে লিপ্ত হতে হয়। কেন একটি যুদ্ধকালীন সময়ে থাকা বেশিরভাগ সৈনিকই ধর্ষণ করেছিল সেটাও একটা জিজ্ঞাসা।

বর্তমানে চলমান কিংবা অতীতের যুদ্ধগুলোর দিকে তাকালে দেখা যায়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ধর্ষণ হয়ে থাকে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু বিকৃতমনা সৈনিকের লালসা থেকে। কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীকে নিঃশেষ করে দেয়ার জন্য কিংবা কোনো নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীকে পরিবর্তন করে দেয়ার জন্য যে হত্যা আর ধর্ষণ পরিচালিত হয় সেটা আর নিছক যৌনলালসা মেটানোর জন্য হয়ে থাকে না। এ ধরণের ধর্ষণকে বলা হয় 'জেনোসাইডাল রেপ'। মুক্তিযুদ্ধে প্রকৃত ধর্ষণের সংখ্যা কত সেটা নিয়ে আমরা অন্য কোনোদিন আলোচনা করব; এখানে আমরা শুধু দেখব পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কি আদৌ কোনো ধর্ষণ করেছিল, কেন করেছিল; খুঁজে বের করার চেষ্টা করব এই ঘটনাগুলোর পেছনের কারণ।

এ বিষয়ে আমাদের কাজ সহজ করে দিয়েছেন একজন মানুষ, তার নাম শর্মিলা বসু। যিনি একজন ভারতীয় বংশোদ্ভুত আমেরিকান, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজের একজন সিনিয়র গবেষণা সহযোগী । ১৯৭১ সালের যুদ্ধের ওপর বড় পরিসরে লেখা তাঁর বই 'ডেড রেকনিং: ১৯৭১ এর বাংলাদেশ যুদ্ধের স্মৃতি' দেশে বিদেশে ব্যাপক আলোচনার রসদ জুগিয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে স্মরণকালের সবচেয়ে বিতর্কিত বই হিসেবে এটি আন্তর্জাতিক মহলে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। এছাড়া Economic and Political Weekly এর September ২২, ২০০৭ সংখ্যায় 'Losing the Victims: Problems of Using Women as Weapons in Recounting the Bangladesh War' প্রবন্ধেও ৭১ সালে সংগঠিত যুদ্ধে নারীদের ব্যাপারে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি উঠে এসেছে। আজকের নিবন্ধে তাই এই নিবন্ধের কিছু অংশ নিয়েই সংক্ষেপে আলোচনা করা হবে। এ ছাড়াও শর্মিলা বসু লেখেন 'Anatomy of Violence: Analysis of Civil War in East Pakistan in 1971' (EPW, Oct 8, 2005)। নিবন্ধটির প্রথম সংস্করণ ডঃ বোস ২০০৫ সালের ২৮-২৯ জুন যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দফতরের ইতিহাস বিভাগ আয়োজিত দুই দিনব্যাপী এক সম্মেলনে উপস্থাপন করেন। সম্মেলনের শিরোনাম ছিল 'সংকটে দক্ষিণ এশিয়া: যুক্তরাষ্ট্রের নীতি, ১৯৬১-১৯৭২' ।

প্রথমেই বলে নিচ্ছি, এই প্রবন্ধে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বোসের সমস্ত লেখনীর ওপর আলোকপাত করা হবে না। শুধু ৭১ সালে সংগঠিত যুদ্ধে নারী নির্যাতন সম্পর্কে তাঁর গবেষণার দিকেই আমরা দৃষ্টিপাত করব।

যুদ্ধ নিয়ে জয়ী অংশের একটা গল্প থাকে, পরাজিতদেরও একটা গল্প থাকে। আর স্বাভাবিকভাবেই দুটো গল্পে পরস্পরকে দোষারোপ করা হয়। দুটো গল্পেই থাকতে পারে অনেক ভুল তথ্য, অনেক মিথ্যাচার। কিন্তু অনেক অনেক বছর পর যখন ইতিহাস লেখা হয় তখন সব গল্পের জট খুলে সত্যটা ঠিকই বের হয়ে আসে। এটাই স্বাভাবিক।

প্রশ্ন হতে পারে, কেন এই প্রবন্ধে শর্মিলা বসুকে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে, অন্য কেউ নয় কেন। অনেকেই তো মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে লিখেছেন।

উত্তরটা অতি সহজ। ওয়াশিংটনের একটি কনফারেন্সে শর্মিলা বোসের নিবন্ধ উত্থাপিত হবার পরপরই পাকিস্তানি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাগুলোয় আবার মুক্তিযুদ্ধের ইস্যুগুলো নিয়ে লেখালেখি শুরু হয়। ত্বরিত এ বিষয়ে লেখা ছাপা হয় দ্য ডেইলি টাইমস (হাসান, জুন ৩০, ২০০৫; সম্পাদকীয় জুলাই ২, ২০০৫) এবং ডন (ইকবাল, জুলাই ৭, ২০০৫) এর মতো প্রভাবশালী পত্রিকায়। দু'টো পত্রিকাই বোসের বরাত দিয়ে উল্লেখ করে- বাংলাদেশের যুদ্ধে কোনো ধর্ষণের ঘটনা ঘটেনি। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে পাকিস্তানি জেনারেলদের অনেকেই লিখেছেন। যারা পড়েছেন তারা জানেন এসব বইয়ের প্রায় সবটাই মিথ্যাচারে ভরপুর। এদিকে বাংলাদেশেও অনেক গবেষণা হয়েছে এবং হচ্ছে। তবে নির্মোহভাবে মুক্তিযুদ্ধের তথ্য উপাত্ত যাচাই করতে আমাদের সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছে আন্তর্জাতিক মিডিয়া। পাকিস্তানি বাহিনীর রক্তচক্ষুর ভেতর দিয়েও মুক্তিযুদ্ধ আর গণহত্যার সমস্ত খবরাখবর বিশ্বময় পৌঁছে যায় এসব পত্রিকার মধ্য দিয়ে। পৃথিবীর বড় অংশ জানতে পারে পাকিস্তানিদের নির্মমতার কথা। সারা পৃথিবীর জনমত চলে আসে বাঙালিদের পক্ষে। আর এইসব খবরাখবর সরবরাহ করেন যেসব সাংবাদিক এবং বিদেশী পর্যবেক্ষক তারা ঘটনাগুলো নিরপেক্ষ এবং নির্মোহভাবেই লিখেছেন। এইসব টেলিভিশন আর সংবাদপত্রের প্রচারণার কারণেই মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাবলি, পাকিস্তানিদের নির্মমতা পৃথিবীর মানুষদের কাছে পরিষ্কার। বিশ্বের মানবতাবাদী মানুষেরা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে ঘৃণা করে। কিন্তু অন্য দিকে পাকিস্তান তাদের পক্ষে কোনো গ্রহণযোগ্য ইতিহাসকেই দাঁড় করাতে পারেনি। যদিও পাকিস্তানের বিভিন্ন স্কুল কলেজের বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকগুলোতে তারা নিয়মিত মিথ্যাচার, বাংলাদেশীদের প্রতি বিনা কারণে বিদ্বেষে পরিপূর্ণ করে রেখেছে। কিন্তু বাংলাদেশের পাঠ্যবইতে নিয়মমাফিক পাকবাহিনীর নির্মমতার কথাই বলা আছে, কখনোই বিনা কারণে পাকিস্তানের সাধারণ নাগরিকদের প্রতি কোনো হিংসার বাণী নেই।

মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে পাকিস্তানি জেনারেলদের বইগুলো খাপছাড়া। এসব বইতে তারা মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতার সঙ্গে সঙ্গে স্বগোত্রীয়দের বিরোধিতা করেছে। সেনাবাহিনী পরাজয়ের জন্য দায়ী করেছে রাজনীতিবিদদের। রাজনীতিবিদরা দায়ী করেছে সেনাবাহিনীকে। যুদ্ধকালীন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একজন জেনারেল আরেকজন জেনারেলকে দায়ী করে লিখেছে প্রচুর। ফলশ্রুতিতে পুরো পাকিস্তানি সেনাবাহিনী মিলে এমন একটা গ্রন্থ গ্রন্থনা করতে পারেনি যেখানে সমস্ত খুন-ধর্ষণ-গণহত্যা-লুটপাটের দায়মুক্তি পাবে তারা। এককভাবে বাঙালিদের দায়ী করে একটা বই তারা আসলেই লিখতে পারেনি। তাদের এই শূন্যতাকে পূরণ করেছেন শর্মিলা বসু তার 'ডেড রেকনিং: ১৯৭১ এর বাংলাদেশ যুদ্ধের স্মৃতি' বই এবং তার বিভিন্ন গবেষণা নিবন্ধের মাধ্যমে।

গুরুতর কিছু অভিযোগ

শর্মিলা বসুর 'Losing the Victims: Problems of Using Women as Weapons in Recounting the Bangladesh War' প্রবন্ধে মুক্তিযুদ্ধে নারী নির্যাতন করা কিছু গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টের দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক।

১) শর্মিলা লিখেছেন "মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘর বলছে 'পঁচিশে মার্চ থেকে ষোলই ডিসেম্বরের মধ্যে তিরিশ লক্ষ বাঙালিকে হত্যা করা হয়েছে, দুই লক্ষ নারীকে ধর্ষণ করা হয়েছে এবং এক কোটিকে হতে হয়েছে শরণার্থী। এটা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ঘটে যাওয়া সবচেয়ে জঘন্যতম গণহত্যা'। মাত্র ৩৪,০০০ সদস্যের একটি সেনা বাহিনীর পক্ষে আট থেকে নয় মাসের মধ্যে এই মাত্রায় ধর্ষণ করতে হলে প্রত্যেককে ধর্ষণে লিপ্ত হতে হবে এবং প্রত্যেককে অবিশ্বাস্য সংখ্যক ধর্ষণ করতে হবে।"

[Losing the Victims: Problems of Using Women as Weapons in Recounting the Bangladesh War. P.3865]

২) শর্মিলা জেনারেল নিয়াজীর যুদ্ধাবস্থায় (১৫ এপ্রিল ১৯৭১) দেয়া এক নির্দেশনার বরাত দিয়ে বলেছেন 'যুদ্ধে কিছু ধর্ষণ হতেই পারে, তবে আমি আশা করব আমার সৈনিকেরা সবধরনের লুট, ডাকাতি এবং অসদাচরণ থেকে বিরত থাকবে। যদি এ ধরণের অভিযোগ প্রমাণিত হয় তাহলে তাদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে।'

[Losing the Victims: Problems of Using Women as Weapons in Recounting the Bangladesh War. P.3866]

৩) শর্মিলা লিখেছেন, বাংলাদেশে পাকিস্তানি হত্যাকাণ্ডের চাক্ষুস সাক্ষীদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলে আমি জানতে পেরেছি, পাক বাহিনী সবসময় পুরুষদের টার্গেট করত। মহিলাদের সবসময়ই আলাদা করে ছেড়ে দেয়া হত। কয়েকটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা হয়তো ঘটতে পারে তবে এত বড় স্কেলে ধর্ষণ অসম্ভব। হত্যাকাণ্ডের সময় কখনই নারীদের হত্যা করা হয়নি, কয়েকটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটে থাকলে সেসব ছিল ক্রসফায়ার।

[Losing the Victims: Problems of Using Women as Weapons in Recounting the Bangladesh War. P.3866]

৪) শর্মিলা লিখেছেন, আমার কাছে যে তথ্য প্রমাণ আছে সেটা থেকে বলতে পারি '৭১ এ কিছু ধর্ষণ হয়েছে কিন্তু সংখ্যাটা কখনোই হাজার হাজার কিংবা লক্ষ লক্ষ নয়। ধর্ষিতাদের মধ্যে ছিলো হিন্দু এবং মুসলিম, বাঙালি, বিহারী এবং পশ্চিম পাকিস্তানি। আর ধর্ষণ করেছিল বাঙালিরা, বিহারীরা, পশ্চিম পাকিস্তানিরা এবং আর্মি অফিসারেরা। অনেক অবাঙালিদের ধর্ষণের পর হত্যা করে বাঙালিরা।

[Losing the Victims: Problems of Using Women as Weapons

in Recounting the Bangladesh War. P-3870]

৫) শর্মিলা লিখেছেন, তখনকার কিছু জুনিয়র অফিসারের সঙ্গে কথা বলে আমি জেনেছি যে, কিছু কিছু বিচ্ছিন্ন ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে এবং তাদের শাস্তিও দেওয়া হয়েছে আর্মিদের বিধান অনুযায়ী। কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাদের জেলও হয়েছে। কিছু বিচ্ছিন্ন ধর্ষণের ঘটনা ঘটলেও এত বড় স্কেলে ধর্ষণ কখনই ঘটেনি।

[Losing the Victims: Problems of Using Women as Weapons in Recounting the Bangladesh War. P-3866]

এই পুরো প্রবন্ধজুড়ে শর্মিলা বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছেন কয়েকটি পয়েন্ট।

- পাক সেনাদের হাতে ধর্ষণ একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা
- ধর্ষণ হয়েছে কিন্তু সংখ্যা খুবই কম।
- পাকিস্তানিদের পাশাপাশি অনেক বাঙালিও ধর্ষণ করেছিল।
- অনেক বাঙালি নারী সেনাবাহিনীকে মনোরঞ্জন করতে সম্মত ছিল।

এরপর তিনি তার মনমতো কিছু কেস স্টাডি দেখান। ফেরদৌসি প্রিয়ভাষিণীর ঘটনাও তার মধ্যে অন্যতম। সবগুলো সম্পর্কেই বিস্তারিত আলোচনা করা হবে সামনের পর্বগুলোতে। কিন্তু সবার আগে একটা জিনিস পরিষ্কার করা দরকার আর সেটা হচ্ছে- পাকিস্তানিদের হাতে ধর্ষণগুলো কি নিতান্তই বিচ্ছিন্ন ঘটনা, নাকি তাদের কোনো সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ছিল।

ঈমানী দায়িত্ব

স্বাধীনতার পর ধর্ষিতা বাঙালি মহিলাদের চিকিৎসায় নিয়োজিত অষ্ট্রেলিয় ডাক্তার জেফ্রি ডেভিস গণধর্ষনের ভয়াবহ মাত্রা দেখে হতবাক হয়ে কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে আটক পাক অফিসারকে জেরা করেছিলেন যে তারা কিভাবে এমন ঘৃণ্য কাজ-কারবার করেছিল। অস্ট্রেলিয় চিকিৎসক বিচলিত হলেও পাক অফিসারদের সাচ্চা ধার্মিক হৃদয়ে কোনো রকম রেখাপাত ঘটেনি। তাদের সরল জবাব ছিল,

"আমাদের কাছে টিক্কা খানের নির্দেশনা ছিল যে, একজন ভালো মুসলমান কখনই তার বাবার সাথে যুদ্ধ করবে না। তাই আমাদের যত বেশি সম্ভব বাঙালি মেয়েদের গর্ভবতী করে যেতে হবে।"

"We had orders from Tikka Khan to the effect that a good Muslim will fight anybody except his father. So what we had to do was to impregnate as many Bengali women as we could."

ধর্ষণে লিপ্ত এক পাকিস্তানি মেজর তার বন্ধুকে চিঠি লিখেছে;

"আমাদের এসব উশৃঙ্খল মেয়েদের পরিবর্তন করতে হবে যাতে এদের পরবর্তী প্রজন্মে পরিবর্তন আসে, তারা যেন হয়ে ওঠে ভালো মুসলিম এবং ভালো পাকিস্তানি"

"We must tame the Bengali tigress and change the next generation Change to better Muslims and Pakistanis."

উপরের ঘটনা দুটো প্রচণ্ড তাৎপর্যপূর্ণ। এটা শুধুমাত্র নিম্নপদস্থ সৈনিকদের মানসিকতার প্রতিনিধিত্ব করছে। আর উচ্চপদস্থ অফিসারদের অবস্থা তো আর ভয়াবহ।

একাত্তরের সেপ্টেম্বরে পূর্ব পাকিস্তানের সকল ডিভিশন কমান্ডারের কনফারেন্সে এক অফিসার তুলেছিলেন পাকিস্তানি সেনা কর্তৃক বাঙ্গালি নারীদের ধর্ষণের প্রসঙ্গ। নিয়াজী তখন সেই অফিসারকে বলেন, "আমরা যুদ্ধের মধ্যে আছি। যুদ্ধক্ষেত্রে এই ধরনের ঘটনাকে স্বাভাবিক বলে ধরে নিও।" তারপর তিনি হেসে বলেন, "ভালই তো এসব বাঙ্গালি রক্তে পাঞ্জাবি রক্ত মিশিয়ে তাদের জাত উন্নত করে দাও।"

আর এই ধর্ষণের পক্ষে তিনি যুক্তি দিয়ে বলতেন,

"আপনারা কীভাবে আশা করেন একজন সৈন্য থাকবে, যুদ্ধ করবে, মারা যাবে পূর্ব পাকিস্তানে এবং যৌনক্ষুধা মেঠাতে যাবে ঝিলমে?"

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ব্রিগেডিয়ার আবদুল রহমান সিদ্দিকী তার East Pakistan The End Game বইতে আরও লেখেন,

"নিয়াজী জওয়ানদের অসৈনিকসুলভ, অনৈতিক এবং কামাসক্তিমূলক কর্মকাণ্ডে উৎসাহিত করতেন। 'গত রাতে তোমার অর্জন কি শেরা (বাঘ)?' চোখে শয়তানের দীপ্তি নিয়ে জিজ্ঞেস করতেন তিনি। অর্জন বলতে তিনি ধর্ষণকে বোঝাতেন।"

পাকিস্তানি জেনারেল খাদিম হুসাইন রাজা 'অ্যা স্ট্রেঞ্জার ইন মাই ওন কান্ট্রি' বইতে লিখেছেন, নিয়াজী ধর্ষণে তার সেনাদের এতই চাপ দিতেন যে তা সামলে উঠতে না পেরে এক বাঙালি সেনা অফিসার নিজে আত্মহত্যা করতে বসেন।

এখানেই শেষ নয়।

ধর্ষণের অবিচ্ছিন্নতা প্রমাণের জন্য রয়েছে কিছু প্রামাণ্য ছবি-

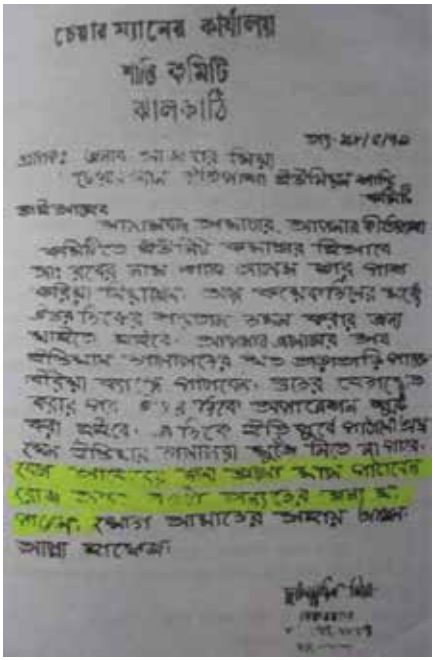
চেয়ারম্যানের কার্যালয়
শান্তি কমিটি
ঝালকাঠি

"বেগ সাহেবের জন্য ভালো মাল পাঠাবেন। রোজ অন্তত একটা।" মাল বলতে এখানে বাঙ্গালি মেয়েদের কথা বলা হয়েছে।

শর্মিলা বসু বারবার বলেছেন, পরিকল্পিত ধর্ষণ হয়নি, যা হয়েছে তা বিচ্ছিন্ন ঘটনা। বীভৎস নির্যাতনের ব্যাপারটি সতর্কভাবে এড়িয়ে গেছেন শর্মিলা। এটিকে কি শর্মিলার opportunistic rape মনে হয়?

Girls freed from Pakistani harems

পাকিস্তানি হেরেম থেকে চার হাজার বাঙ্গালি মেয়েকে পাওয়া নিশ্চয়ই বিচ্ছিন্ন ঘটনা শর্মিলা বসুর কাছে।

সিলেটের শালুটিকরে পাকিস্তানি ক্যাম্পের দেয়ালে ঐ নরপশুদের আঁকা কয়েকটি ছবির দিকে দৃষ্টিপাত করছি।

এর থেকে বড় প্রমাণ বোধ হয় আর হয় না

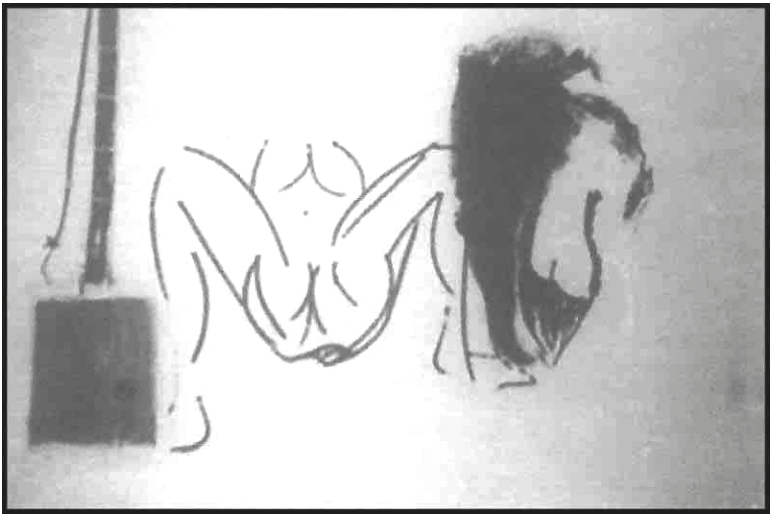

আমাদের প্রতি নৃশংসতার প্রামাণ্য দলিল

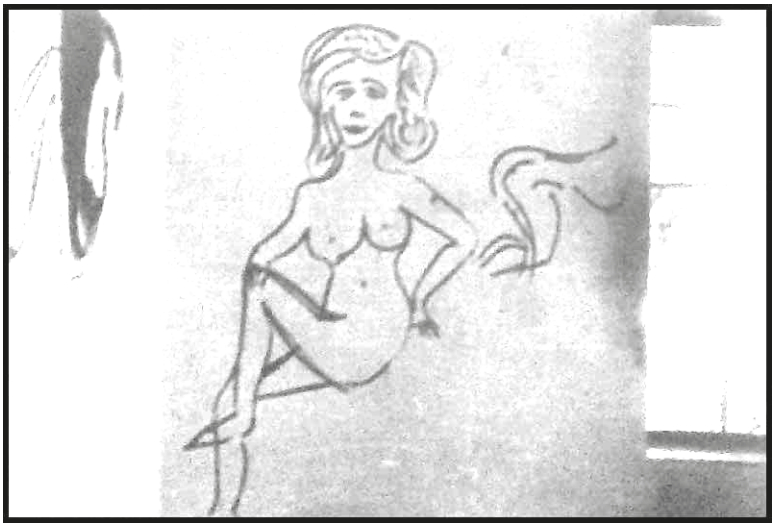

এবারে দৃষ্টিপাত করি আরও কিছু ঘটনার দিকে-

ওয়ার ক্রাইমস ফ্যাক্টস ফাইন্ডিং কমিটির গ্রন্থ 'যুদ্ধ ও নারী'তে উঠে আসে অনেক তথ্য যা পাঠকদের নিঃসন্দেহে আগ্রহ জোগাবে।

"যুদ্ধ শেষে ক্যাম্প থেকে কয়েকটি কাঁচের জার উদ্ধার করা হয়, যার মধ্যে ফরমালিনে সংরক্ষিত ছিল মেয়েদের শরীরের বিভিন্ন অংশ। অংশগুলো কাটা হয়েছিল খুব নিখুঁতভাবে।"

- ডাঃ বিকাশ চক্রবর্তী, খুলনা

"আমাদের সংস্থায় আসা ধর্ষিতা নারীদের প্রায় সবারই ছিল ক্ষত-বিক্ষত যৌনাঙ্গ। বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ছিড়ে ফেলা রক্তাক্ত যোনিপথ, দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে ফেলা স্তন, বেয়নেট দিয়ে কেটে ফেলা স্তন-উরু এবং পশ্চাৎদেশে ছুরির আঘাত নিয়ে নারীরা পুনর্বাসন কেন্দ্রে আসত।"

-মালেকা খান, যুদ্ধের পর পুনর্বাসন সংস্থায় ধর্ষিতাদের নিবন্ধীকরণে যুক্ত সমাজকর্মী।

"কোনো কোনো মেয়েকে পাকসেনারা এক রাতে ৮০ বারও ধর্ষণ করেছে।"

-সুসান ব্রাউনি মিলার (এগেইনেস্ট আওয়ার উইল: ম্যান, উইম্যান এন্ড রেপ: ৮৩)

এই সব খণ্ড খণ্ড জবানবন্দী এই কথাই প্রমাণ করে যে, মুক্তিযুদ্ধের সময় ধর্ষণ সাধারণ কোনো যুদ্ধের ধর্ষণ নয়। এটা পাক বাহিনী শুধুই প্লেজারের জন্য করেনি, তারা এটা করেছে দায়িত্ববোধ থেকে। শুধু প্লেজারের জন্য বেয়নেট দিয়ে যোনিপথ খুঁচিয়ে রক্তাক্ত করতে হয় না, দাঁত দিয়ে স্তন ছিঁড়ে ফেলতে হয় না, দু'দিক থেকে পা টেনে চিঁরে ফেলতে হয় না, একজনকে আশিবার ধর্ষণ করতে হয় না।

খুলনার একটি ক্যাম্প থেকে যখন কাচের জারে ফরমালিনে সংরক্ষিত মেয়েদের

শরীরের বিভিন্ন অংশ পাওয়া যায় খুব নিখুঁতভাবে কাঁটা, যখন সিলেটের দেয়ালে ধর্ষকেরা সদম্ভে এঁকে রেখে যায় নিজেদের কৃতকর্ম; তখন বুঝে নিতে হয় এই ধর্ষণ দু'একজন সামরিক কর্মকর্তার বিচ্ছিন্ন মনোরঞ্জন নয়। তখন বুঝতে হয়, তারা এসব করেছিলো একটা এজেন্ডা বাস্তবায়ন করতে। আর সেই এজেন্ডার কথা সৈয়দ সামসুল হক তার কালজয়ী *নিষিদ্ধ লোবান* উপন্যাসে লিখেছেন সবচেয়ে সুন্দর করে।

"আমি তোমায় সন্তান দিতে পারব। উত্তম বীজ উত্তম ফসল। তোমার সন্তান খাঁটি মুসলমান হবে, খোদার ওপর ঈমান রাখবে, আন্তরিক পাকিস্তানি হবে, চাওনা সেই সন্তান? আমরা সেই সন্তান তোমাদের দেব, তোমাকে দেব, তোমার বোনকে দেব, তোমার মাকে দেব, যারা হিন্দু নয়, বিশ্বাসঘাতক নয়, অবাধ্য নয়, আন্দোলন করে না, শ্লোগান দেয় না, কমিউনিস্ট হয় না। জাতির এই খেদমত আমরা করতে এসেছি। তোমাদের রক্ত শুদ্ধ করে দিয়ে যাব, তোমাদের গর্ভে খাঁটি পাকিস্তানি রেখে যাব, ইসলামের নিশানা উড়িয়ে যাব। তোমরা কৃতজ্ঞ থাকবে, তোমরা আমাদের পথের দিকে তাকিয়ে থাকবে, তোমরা আমাদের সুললিত গান শোনাবে"

- নিষিদ্ধ লোবান, সৈয়দ শামসুল হক

তথ্যসূত্র:

- bn.wikipedia.org/wiki/বাংলাদেশেরস্বাধীনতাযুদ্ধ#cite_note-MathewWhite-8
- bn.wikipedia.org/wiki/শর্মিলাবসু#cite_note-DailyStarThoughts-11
- archive.thedailystar.net/forum/2006/december/skewing.htm
- sachalayatan.com/tanveer/17731
- opinion.bdnews24.com/2010/12/15/1971-rape-and-its-consequences/
- opinion.bdnews24.com/2010/12/01/rape-in-1971-in-the-name-of-pakistan/
- ব্রিগেডিয়ার আবদুল রহমান সিদ্দিকীঃ East Pakistan The EndGame
- জেনারেল খাদিম হুসাইন রাজাঃ অ্যা স্ট্রেঞ্জার ইন মাই ওন কান্ট্রি

আরিফ রহমান, গবেষণা কর্মকর্তা, গণহত্যা-নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা সংসদ কর্তৃক প্রবর্তিত 'তরুণ মুক্তিযুদ্ধ গবেষক সম্মাননা' প্রাপ্ত।

সংস্কৃতির ব্যাপ্তি এবং আমাদের শেকড়চ্যুতি

ফারহান কবীর সিফাত*

সংস্কৃতির ধারা পরিমাপ করতে চান! সোজা একটা সূত্র বলে দেই। সামগ্রিকভাবে আপনি গতকালের চেয়ে আজ কতটা ভালো আছেন শুধু এই হিসেবটা কষে ফেলুন। আপনার সংস্কৃতির ধারা সম্পর্কে একটা সম্যক ধারণা পেয়ে যাবেন। সংস্কৃতি হলো সুগন্ধির মতো। ব্যাপ্ত হওয়াই এর ধর্ম। আস্তে আস্তে বেশি ঘনত্বের স্থান হতে কম ঘনত্বের দিকে ধাবিত হবে এটাই নিয়ম। অর্থাৎ সংস্কৃতি চর্চা যেখানে বেশি হয় সেখান থেকে ব্যাপ্তি শুরু হয়। এ ব্যাপ্তির জন্য উপযুক্ত মাধ্যমও অত্যাবশ্যক। এতে করে সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এ ব্যাপ্তি বেগবান হয়। সংস্কৃতির অন্যতম সমৃদ্ধ শাখা হলো সংগীত। সংগীতকে ভালোবাসে না এমন মানুষ সম্ভবত খুঁজে পাওয়া যাবে না। সংগীতের কোনো ভাষা হয় না। সংগীত নিজেই একটি ভাষা। বিবর্তনের ধারায় সবকিছুর রদবদল হলেও স্থান, কাল, জাতিভেদে সংগীতের চলনে কোনো মতান্তর হয় না।

Yngwie Malmsteen (1963- Present) একজন সুইডিশ গিটারিস্ট ও গীতিকার। Malmsteen শুধু একটি নাম নয়; যাকে নিওক্লাসিক্যাল মেটাল মিউজিক এর জাদুকর বলা যেতে পারে। গিটারের তারে তাঁর অদ্ভুত তড়িৎ গতির "Shredding" এর কারণে তাঁকে "The King of Guitar Shred" বা অনেক সময় "The Guitar God" বলা হয়। তাঁর গিটার বাদন শুনছিলাম। হঠাৎ বেশ কয়েক জায়গায় আমার কান আটকে গেল। কারণ, সেখানে আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের অনবদ্য সৃষ্টির ছোঁয়া পেলাম। সংগীতে কাজী নজরুল ইসলাম যে সুরের ঝংকার ছড়িয়েছেন তার অনেক কিছুই আমি পেলাম Malmsteen এর গিটারবাদনে। ভীষণ গর্ববোধ হলো এবং একইসঙ্গে নিজের প্রতি মনে মনে ধিক্কার জানালাম। কেননা, প্রথমত আমি কাজী নজরুল ইসলামকে খুঁজতে যাইনি, খুঁজেছি Yngwie Malmsteen কে। অপ্রিয় হলেও সত্য, ভিনদেশী যেকোনো কিছুতেই যেন আমাদের আগ্রহ ও আস্থা দুই'ই বেশি । ইন্টারনেট অনুসন্ধানে Malmsteen কে খুব সহজে খুঁজে পেয়েছি। কাজী নজরুল ইসলাম পশ্চিমাদের কেউ হলে হয়তো তাঁকেই আগে পাওয়া যেত! এটা তুলনা কিংবা কাউকেই হেয় করার জন্য বলছি না। আসলে সংস্কৃতির কোনো সীমানা নেই। সংস্কৃতির পারস্পরিক আদান-প্রদান হতেই পারে এবং এটাই স্বাভাবিক। প্রযুক্তির কল্যাণে কাজটা আরও সহজ হয়ে গেছে। ইন্টারনেট এবং আকাশ সংস্কৃতির অবাধ ব্যাপনের দরুণ পৃথিবী আজ হাতের মুঠোয়। মুহূর্তের মধ্যেই আমরা পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে বিচরণ করতে পারছি। কখনও নিউইয়র্ক কখনও কলম্বিয়া, কখনও ইউরোপ কখনও অস্ট্রেলিয়া। নতুন করে কিছু খুঁজতে হলেই আমাদের দূরদেশের শরণাপন্ন হতে হয়। কারণ, ওরা শুধু গবেষণা করতে ভালোবাসে তা নয় ওরা ওদের চিন্তাকে কাজে রূপ দিতে জানে।

আমরা স্বাধীনতা লাভ করেছি দেরিতে তাই বলে এটা ভাবা ঠিক নয় যে আমাদের সংস্কৃতির ভাণ্ডার সংকীর্ণ। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে পশ্চিমাদের শক্ত অবস্থানের কারণে তারা খুব সহজেই পৃথিবীর সর্বত্র পৌঁছোতে পেরেছে। আমরা যেটাকে পশ্চিমা সংস্কৃতির আগ্রাসন বলি সেটা ঠিক নয়। সংস্কৃতি অনেকটা 'First come, first serve' এর মতো। আপনি যদি অভিনব কোনো কিছু সর্বাগ্রে প্রচলন করেন তবে সবাই আগে আপনাকেই অনুসরণ করবে। এরপর যদি কেউ ঐ সংশ্লিষ্ট কোনো কাজ বিস্তৃত করে তবে সবকিছুর আগে সবাই কাজটিকে আপনারই অনুকরণ বলে অভিহিত করবে। এটাই হয়ে আসছে। সংস্কৃতিতে আমরা দমবার নয়, আমরা হেরে গেছি পশ্চিমাদের ব্যাপ্তিকৌশলের কাছে। ওরা ইউটিউব তৈরি করেছে ওদের সংস্কৃতিকে মানুষের কাছে পৌছানোর জন্য। সংস্কৃতিতে আমাদেরও বিশাল ভাণ্ডার রয়েছে গর্ব করার মতো; কিন্তু আমরা পারিনি এমন কোনো প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে যেখান থেকে বিশ্ববাসীর কাছে আগেভাগেই পৌঁছানো যায়। পশ্চিমাদের সৃষ্ট মাধ্যম দিয়ে আমাদের সংস্কৃতির প্রচার করতে হয়। এটা আমাদেরই ব্যর্থতা। আমাদের দূরদর্শিতার দুর্বলতার দরুণ আমরা অনেক দুর্লভ সৃষ্টকর্মকে ধারণ করে রাখতে পারিনি। এজন্য অনেক সমৃদ্ধ শিল্পকর্ম হারিয়ে গেছে। ওগুলো রক্ষিত থাকলে হয়তো আজকের তরুণসমাজ খুব ভালোভাবেই আয়ত্ত করে সেগুলোর প্রসার ঘটাতে পারত। এটা আমাদের সংস্কৃতির দুর্বলতা নয়, এটা কৌশলগত ভুল। বিষয়টি হয়তোবা এমন যে, আজ পশ্চিমারা সংস্কৃতিতে যে প্রভাব রেখে চলেছে এমনিভাবে হয়তো আমরাও একটা প্রভাব রাখতে পারতাম। অদ্যাবধি সবকিছু বিচার-বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, আমাদের ক্ষেত্রে যে কোনো অর্জনকে ধরে রাখার চেয়ে হারানোর ভাগটাই যেন বেশি। নিচে এমন কিছু কিংবদন্তির কথা তুলে ধরছি যারা বিশ্বমঞ্চের উজ্জ্বল নক্ষত্র হওয়ার মতো যোগ্যতা পোষণ করেন বা করতেন অথচ আমরা তাঁদেরকে যথার্থ মূল্যায়ন করতে পারিনি অথবা বলা যেতে পারে বিশ্ববাসীর সামনে তাঁদেরকে পুরোপুরি মেলে ধরার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যর্থ হয়েছি।

বিশ্ববিখ্যাত সেতারবাদক আমাদের গর্ব শ্রদ্ধেয় রবি শংকর এর কথা আমাদের সবার জানা। মুক্তিযুদ্ধকালীন তাঁর অবদান আমরা ভুলতে পারব না। তাঁর অনুরোধেই জগদ্বিখ্যাত ব্যান্ড 'বিটল্‌স' এর গায়ক ও গিটারিস্ট 'জর্জ হ্যারিসন' স্ব-প্রণোদিত হয়েই বাংলাদেশকে নিয়ে এক কালজয়ী গান সৃষ্টি করেছিলেন যা মুক্তিযুদ্ধকালীন বিধ্বস্ত বাংলাদেশকে বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরেছিল। প্রাচ্যের একজন প্রথিতযশা ক্লাসিক্যাল মিউজিসিয়ান হয়েও পাশ্চাত্যের খ্যাতনামা সব রক মিউজিসিয়ানের সঙ্গে রবি শংকরের সখ্য এটাই প্রমাণ করে যে, সংস্কৃতিকে কোনো নিয়মে বেঁধে রাখা যায় না। তারের যন্ত্র হিসাবে সেতার ভারতীয় উপমহাদেশের আবিষ্কার অন্যদিকে গিটার পশ্চিমাদের আবিষ্কার। সংস্কৃতির বিনিময়প্রথায় কোনো যন্ত্রই কারো বিকল্প হয়ে দাঁড়ায়নি বরং প্রয়োজনের তাগিদে একীভূত হয়ে নতুন কিছুর জন্ম দিয়েছে। শুধু প্রযুক্তিগত প্রচারণাই আসল পার্থক্যটা গড়ে দিয়েছে। যার জন্য আমরা সেতারকে একেবারে ভুলে গিয়েছি, গিটারকে প্রাধান্য দিয়েছি। তরুণ প্রজন্মের অনেকেই

সম্ভবত সেতার দেখেও তার নাম বলতে পারবে না যতটা না গিটার নিয়ে বলতে পারবে। এ দায় তরুণ প্রজন্মের নয়, এ দায় আমাদের সবার।

লালন ফকির তৎকালীন সমাজের চিরাচরিত নিয়মের বাইরে গিয়ে শুধু নয় সমাজচ্যুতির ভয় ও সমাজের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করেও সংগীত রচনা করেছেন এমন সর্বজনীন অসংখ্য গান। মানবধর্মকে সম্মুখে আনতে রীতিমতো নাকানি-চুবানি খেতে হয়েছে তবু দমে যাননি। তাঁর গানের মাধ্যমেই উনিশ শতকে বাউল গান বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করে যার ধারাবাহিকতায় দেরিতে হলেও ২০০৫ সালে ইউনেস্কো বাউল গানকে বিশ্বের মৌখিক এবং দৃশ্যমান ঐতিহ্যসমূহের মাঝে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ হিসেবে ঘোষণা করে। তাঁর গান ও দর্শন যুগে যুগে প্রভাবিত করেছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম ও অ্যালেন গিন্সবার্গের মতো বহু খ্যাতনামা কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক, বুদ্ধিজীবীসহ অসংখ্য মানুষকে। গান্ধীরও ২৫ বছর আগে, ভারত উপমহ-াদেশে সর্বপ্রথম, তাঁকে 'মহাত্মা' উপাধি দেয়া হয়েছিল। দুঃখজনক হলেও সত্য, যে মহামানব তাঁর সৃষ্টকর্ম দ্বারা জীবনদর্শনের সম্পূর্ণ নতুন একটি অধ্যায়ের সূচনা করেছেন তাঁকে আমরা বিশ্বদরবারে সেভাবে তুলে ধরতে পারিনি এবং তাঁর অদ্বিতীয় সৃষ্টকর্মগুলোও যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে পারিনি।

"আমি কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে।"

গানটি হয়তোবা অনেকে নাও শুনতে পারেন। তবে "আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি" আমাদের কারো অজানা নয়। কালক্রমে এটি বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। অথচ 'আমার সোনার বাংলা' এর সুর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সংগ্রহ করেছিলেন গগন হরকরার রচিত উপর্যুক্ত গান হতে। গগন হরকরা (গগনচন্দ্র দাম, ১৮৪৫-১৯১০) বাংলা লোকসংগীতশিল্পী, সংগীত রচয়িতা এবং বিশিষ্ট বাউল গীতিকার। গগন হরকরার উচ্চতা আমরা অনুধাবন করতে না পারলেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গুণমুগ্ধ ছিলেন। কবিগুরু গগনের কাছে গগন ও লালনের গান শুনতেন। একবুক হতাশা নিয়ে বলতে হয়, প্রাপ্তিস্বীকার তো দূরের কথা দিনশেষে আমরা গগন হরকরাকে কেউ মনে রাখিনি।

"জানত যদি হাসন রাজা বাঁচবে কতদিন
বানাইত দালান-কোঠা করিয়া রঙিন
লোকে বলে ও বলে রে
ঘর-বাড়ি ভালা নাই আমার।"

পৃথিবীর মায়া তাঁকে টানতে পারেনি তাই হয়ত অর্থ-বিত্তের প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও হাসন রাজা এমন চরণের অবতারণা করেছিলেন।

অহিদুর রেজা বা দেওয়ান হাসন রাজা চৌধুরী (ছদ্মনাম) (২১ ডিসেম্বর ১৮৫৪-৬ ডিসেম্বর ১৯২২); বাংলাদেশের একজন মরমী কবি এবং বাউল শিল্পী। দর্শনচেতনার নিরিখে লালনের পর যে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নামটি আসে, তা হাসন রাজার। তিনি কোনো

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করেননি। সহজ-সরল সুরে আঞ্চলিক ভাষায় তিনি প্রায় সহস্রাধিক গান রচনা করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯২৫ সালে Indian Philosophical Congress-এর প্রথম অধিবেশনে সভাপতি নির্বাচিত হলে সভাপতির অভিভাষণে তিনি প্রসঙ্গক্রমে হাসন রাজার দুটি গানের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করে তাঁর দর্শনচিন্তার পরিচয় দেন। ১৯৩০ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে 'হিবার্ট লেকচারে' রবীন্দ্রনাথ 'The Religion of Man' নামে যে বক্তৃতা দেন তাতেও তিনি হাসন রাজার দর্শন ও সংগীতের উল্লেখ করেন। দুঃখের বিষয় এই যে, বর্তমান প্রজন্ম এই মহামানবকে যথার্থ জানতে পারেনি আর বিশ্ববাসীকে জানান দেবে সেটাও কল্পনাতীত।

বাউল গান মাটির কথা বলে, সরল উপলব্ধির কথা বলে। এমন উপলব্ধি আর উপমার সম্মিলন ঘটেছে যার প্রতিটি সৃষ্টকর্মে তিনি শাহ আবদুল করিম (১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯১৬ -১২ সেপ্টেম্বর ২০০৯)। ভাটি অঞ্চলের মানুষের জীবনের সুখ-প্রেম-ভালোবাসার পাশাপাশি তার গান কথা বলে সকল অন্যায়, অবিচার, কুসংস্কার আর সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে। জীবনের একটি বড় অংশ তিনি লড়াই করেছেন দরিদ্রতার সঙ্গে। দারিদ্র্য কৃষিকাজে তার শ্রম ব্যয় করতে বাধ্য করলেও গান সৃষ্টি করা থেকে বিরত রাখতে পারেনি। স্বশিক্ষিত বাউলসাধক শাহ আব্দুল করিম এ পর্যন্ত প্রায় পাঁচ শতাধিক গান লিখেছেন এবং সুরারোপ করেছেন। বাংলা একাডেমির উদ্যোগে তাঁর ১০টি গান ইংরেজিতে অনূদিত হয়েছে। মাটির গানের এই কিংবদন্তিকেও আমরা হেলায় হারিয়েছি।

ফিরোজা বেগম (২৮ জুলাই ১৯৩০- ৯ সেপ্টেম্বর ২০১৪) বাংলাদেশের প্রথিতযশা নজরুলসংগীত শিল্পী ছিলেন। সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশে তিনি নজরুলসংগীতের জন্য বিখ্যাত হয়ে আছেন। ভারতীয় উপমহাদেশে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তাঁকে বাংলা সংগীতের প্রতীকীরূপ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। দশ বছর বয়সে ফিরোজা বেগম কাজী নজরুলের সান্নিধ্যে আসেন এবং তাঁর কাছ থেকে তালিম গ্রহণ করেন। কাজী নজরুল অসুস্থ হওয়ার পর ফিরোজা বেগম নজরুলসংগীতের শুদ্ধ স্বরলিপি ও সুর সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তিনি ৩৮০টির বেশি একক সংগীতানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন। নজরুলসংগীত ছাড়াও তিনি আধুনিক গান, গজল, কাওয়ালি, ভজন, হামদ ও নাত-সহ বিভিন্ন ধরনের সংগীতে কণ্ঠ দিয়েছেন। জীবদ্দশায় তাঁর ১২টি এলপি, ৪টি ইপি, ৬টি সিডি ও ২০টিরও বেশি অডিও ক্যাসেট প্রকাশিত হয়েছে। বহু অর্জনে সিক্ত পুরোধা এ শিল্পীকেও আমরা বিশ্বদরবারে সেভাবে তুলে ধরতে পারিনি।

আজম খান, পুরো নাম 'মোহাম্মদ মাহবুবুল হক খান' (২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫০-৫ জুন, ২০১১) কে বাংলাদেশের পপ ও ব্যান্ডসংগীতের একজন অগ্রপথিক বা পপগুরু হিসেবে গণ্য করা হয়। বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গেলে সংস্কৃতির বিনিময় জরুরি। এটা বেশ উপলব্ধি করেছিলেন আজম খান। যুবসমাজকে উদ্দীপিত রাখতে তিনিই শুরু করেছিলেন পপ ও রক মিউজিকের প্রচলন। পাশ্চাত্য ধারার এই মিউজিক আমাদের অনেকের কাছেই বিষফোঁড়ার ন্যায় বিবেচিত হলেও তরুণসমাজ

খুব ভালোভাবেই ঝুকে পড়ে এই নতুন ধারার গানে। হতাশাকে দূরে ঠেলে যেন নতুন এক উদ্দাম পেয়েছিল তৎকালীন যুবসমাজ। বাংলাদেশে আজ বিশ্বমানের যেসব ব্যান্ডদল সৃষ্টি হয়েছে এবং ব্যান্ডসংগীতে যে গণজোয়ার তা এই পপস্ম্রাট আজম খানের উত্তরসূরিতার ফল। যুদ্ধ পূর্ববর্তী তাঁর গাওয়া গান প্রশিক্ষণ শিবিরে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রেরণা যোগাতো। শেষজীবনে ব্যান্ডসংগীতের এ অগ্রদূতকেও ভীষণ অর্থকষ্ট আর অবহেলায় দিনাতিপাত করতে হয়েছে। আমরা পারিনি তাঁকে যোগ্য সম্মানে সম্মানিত করতে যিনি তৎকালীন যুবসমাজকে এক নতুন পথের সন্ধান দিয়েছিলেন।

রুনা লায়লা (১৭ নভেম্বর ১৯৫২- বর্তমান) একজন খ্যাতনামা বাংলাদেশী কণ্ঠশিল্পী। তাঁর গান শুনে মন ভরেনি এমন মানুষ পাওয়া যাবে না। বাংলা, উর্দু, পাঞ্জাবি, হিন্দি, সিন্ধি, গুজরাটি, বেলুচি, পশতু, ফার্সি, আরবি, মালয়, নেপালি, জাপানি, স্পেনীয়, ফরাসি, লাতিন ও ইংরেজি ভাষাসহ মোট ১৮টি ভাষায় ১০ হাজারেরও বেশি গান করেছেন।

তিনি বাংলাদেশে চলচ্চিত্র, পপ ও আধুনিক সংগীতের জন্য বিখ্যাত; তবে বাংলাদেশের বাইরে গজল শিল্পী হিসেবে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশে তাঁর সুনাম আছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার আগে থেকেই তিনি চলচ্চিত্রের গায়িকা হিসেবে কাজ শুরু করেন। বাংলাদেশ ছাড়াও ভারতীয় এবং পাকিস্তানী চলচ্চিত্রের অনেক গানে তিনি কণ্ঠ দিয়েছেন। গুণী এ শিল্পীকে আমরা তাঁর যোগ্য স্থান করে দিতে পারিনি যিনি একজন বাংলাদেশী হয়েও বিশ্বমঞ্চে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার সব যোগ্যতা রাখেন।

"আমি তোর পিরিতের মরা
তুই চাইয়া দেখনা এক নজর
অপরাধী হইলেও আমি তোর।"

কী এক আবদারপূর্ণ আকুতি; সে হোক কণ্ঠ অথবা বাঁশি। এমনি করে বিচ্ছেদের অনলে পোড়া হৃদয়ের অবলম্বন হয়েছেন তিনি।

বারী সিদ্দিকী (১৫ নভেম্বর ১৯৫৪ - ২৪ নভেম্বর ২০১৭) বাংলাদেশের একজন খ্যাতিমান সংগীত শিল্পী, গীতিকার ও বংশী বাদক। তিনি মূলত গ্রামীণ লোকসংগীত ও আধ্যাত্মিক ধারার গান করতেন। বংশীবাদক বারী সিদ্দিকী কথাসাহিত্যিক ও চিত্রনির্মাতা হুমায়ূন আহমেদের প্রেরণায় নব্বইয়ের দশকে সংগীত জগতে প্রবেশ করেন এবং অল্পদিনেই বিরহ-বিচ্ছেদের মর্মভেদী গানের মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের হৃদয়ে স্থায়ী আসন করে নেন। ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে জেনেভায় অনুষ্ঠিত বিশ্ব বাঁশি সম্মেলনে ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে তিনি অংশগ্রহণ করেন। ডাকাতিয়া বাঁশির এই জাদুকরকে আমরা বুঝতে পেরেছি বড় দেরি করে অর্থাৎ তাঁর মৃত্যুর পর।

"সেই যে চলে গেলে

আর হায় এলেনা ফিরে
কত যে খুঁজেছি তোমায়
অকারণ অশ্রুজলে।"

অশ্রুজল যে অকারণেও হয় এটা যিনি তাঁর অনবদ্য সৃষ্টির মাধ্যমে দেখিয়ে দিয়েছেন তিনি বাংলাদেশের গিটার মাইলস্টোন নিলয় কুমার দাস (১৯৬১ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর- ২০০৬ সালের ১১ জানুয়ারি)। শিখেছিলেন নজরুল সংগীত। শিখতেই যে হবে; উপমহাদেশের বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ, নজরুল সংগীত স্বরলিপিকার ও গবেষক ওস্তাদ সুধীন দাস এবং সংগীত শিল্পী নীলিমা দাস যে সেই সন্তানের পিতামাতা। বাংলাদেশের সংগীত জগতের আরেক দিকপাল হ্যাপি আখন্দের সঙ্গে ছিল তার বন্ধুত্ব। বন্ধুর উৎসাহ আর পরামর্শে তিনি হাতে তুলে নেন গিটার। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের রং মিলিয়ে বাংলাদেশের সংগীত জগতে যোগ করলেন একের পর এক আধুনিক গানের সৃষ্টি। বাংলাদেশের সংগীত পরিমণ্ডলে তিনিই মূলত প্রথম পরিচয় করিয়েছিলেন কান্ট্রি, ব্লুজ, রক, ওয়েস্টার্ন ক্লাসিক্যাল, নিও ক্লাসিক্যাল, ফ্ল্যামেঙ্কো, জ্যাজসহ আরো অনেক পাশ্চাত্য সংগীতের শাখার সঙ্গে। তিনিই বাংলাদেশে প্রথম ইন্সট্রুমেন্টাল কনসার্ট করে ব্যাপক সুনাম অর্জন করেছিলেন। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি'র গিটার শিক্ষক পদে থাকার সুবাদে নিলয় দাস ভারতীয় উপমহাদেশের বিশিষ্ট সংগীত ব্যক্তিত্ব গোলাম আলী, মেহেদী হাসান সহ আরো অনেক গুণীজনের সঙ্গে গিটার সংগতের অভূতপূর্ব সুযোগ লাভ করেন এবং দাপটের সঙ্গে নিজের ও দেশের নাম অক্ষুণ্ন রাখেন। "নিলয় আসলে গিটার বাদক নয়, সত্যিকার অর্থে এক গিটার সাধক"- নিলয় দাসের সম্পর্কে মূল্যায়ন করতে গিয়ে এভাবেই বলেছিলেন বাংলাদেশের গুণী সংগীতজ্ঞ ওস্তাদ নিয়াজ মোহাম্মদ চৌধুরী। অত্যন্ত লজ্জা ও পরিতাপের বিষয় এই যে, তাকে সেভাবে কোনো সময় সবার সামনে তুলে ধরা হয়নি, তাঁকে নিয়ে কোনো গবেষণামূলক লেখাও হয়নি ।

জোর করে চেয়ে নয় মাইল্সের প্রতি প্রেম আপনাআপনি চলে আসে। মাইল্স এমন একটি ব্যান্ড যাদের কথা এলে আমার একটা ধারণা খুব স্পষ্টভাবে মাথায় আসে তা হলো কণ্ঠ, যন্ত্র, শব্দ কিংবা উপস্থাপনশৈলীতে প্রজন্মের পর প্রজন্মকে ছাপিয়ে যাওয়া। অর্থাৎ এ ব্যান্ডের জন্মলগ্ন থেকেই তারা যেন অনন্য এবং সর্বাধুনিক। বয়স বাড়লেও যুগের সঙ্গে তারা পিছিয়ে নয় বরং সবসময় এগিয়ে রয়েছেন। মঞ্চে এবং মঞ্চের বাইরে তাদের চাল-চলন, পোশাক-পরিচ্ছদ সর্বোপরি 'অ্যাটিচিউড' এক কথায় অসাধারণ ও অনুকরণীয়। মাইল্স এর জন্ম ১৯৭৯ সালে। ১৯৮২ সালে তারা তাদের প্রথম অ্যালবাম বের করে ইংরেজি ভাষায়। ১৯৯৩ সালে 'প্রত্যাশা' অ্যালবামটি বের হওয়ার কয়েক মাসের ভেতরেই তিন লক্ষ কপি বিক্রি হয় যা এখনও এই দেশে সবচেয়ে বেশি বিক্রি হওয়া মিউজিক অ্যালবামগুলোর অন্যতম। ঘটনাবশত ব্যান্ডের সদস্য হামিন এবং শাফিন আহমেদ হলেন ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যতম প্রথিতয-শা সংগীতশিল্পী, সুরকার ও সংগীত পরিচালক কমল দাশগুপ্ত এবং বহুল প্রচলিত নজরুল সংগীতের একনিষ্ঠ সাধক ফিরোজা বেগম দম্পতি'র পুত্রদ্বয় এবং মানাম

আহমেদের বাবা বাংলাদেশের বিশিষ্ট সংগীত পরিচালক মনসুর আহমেদ। কণ্ঠ, যন্ত্র, শব্দ কিংবা উপস্থাপনশৈলীতে সমান পারদর্শী হয়েও বাংলাদেশে জন্ম নেওয়া বিশ্বমানের এই ব্যান্ডটি কোনো এক অজানা কারণেই যেন বিশ্বমঞ্চে স্থায়ী জায়গা করে নিতে পারেনি।

কী অজপাড়া গাঁ আর কী শহর-নগর-বন্দর! বাংলাদেশ ছাড়াও বহির্বিশ্ব যার সুরের দোলায় দুলে ওঠে তিনি এদেশের কিংবদন্তি রকস্টার ফারুক মাহফুজ আনাম জেমস (২ অক্টোবর ১৯৬৪- বর্তমান)। তিনি তার ভক্তদের কাছে 'গুরু' নামে পরিচিত। জেমস বর্তমানে নগর বাউল ব্যান্ডের প্রধান গিটারিস্ট এবং ভোকালিস্ট, যা পূর্বে ফিলিংস নামে পরিচিত ছিল। তিনি তার স্বতন্ত্র কণ্ঠ এবং স্টাইলের জন্য বাংলাদেশ এবং ভারতের সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে সমান জনপ্রিয়। বাংলা ভাষায় তিনিই প্রথম সাইকিডেলিক রক শুরু করেন। আমরা বব মার্লেকে নিয়ে গবেষণা করলেও কেন জানি বাংলাদেশের কালজয়ী সত্যিকারের এ রকস্টারকে ভুলে যাই!

"হাসতে দেখো গাইতে দেখো
অনেক কথায় মুখর আমায় দেখো
দেখো না কেউ হাসি শেষে নীরবতা।"

মাত্র ৬০০ টাকা নিয়ে ঢাকা এসেছিলেন এই মানুষটি। স্বপ্ন তাঁর গানই করবেন, বড় শিল্পী হবেন আর গিটারের সুরে মোহিত করবেন সংগীতপিপাসুদের। করেছেনও সত্যি তাই। কোনো উপায় নেই এই মানুষটিকে ভুলে যাবার, আমাদের সংগীতে তাঁর অবদানকে অস্বীকার করার। গিটারবিলাসী এই জাদুকর এমন কোনো ব্রান্ডের গিটার নেই যে ছুঁয়ে দেখেননি। বিশ্বের নামিদামি ব্রান্ডের কমপক্ষে ৬০টি গিটার ছিল তাঁর সংগ্রহে। তিনি আইয়ুব বাচ্চু (১৬ আগস্ট, ১৯৬২-১৮ অক্টোবর, ২০১৮)। আমাদের মিউজিক ইণ্ডাস্ট্রি'র ভবিষ্যৎ গড়তে গিটারের এই জাদুকর জীবন সায়াহ্নেও হাল ছাড়েননি। দৃঢ় কণ্ঠে সবসময় বলেছেন, 'The show must go on.' পিছে ফেলে যান অনেক যন্ত্রণা, ক্ষোভ আর অভিমান। এভাবেই অকাল প্রয়াণ ঘটেছে এ যোদ্ধার। তাঁর এই হঠাৎ চলে যাওয়া আমাদের সংগীত জগতের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি। হাসিমুখে তাঁকে বিদায় দেওয়া হয়নি আমাদের। এ এক নিদারুণ ব্যর্থতা!

আমরা আধুনিক হতে অত্যাধুনিক হতে পারি, ভিনদেশীদের অনুকরণে নিজেদের মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টায় মত্ত হতে পারি কিন্তু কখনোই যেন নিজেদের অস্তিত্বকে বিলিয়ে দিয়ে আমাদের সংস্কৃতির স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্যকে হেয় না করি অর্থাৎ আমাদের শেকড়কে যেন ভুলে না যাই। শেকড়কে ভুলে গেলে তা হবে চরম অন্যায়।

তথ্যসূত্র: newsg24.com
Wikipedia

ফারহান কবীর সিফাত
প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও প্রতিষ্ঠাকালীন সাংস্কৃতিক সম্পাদক
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা সংসদ

বাংলা গান সৃজনে নজরুল-বিশেষত্ব

ইদরিস আলী*

মুখ্য শব্দগুচ্ছ: ঘারানা, হিন্দুস্থানী সংগীত, কর্ণাটকী সংগীত, সাম্প্রদায়িক, গীতিকার, গীতিকবি, যুগস্রষ্টা।

শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান, ধর্ম-দর্শন, সমাজনীতি ও সামাজিক আচার-পালা-পার্বণ প্রভৃতির ক্রমবিকাশ, বিবর্তন ও বিবর্ধনের অন্তরালে থাকে যেমন একটি সুনিপুণ ঐতিহ্য; তেমনিভাবে আমাদের উপমহাদেশীয় সংগীতের ইতিহাসে আছে নিত্য নূতন ভাঙা গড়ার মধ্য দিয়ে এক সৃজনশীল ঐতিহ্যগত ক্রমবিকাশের গতিধারা। সেই আদিম ও প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে যাত্রা শুরু করে আমাদের উপমহাদেশীয় সংগীত ইতিহাসের অনেক স্তর পেরিয়ে তথা ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের ধারায় সন্তরণ করে আজ বর্তমান যুগে অর্থাৎ আধুনিক বিজ্ঞানের উন্নত যুগে উপনীত হয়েছে। একটি জাতির ইতিহাস গড়ে ওঠে যেমন শিল্প সংস্কৃতি, ধর্ম-দর্শন, জ্ঞান-বিজ্ঞান, আচার-ব্যবহার ও সমাজ-সভ্যতার পারস্পরিক সাহচর্য নিয়ে, তেমনিভাবে আমাদের উপমহাদেশীয় সংগীতের আজকের বিজ্ঞানসম্মত রূপ গঠিত হয়েছে সেই প্রাগৈতিহাসিক তথা অনুন্নত অনুর্বর আদিম যুগ থেকে যাত্রা শুর করে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, উন্নত ও সৃজনশীল গতিমুখী ক্রমবিকাশের পথ ধরে। ক্রমবিকাশের এই পথ পরিক্রমা আবার তদীয় সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় রীতিনীতির দ্বারাও যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছে। ফলে ভাষা, আচার-ব্যবহার, সামাজিক রীতিনীতি, ধর্মীয়-শৃঙ্খলা, শিক্ষার মাধ্যম, জলবায়ু ও প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে অঞ্চলভিত্তিক ভিন্নতা ও পার্থক্যের কারণে সংগীত বিষয়েও সৃষ্টি হয়েছে আভ্যন্তরীণ ভেদ-মতভেদ।

স্বতন্ত্র অঞ্চল বা আঞ্চলিক ঐক্য নিয়েই আমাদের উপমহাদেশীয় সংগীত দুটি পদ্ধতিগত ধারায় বিভক্ত হয়ে যায়। একটি উত্তর-ভারতীয় তথা হিন্দুস্থানী সংগীত পদ্ধতি এবং অন্যটি দক্ষিণ-ভারতীয় তথা কর্ণাটকী সংগীত পদ্ধতি। কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬ খ্রিঃ) ছিলেন উত্তর-ভারতীয় সংগীত পদ্ধতির একজন সৃজনশীল সংগীতজ্ঞ।

নজরুলের গানের অবয়ব ও বৈশিষ্ট্য জানতে হলে অগ্রে উত্তর-ভারতীয় সংগীত পদ্ধতির অবকাঠামো সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, আনুমানিক খ্রিষ্টীয় ১৬শ-১৭শ শতাব্দীর সংগীতে উত্তর- ভারতীয় ও দক্ষিণ-ভারতীয়- এ দু'টি পৃথক ধারার সূত্রপাত ঘটে। আরো পেছনের ইতিহাসে দৃষ্টি ফেরালে দেখা যায় যে, খ্রিষ্টীয় ১১শ-১২শ শতাব্দীতে উত্তর ও পশ্চিম ভারতে মুসলমান সংগীত কলাবিদদের অনুপ্রবেশ শুরু হয়। সুলতান আলাউদ্দীন খিলজীর (১২৯৬-১৩১৬ খ্রিঃ) রাজত্বকালে বিশিষ্ট কবি ও সংগীতজ্ঞ তথা সংগীত-নায়ক

হজরত আমীর খসরু আরব্য পারস্য সংগীতের সঙ্গে আমাদের উপমহাদেশীয় সংগীতের মিশ্রণ ঘটিয়ে উত্তর-ভারতীয় সংগীতের চরম উন্নতি, বিকাশ ও সংস্কার সাধন করেন। মূলত, সেই সময়ে উত্তর-ভারতীয় সংগীত স্বতন্ত্র আভিজাত্য নিয়ে দক্ষিণ- ভারতীয় সংগীত থেকে পরিপূর্ণভাবে পৃথক হয়ে যায়। এই পার্থক্য সুস্পষ্ট হয় খ্রিষ্টীয় ১৭শ-১৮শ তে। বর্তমান মাদ্রাজ, মহীশূর, অন্ধ্র প্রভৃতি বিন্ধ্যাপর্বতের দক্ষিণে সমগ্র দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত সংগীতকে দক্ষিণ-ভারতীয় বা কর্ণাটকী সংগীত পদ্ধতি বলা হয়। অন্যদিকে বাংলাদেশসহ সমগ্র উত্তর পশ্চিম ভারতবর্ষে প্রচলিত সংগীতকে উত্তর- ভারতীয় বা হিন্দুস্থানী সংগীত পদ্ধতি বলা হয়।

অন্যদিকে মধ্যযুগের মুসলিম সংগীতকলাবিদদের দ্বারা হিন্দুস্থানী পদ্ধতির সংগীতে আমূল পরিবর্তন ও সংস্কার সাধিত হয়। ফলে উত্তর-ভারতীয় সংগীত পদ্ধতিতে যুক্ত হয় খেয়াল-রীতি বা খেয়ালী ধারা অর্থাৎ মুসলমানী ঘারানা। পরবর্তীতে এই ঘারানায় যুক্ত হয় ঠুমরী, টপপা, দাদ্‌রা, গজল ইত্যাদি সুরের কারুকাজপূর্ণ রঙদার শাস্ত্রীয়ধারা। কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন এই ধারার যোগ্য উত্তরসূরী। নজরুলের গানের সুর, তাল, লয় ও গায়কীসহ বিবিধ অলংকারিক ক্রিয়াকলাপ উত্তর ভারতীয় সংগীত পদ্ধতির মুসলমানী ঘারানা দ্বারা পরিপুষ্ট। স্মর্তব্য যে, এখানে 'হিন্দুয়ানী ঘারানা' ও 'মুসলমানী ঘারানা' পরিভাষাদ্বয় আদৌ সাম্প্রদায়িক অর্থে নয়, সংগীতের পদ্ধতিতে পার্থক্য বিচারে ব্যবহৃত হয়েছে মাত্র।

নজরুলসংগীতের বিভিন্ন পর্ব বা শ্রেণির বৈশিষ্ট্যগুলি স্বতন্ত্রভাবে নিরূপণ করলেই সার্বিক বৈশিষ্ট্য নির্ণয় সহজসাধ্য হয়। বাংলা গান লঘু সংগীত পর্যায়ভুক্ত। এ গানের প্রথম শর্ত হলো কাব্যিকাংশ অর্থাৎ বাণী বা লিরিকস্। কারণ, বাক্য ব্যতীত বাংলা গান একেবারেই অসম্ভব। অন্যদিকে বাংলা গানের কাব্যিকাংশ শাস্ত্রীয় সংগীতের রাগ রাগিণী দ্বারা সুরস্নাত হয়ে, বিভিন্ন গায়কী-ঢঙ দ্বারা অবকাঠামো বা শ্রেণিবিন্যাসগত অবয়ব সূচিত হয়। ফলে গানটি একটি স্বতন্ত্র শ্রেণির রূপ পরিগ্রহ করে। এখানে কাব্য আছে বলেই গানটিকে 'কাব্যগীতি' বলতে হবে– বাংলাগানের শ্রেণিবিন্যাসের পদ্ধতিতে তার কোনোই অবকাশ নেই।

বাংলা গান তথা লঘু সংগীতকে সর্বময় দুটি পদ্ধতিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিভাজন করা হয়ে থাকে। প্রথমত সাংগীতিক পদ্ধতি, ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল, ঠুমরী, টপ্পা, দাদ্‌রা, গজল, রুমট, কাওয়ালী, আধুনিক, রাগ-প্রধান ইত্যাদি শ্রেণির বাংলা গান সাংগীতিক পদ্ধতি দ্বারা বিভাজিত হয়ে থাকে। এই সব শ্রেণিভুক্ত গানের কাব্যিকাংশের আকার, কাব্যিকভাব, গায়কীমান, রাগসুরের ব্যবহার ও প্রয়োগ ইত্যাদিতে শাস্ত্রীয় রীতির স্বতন্ত্র অনুকৃতি ঘটে। ফলে গানগুলি একে অপর থেকে স্বতন্ত্ররূপে প্রকাশ পায়। কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর গান রচনার ক্ষেত্রে এই সাংগীতিক পদ্ধতিকে বেশিমাত্রায় প্রাধান্য দিয়েছেন। মূলত নজরুলের গানের এ এক অনন্য বৈশিষ্ট্য। দ্বিতীয়ত বিষয়বস্তুগত পদ্ধতি। এই পদ্ধতির

অন্তর্ভুক্ত; যেমন– দেশাত্মবোধক, উদ্দীপনামূলক, আগমনী, প্রার্থনা, শ্যামাসংগীত, ভজন ইত্যাদি শ্রেণির গান। স্বল্প ক্ষেত্রেই নজরুলের গান বিষয়বস্তুগত পদ্ধতি দ্বারা বিভাজিত বা শ্রেণিবিন্যাসিত হয়েছে। আমরা দেখতে পাই যে, বাংলা গানের দিকপাল কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান একমাত্র বিষয়বস্তুগত পদ্ধতি দ্বারা শ্রেণি বিন্যাসিত হয়েছে। শ্রেণিবিন্যাসের এই দ্বৈত পদ্ধতি দ্বারা নজরুল ও রবীন্দ্রনাথের গান পরস্পর থেকে খুব সহজেই পৃথক হয়ে যায়।

সাংগীতিক পদ্ধতিতে বিভাজিত গানের আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যই একটি স্বতন্ত্র ধারার গানের সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য বহন করে থাকে। একটি বাংলা গান রচনা করলেই প্রথমে তা হয় একজন গীতিকারের রচিত বিভাজিত গীতি-কবিতা। এরপর সুর ছন্দ প্রয়োগ করলে হয় গান। সবশেষে গীতিকার যদি হন গীতিকবি তখন সে গানের মধ্যে আরো কিছু বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সাংগীতিক উপকরণ প্রযুক্ত হয়ে তা সংগীতরূপ ধারণ করে। যেমন– রাগসুরের প্রয়োগকৌশল, গায়কী কলা, গানের বাণীভাবের সঙ্গে রাগসুরের সামঞ্জস্য বিধান, গায়কীকলার সঙ্গে গানের অঙ্গ বা পদের সমন্বয় সাধন, গানের অঙ্গ ও গায়কীর সঙ্গে ছন্দপ্রকরণে তাল নির্বাচন এবং গীতিকবির রসবোধ ও অভিজ্ঞতার নান্দনিক স্বরূপ যখন মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় তখন জনরুচির অঙ্গনে সে গান শাশ্বতকাল ধরে সমাদৃত হয়ে থাকে। নজরুলের সমগ্র সংগীতসম্ভার এই মাপকাঠিতেই নির্মিত হয়েছে। তাঁর গানের আঙ্গিকগুলি স্বতন্ত্রভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করলেই উপরোক্ত বিধিবিধানসমৃদ্ধ সংগীত উপকরণগুলি খুব সহজেই পরিলক্ষিত হয়। আর গানের গূঢ় রহস্য ও তত্ত্বকথা বা তাত্ত্বিক বৈভব এখানেই নিহিত আছে। নজরুলের গানের বৈশিষ্ট্য নির্ণায়নের মৌলিক উপকরণে তাঁর আপন সত্তা, বিশেষ করে তাঁর কবিসত্তা ও গীতিসত্তা অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে মিশে আছে। তাঁর প্রত্যেক শ্রেণি বা অঙ্গ বা পর্যায়ের গানের মধ্যে স্ব স্ব আঙ্গিকের ভাবধারা সুনিপুণভাবে প্রযুক্ত হয়েছে।

কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর গানের মধ্যে সব সময় বৈচিত্র্য খুঁজেছেন বেশিমাত্রায়। গানের মধ্যে সুরের সৌকর্য ও আবেগময় ব্যঞ্জনা এবং গায়কীতে রাগসংগীতানুগ রঞ্জকতার প্রতি নজরুলের ছিল প্রগাঢ় আকর্ষণ। তাই দেখা যায়, নজরুলের গান মূলতই রাগসংগীতানুগ। একটি রাগের সামগ্রিকতার আলোকে নজরুল তাঁর গানের সুরায়ন করেছেন, আর গায়কীকলার আদর্শটি বিনির্মিত হয়েছে সেই রাগসুরের আদল ঘিরে। আর সেই আদলের সঙ্গে মিশে আছে গানের শ্রেণিবিন্যাসগত ভাবধারা এবং গীতিকবি হিসাবে নজরুলের ব্যক্তিসত্ত্বার স্ফূরণ। এরপরও অনেক কিছু বলার বা ভাববার অবকাশ থেকে যায়। দেখা যায়, গীতিকারের গান এবং গীতিকবির গানকে অনেকেই এক পাল্লায় মাপার বৃথা চেষ্টা করেন। ফলে গীতিকবি হিসেবে নজরুলের গান পরিবেশনে গায়কী স্বাধীনতার ধুঁয়া তুলে গীতিকবির গীতিসত্তা ও ব্যক্তিসত্তা বা কবিসত্তাকে একপ্রকার অস্বীকার করার মতো গর্হিত কাজ করতেও অনেকে দ্বিধা করেন না। নজরুলের গানের ক্ষেত্রে অতীতে সংঘটিত এরূপ গর্হিত কাজের বহুবিধ নমুনা ও বিকৃত অভিরুচির অনির্বচনীয় ইতিহাস আমাদের অজানা নয়।

নজরুলের গানের বৈশিষ্ট্যায়নে গায়কী উপকরণের গুরুত্ব অপরিসীম। যেমন শুদ্ধ বাণী ও সুরসহ সুরানুসরণ, কাব্যিকভাবের সঙ্গে রাগরসের ভাবানুকূল অলংকার প্রয়োগ প্রক্রিয়া, কণ্ঠশিল্পীর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য, ছন্দ ও লয়তুল্য কণ্ঠ ক্ষেপনের মাত্রা, উচ্চারণ প্রক্রিয়ায় ভাবরস সঞ্চারণ এবং সর্বোপরি গুরুপরম্পরা শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা– এ সবই একজন গীতিকবির গানে প্রযুক্ত গায়কী উপকরণ; যা গানের বৈশিষ্ট্য মূল্যায়নে অর্থাৎ স্বাতন্ত্র্য গীতধারা প্রতিষ্ঠায় বিশেষ অর্থ বহন করে থাকে। কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর রচিত গানের মধ্যে উপরোক্ত গায়কী উপকরণসমূহ একটি স্বকীয় মাত্রায় প্রয়োগ করেছেন। ফলে তাঁর গান সহজেই অন্যের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ভাব, রস, ব্যঞ্জনা ও গায়কী নিয়ে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে অর্থবহ হয়ে ওঠে। সে বৈশিষ্ট্যের মানদণ্ড এমনই যে, শ্রবণমাত্র নজরুলের গান বলে প্রতীয়মান হয়। যেমন করে রবীন্দ্রনাথের গান আলাদা হয়ে যায়।

রবীন্দ্রযুগ একটি স্বতন্ত্র যুগ এবং রবীন্দ্র পরবর্তী যুগের তিনজন গীতিকবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩ খ্রিঃ), রজনীকান্ত সেন (১৮৬৫-১৯১০ খ্রিঃ) ও অতুলপ্রসাদ সেন (১৮৭১-১৯৩৪ খ্রিঃ) এঁদের কেউই রবীন্দ্র প্রভাবমুক্ত ছিলেন না। তাঁদের কৃতকর্মের ভেতর লক্ষ্য করা যায় যে, যথেষ্ট চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁরা সম্পূর্ণভাবে রবীন্দ্রপ্রভাব থেকে বেরিয়ে আসতে পারেননি। কিন্তু বাংলাগানের ইতিহাস খ্যাত পঞ্চ গীতিকবিদের সর্বশেষ উত্তরসূরি কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬ খ্রিঃ) তাঁর সৃষ্টিসম্ভারকে সম্পূর্ণভাবে রবীন্দ্রপ্রভাবমুক্ত করে স্বতন্ত্র একটি ধারায় প্রবাহিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। ফলে সংগীত ইতিহাসে তিনি পেয়েছিলেন 'যুগস্রষ্টা' অভিধার স্বতন্ত্র গীতিকবির সম্মান। এর পূর্ব ইতিহাস রোমন্থন করলে দেখা যায়, কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন রবীন্দ্রসংগীতের একজন জাতশিল্পী। রবীন্দ্রনাথের গান তিনি সব মুখস্ত গাইতেন। এজন্য তাঁকে রবীন্দ্রসংগীতের 'হাফেজ' বলা হত। নজরুল ইসলাম রবীন্দ্রনাথের গানের অন্তর্নিহিত ভাবাদর্শ, ভাবরস ও ভাবব্যঞ্জনা একেবারে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। ফলে পরবর্তীতে বাংলা গানের রবীন্দ্রবলয় থেকে তিনি সহজেই বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিলেন।

নজরুলের গান রচনার মাপকাঠিতে ছিল বিচিত্র সব কায়দা কানুন। তিনি কখনো আগে সুর তৈরি করতেন এবং পরে সুরের সেই কাঠামোতে কথা বসাতেন। তেমনিভাবে চিরাচরিত নিয়মে বাণী রচনাপূর্বক সুর করতেন। তৎকালে গ্রামোফোন রেকর্ডে নজরুলের গানই সর্বাধিক প্রকাশিত হয়েছিল। নজরুলের সংগীতসৃষ্টির প্রক্রিয়াটি চলত ধ্যানমগ্ন অবস্থায়। ধ্যানমগ্ন অবস্থায় সুরের রাজ্যে কবি এমনভাবে ডুবে থাকতেন যে, অনেক সময় তিনি অচেতন থাকতেন। সুরের সৌরমণ্ডলে আহত ও অনাহত নাদের পারস্পরিক অনুরাগ কবির কবিচিত্তে তথা গীতিচিত্তে সঞ্চারিত হতো নবসৃষ্টির উন্মাদনা। ইহজাগতিক ও পরজাগতিক তথা ইন্দ্রিয় ও অতীন্দ্রিয়জাত প্রেমের ভাবাদর্শ আমরা নজরুল-সৃষ্টির সবখানেই কমবেশি লক্ষ্য করে থাকি। বিশেষ করে সংগীতের ক্ষেত্রে গজল, ইসলামী, ভজন, শ্যামা, কীর্তন, বাউল প্রভৃতি পর্যায়ের গানে নজরুলের অধ্যাত্ব চেতনাবোধের উপস্থিতি আমরা অনুধাবন করতে পারি।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, নজরুল ছিলেন উত্তর-ভারতীয় সংগীত পদ্ধতির খেয়াল-ঠুমরী ধারা তথা মুসলমানী ঘারানার যোগ্য উত্তরসূরি। শাস্ত্রীয় সংগীতের প্রত্যেকটি রাগ পরিবেশনের একটি কাল বা সময় নির্দিষ্ট করা আছে। নজরুল ইসলাম গানের বাণী রচনাকালে কখনো রাগের নাম-শব্দ ব্যবহার করেছেন, আবার কখনো দিবা-রাত্রির বিভিন্ন প্রহর বা সময় উল্লেখ করেছেন। এই দুই অবস্থাতেই নজরুল সে সমস্ত গানের সুর সংযোজনাকালে ঠিক সেই নাম পদযুক্ত রাগের সুর এবং প্রহর বা সময় উল্লেখের ক্ষেত্রে সেই সময়ে গেয় রাগের সুরের সাথে সমন্বয় সাধন করেছেন। অর্থাৎ বাণীভাবের সঙ্গে রাগের সামঞ্জস্য বিধান একমাত্র নজরুলের গানেই পরিলক্ষিত হয়। নজরুলসংগীতের এ এক বিরল বৈশিষ্ট্য। বাংলা লঘু-সংগীতের ইতিহাসে কাজী নজরুল ইসলামের সাংগীতিক মনীষিতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের অবকাঠামো ছিল অভেদ্য উঁচুমার্গের। যে অবস্থানে নজরুল আজও স্বকীয়ধারায় সনাতনী কায়দায় অবস্থান করছেন। অন্যদিকে বাংলা গানের যুগস্রষ্টা অভিধায় নজরুল ইসলাম আজও অমলিন।

আমাদের উপমহাদেশীয় সংগীতের হিন্দুস্থানী ও কর্ণাটকী– এ দু'টি ধারাতেই আমরা নজরুলের উপস্থিতি লক্ষ্য করতে পারি। রাগ-রাগিণীর প্রতি নজরুলের ছিল সহজাত আকর্ষণ। সংগীত নিয়ে তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও তথ্যপূর্ণ গবেষণার কোনো অন্ত ছিল না। নতুন নতুন সৃষ্টির তাড়নায় তাঁর অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি দক্ষিণী রাগের দিকেও ধাবিত হয়। তিনি দক্ষিণ-ভারতীয় তথা কর্ণাটকী সংগীতধারার অনেক রাগ-রাগিনী যেমন শংকরাভরণ, প্রতাপবরালী, দেবগান্ধার, বসন্ত মুখারী, নাগস্বরাবলী, সামন্ত-সারং, লঙ্কদহন-সারং, শিবরঞ্জনী, নীলাম্বরী, শ্যাম কল্যাণ, নারায়নী, নট-বেহাগ, মধুমাধনী সারং, কলাবতী, সামন্ত-কল্যাণ, কর্ণাটী সামন্ত, সিংহেন্দ্রমধ্যম, শিবমত ভৈরব, বড়হংস-সারং প্রভৃতির উপর গান রচনা ক'রে তাঁর সংগীত ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন। নজরুলের এই সাংগীতিক প্রতিভা বাংলাগানে বিরল। বাংলাগানের প্রতিটি শ্রেণি ও শাখায় ছিল নজরুলের অবাধ বিচরণ। তাঁর সংগীত সৃষ্টির পরিমাপগত দিক ছিল অনেক গভীরে এবং সৃষ্টির সেই গভীর সমুদ্রে সর্বদা ঢেউ উঠত উপমহাদেশীয় রাগ রাগিণীর নিগূঢ় সখ্যতায়। নজরুল সেই সমুদ্রে অবগাহন ক'রে বিভিন্ন রাগ রাগিণীকে শাস্ত্রীয় রীতির অনুষঙ্গে সংমিশ্রণ ঘটিয়ে রচনা করেছেন বিচিত্র সব গান। একাধিক গানে একই রাগের সুর তিনি সুনিপুণভাবে প্রয়োগ করেছেন।

সকল জাতি, ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায়, গোত্র নির্বিশেষে গণমানুষের জন্য নজরুল ইসলাম সংগীত রচনা করেছেন। সামাজিক কোনো বৈষম্য দিয়ে নজরুলের গানকে আলাদা করার উপায় নেই। নজরুল ইসলাম তাঁর রচনার জন্য সমাজের সকল শ্রেণির মানুষের কাছে সমানভাবে সমাদৃত। বিশেষ করে তাঁর গানে সমাজের সকল শ্রেণির মানুষের কথা ব্যক্ত হয়েছে। তাই সর্বজনীন পরিমাপে নজরুলের গান এক অনন্য বৈশিষ্ট্যে অনুকরণীয় দৃষ্টান্তরূপে চির-ভাস্বর হয়ে আছে এবং থাকবে।

নজরুল-সংগীত মুসলমানী ঘারানার মুঘল দরবারের ঐতিহ্যপুষ্ট রঙদার সুরৈশ্বর্যে

ভরপুর। উত্তর-ভারতীয় সংগীতধারার খেয়াল, ঠুমরী, গজল ও দাদ্‌রার মনমাতানো বর্ণাঢ্য সুরভঙ্গির দ্বারা নজরুলের গান সমৃদ্ধ। ধ্রুপদ ও টপ্পা ধারায় নজরুলের বিচরণ খুবই সীমিত। অন্যদিকে লোকসুরভিত্তিক গান রচনায় নজরুল ইসলাম এক অন্যতম স্বতন্ত্র ধারার সূচনা করেছেন। লোকসংগীত গ্রামভিত্তিক গান। শহুরে মানুষের কাছে এর আবেদন ততটা প্রাণময় হয়ে ওঠে না। কিন্তু কাজী নজরুল ইসলাম লোকভিত্তিক সুরে গান রচনা করে শহরকেন্দ্রিক মানুষের কাছে হৃদয়গ্রাহী করে তুলতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁর লোকসুরভিত্তিক গানসমূহ তিনি এমন এক পরিশীলিত বৈশিষ্ট্যের অবকাঠামো দিয়ে রচনা করেছেন– যার বাণীভাব, সুরভাব, ছন্দভাব ও গায়কীভাব সমাজের সকল শ্রেণির মানুষের কাছে সমানভাবে সমাদৃত হয়েছে। বিশেষ করে শহরকেন্দ্রিক মানুষের হৃদয়ে স্থান করে নিতে পেরেছিল। নজরুলের লোকসুরভিত্তিক গানের বাণীতে যেমন আছে রুচিশীল শব্দ চয়নের নান্দনিক আদর্শ; তেমনি আছে সুর, ছন্দ ও গায়কীতে সর্বজননন্দিত সাংগীতিক উপকরণ। ফলে নজরুলের লোকসুর-ভিত্তিক বিভিন্ন শ্রেণির গানগুলি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল।

নজরুলের গানের আরো একটি বৈশিষ্ট্য, বিষয়ভিত্তিক ব্যাপকতায় অনন্য সংগীত হিসেবে। বাংলা গানের এমন কোনো শাখা প্রশাখা বা শ্রেণি নেই যেখানে নজরুল তাঁর সৃষ্টির বৈতরণী ভেড়াননি। সাংগীতিক ও বিষয়ভিত্তিক উপকরণে ঋদ্ধ নজরুলের গানে যেমন আছে ধ্রুপদ, ধামার, সাদ্‌রা, খেয়াল, টপ্পা, ঠুম্‌রী, রাগপ্রধান, দাদ্‌রা ও গজলের আঙ্গিক; আছে কাওয়ালি, আধুনিক, নৃত্য ও অর্কেষ্ট্রা সম্বলিত পর্যায় এবং লোকাঙ্গিকের পল্লীগীতি, ভাটিয়ালী, ভাওয়াইয়া (মাত্র দুটি), ঝুমুর, ঝাঁপান, কবিগান, কীর্তন, লেটোগান, পালাগান ইত্যাদি। তেমনিভাবে আছে দেশাত্মবোধক, জাগরণীমূলক, উদ্দীপনামূলক, ইসলামী, ভজন, হোরি, হোলী, কাজ্‌রী, হাসির গান, প্রার্থনাসংগীত, আগমনী, রঁসিয়া, কোরাস্ গান, মার্চসংগীত, ধীবরের গান, ছাদপেটার গান, লাউনী ইত্যাদি পর্যায়। বাংলাগানের কোন্ শাখায় নজরুলের অবদান নেই– তা খুঁজে পাওয়াই দুরুহ। এখানে নজরুলের গানের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় যে, সাংগীতিক ও বিষয়বস্তুগত– এ উভয় পদ্ধতিতেই নজরুলসংগীতের অবস্থান সুদৃঢ়। কেবল বিষয়ের দিক দিয়ে বিবেচনা করলেও নজরুলের গানে সর্বস্তরের জনগণের জাগতিক, মানসিক বা আত্মিক, ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি বিষয়গুলির পরিমেয় রূপ মূর্ত হয়ে ওঠে। পক্ষান্তরে নজরুল তাঁর গীতিকাব্যে অমূল্য শব্দভাণ্ডারের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। বাংলাসহ আরবি, ফারসি, উর্দু এমনকি ইংরেজি ভাষার শব্দসম্ভারের প্রয়োগ নজরুল ইসলাম তাঁর গানে এমন সুনিপণভাবে করেছেন যার তুলনা বাংলাকাব্যে বিরল। নজরুলের কাব্যমনস্কতায় যে মননশীল ভাষারীতির পরিচয় পাওয়া যায় তাতে নজরুল স্বাতন্ত্র্যেরই একটি সুষম অবকাঠামো লক্ষ্য করা যায়।

সুরের যাদুকর কাজী নজরুল ইসলাম সংগীতসৃষ্টির এক পর্যায়ে এসে দেখেন যে, 'আধুনিক (মডার্ন) গানের সুরের মধ্যে আমি যে অভাবটি সবচেয়ে বেশী অনুভব করি

তা হচ্ছে সিমিট্রি (সামঞ্জস্য) বা ইউনিফরমিটি সমতার অভাব। কোনো রাগ বা রাগিণীর সঙ্গে অন্য রাগ বা রাগিণীর মিশ্রণ ঘটাতে হলে সংগীতশাস্ত্রে যে সূক্ষ্ম জ্ঞান বা রসবোধের প্রয়োজন তার অভাব আজকালকার অধিকাংশ গানের সুরের মধ্যেই লক্ষ্য করা যাচ্ছে এবং ঠিক এই কারণেই আমার নতুন রাগ রাগিণী উদ্ধারের প্রচেষ্টা। রাগ-রাগিণী যদি তার 'গ্রহ' ও ন্যাস এবং বাদী, বিবাদী ও সংবাদী মেনে নিয়ে সেই রাস্তায় চলে তাহলে তাতে কখনও সুরের সামঞ্জস্যের অভাব বোধ হবে না।' (নজরুলরচনাবলী, আবদুল কাদির সম্পাদিত, বাংলা একাডেমি, পঞ্চম খণ্ড, দ্বিতীয়ার্ধ, ১৯৮৪, পৃষ্ঠা- ২১৫- ২১৬)।

প্রিয় পাঠকবর্গ! নজরুলের এই ভাষ্য থেকেই অনুধাবন করতে অসুবিধা হয় না যে, নজরুলের সংগীতসৃষ্টির গূঢ় রহস্য কোথায়। শাস্ত্রীয় সংগীতে নজরুলের পাণ্ডিত্য ছিল এক মহীরূহসম। তাই শাস্ত্রীয় রীতির অনুষঙ্গেই নজরুলের গানের বিশেষত্ব নিহিত আছে। নজরুল তাঁর গানের সুর রচনায় রাগের সামগ্রিক রূপটিকে ফুটিয়ে তুলেছেন। একটি রাগের বাদী, সমবাদী, বিবাদী, গ্রহ, ন্যাস ইত্যাদি স্বরগুলির প্রয়োগ বা ব্যবহারে শাস্ত্রীয় বিধিবিধান মেনেই নজরুল ইসলাম তাঁর সংগীত সম্ভারকে সমৃদ্ধ করেছেন। এখানেই নজরুলসংগীতের সাংগীতিক স্বাতন্ত্র্য স্বমহিমায় সুশোভিত হয়ে আছে। নজরুল তাঁর সংগীতসম্ভারকে স্বকীয় ধারায় বৈশিষ্ট্যায়নের লক্ষ্যে যেমন লুপ্ত ও লুপ্তপ্রায় রাগ-রাগিণী উদ্ধার করেছেন, তেমনিভাবে নতুন নতুন রাগ-রাগিণীও সৃষ্টি করেছেন। অন্যদিকে গানের আরো একটি মুখ্য উপকরণ যে তাল-লয়-ছন্দ, তাতেও তিনি সংস্কৃত ছন্দের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। দেখা যায়, তাল-মাত্রা-লয় নির্দিষ্টকরণে নজরুলের মধ্যে সাংগীতিক পরিমিতি ছিল সক্রিয়। যে অঙ্গের গানে যে তালের প্রয়োগ রীতিসিদ্ধ– নজরুল তাই করেছেন। অর্থাৎ গানের বাণী, সুর, অঙ্গ ও গায়কী ভাবের সঙ্গে তাল-ছন্দের সুষম সামঞ্জস্য বিধানে সমতা রক্ষা নজরুলসংগীতের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য।

পরিশেষে বলতে হয়, নজরুলসংগীত হলো উত্তর-ভারতীয় সংগীতপদ্ধতির সুরৈশ্বর্যপূর্ণ মুসলমানী ঘারানার সাংগীতিক বৈশিষ্ট্যের খেয়াল ও ঠুমরী ধারাপুষ্ট রাগসংগীতানুগ বাংলাগান এবং বৈচিত্র্যে ভরপুর। সেই বৈচিত্র্যের বাতাবরণ বর্ণনা করা দুরূহ বিষয়। সামগ্রিক অর্থে নজরুলসংগীত কেবলই ভাবের বিষয় নয়, বাস্তবতার তপ্ত পরশ আমাদেরকে প্রতিনিয়ত বিমোহিত করে। ইহজগতিক ও পরজাগতিক এবং মানবীয় প্রেম প্রীতির সর্বময় আদর্শে রচিত এবং মুঘল দরবারের ঐতিহ্যপুষ্ট রঙদার সুরৈশ্বর্যে ভরা নজরুলসংগীত অনুকরণীয় দৃষ্টান্তের মাপকাঠিতে আজও অম্লান।

ইদরিস আলী
নজরুল গবেষক ও নজরুল সংগীতশিল্পী
সংগীত প্রশিক্ষক, কবি নজরুল ইনস্টিটিউট

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক চলচ্চিত্রে নারীর উপস্থাপন

জান্নাতুল আনজুম অর্পি*

মুখ্য শব্দগুচ্ছ: মুক্তিযুদ্ধ, চলচ্চিত্র, নারী, ইতিহাস, চিত্রায়ন

প্রারম্ভিকা

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জনের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ। মহান আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের এই স্বাধীনতার ইতিহাস বিভিন্ন আঙ্গিকে, বিভিন্ন সময়ে নানান শিল্পমাধ্যমে ফুটে উঠেছে। কখনও কবিতায়, কখনও গানে, কখনওবা উপন্যাস, নাটক আবার কখনওবা চলচ্চিত্রে। আমাদের অহংকারের মুক্তিযুদ্ধকে যথাযথভাবে তুলে ধরার জন্য গণমাধ্যম হিসেবে একটি শক্তিশালী ভূমিকা পালন করেছে দেশীয় চলচ্চিত্র। এ দেশের সুস্থ ধারার চলচ্চিত্রগুলোর মধ্যে একটি বড় অংশ জুড়ে আছে এই মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক চলচ্চিত্র। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ ছিল একটা গণযুদ্ধ। এই যুদ্ধে পুরুষের পাশাপাশি এ দেশের নারীরাও রেখেছেন অপরিসীম অবদান। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে, নারীর ভূমিকার চিত্রায়ন ইতিহাসে উপেক্ষিত, উপেক্ষিত চলচ্চিত্রেও।

লেখাটিতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্রে নারীর ভাবমূর্তি নির্মাণ ও নারীর চিত্রায়ন এবং এর পাশাপাশি পুরুষের সাপেক্ষে তাদের অবস্থান সম্পর্কে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক কতিপয় চলচ্চিত্র

এক সাগর রক্তের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি স্বাধীনতা। বাঙালির সবচেয়ে বড় অর্জনকে নতুন প্রজন্ম তথা সারা দেশের মানুষের কাছে স্মরণীয় করে রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে দেশীয় চলচ্চিত্র। এই চলচ্চিত্রগুলোর অনেকগুলোতে যেমন সরাসরি যুদ্ধের ভয়াবহতা উঠে এসেছে সেই সঙ্গে কিছু চলচ্চিত্রে প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধকে উপস্থাপন করা হয়েছে, তুলে ধরা হয়েছে যুদ্ধের শিকার হওয়া, ক্ষতিগ্রস্ত শরণার্থী বা পালিয়ে বেড়ানো মানুষের জীবনাবেগকেও (কবীর, ২০০৬)। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ থেকে শুরু করে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত ঘটে যাওয়া মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত ঘটনাবলী এবং এ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে যে চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে, তাই মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক চলচ্চিত্র। মুক্তিযুদ্ধ, যুদ্ধের চেতনা, যুদ্ধভিত্তিক কোনো ঘটনা কিংবা জাতিসত্তার চেতনার বিষয়কে কেন্দ্র করে এ চলচ্চিত্রগুলো নির্মিত হয়েছে। যার ফলে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের আলোচনায় 'মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক চলচ্চিত্র' নামে স্বতন্ত্র একটি ধারার অবতারণা হয়। চলচ্চিত্রগুলো কখনও পূর্ণদৈর্ঘ্য, স্বল্পদৈর্ঘ্য, কখনও প্রামাণ্যচিত্র- এই তিন ধারায় নির্মিত হয়েছে। বাংলাদেশের প্রথম মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র হিসেবে মুক্তি পায় 'ওরা ১১ জন' (১৯৭২)। বাংলাদেশের জন্মলগ্ন থেকে পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন দশকে অনেক

চলচ্চিত্র নির্মিত হয়। এর মধ্যে ৭০ এর দশকে- ওরা ১১ জন (১৯৭২), রক্তাক্ত বাংলা (১৯৭২), জয় বাংলা (১৯৭২), অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী (১৯৭২), বাঘা বাঙালি (১৯৭২); ৮০ এর দশকে বাঁধন হারা (১৯৮১), কলমীলতা (১৯৮১), চিৎকার (১৯৮১); ৯০ এর দশকে- মেঘের অনেক রঙ (১৯৯৩), একাত্তরের যীশু (১৯৯৩), আগুনের পরশমণি (১৯৯৪), মুক্তির গান (১৯৯৫); ২০০০ এর দশকে- মাটির ময়না (২০০২), জয়যাত্রা (২০০৪), মেঘের পরে মেঘ (২০০৪), রাবেয়া (২০০৮); ২০১০ এর দশকে- মেহেরজান (২০১০), গেরিলা (২০১১), হৃদয়ে ৭১ (২০১৪), একাত্তরের মা জননী (২০১৪)- চলচ্চিত্রগুলো অন্যতম।

মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্র ও নারী (একটি সাধারণ পরিপ্রেক্ষিত)

মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশ নেওয়া নারীসহ সে সময় বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া সকল নারীই আমাদের শ্রদ্ধার দাবিদার। তরুণ প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের সাহসিকতা ও ত্যাগের চিত্র তুলে ধরার অন্যতম মাধ্যম হলো চলচ্চিত্র। মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি নারীদের অবদান কোনো অংশে কম নয়। কিন্তু এসব চলচ্চিত্রে নারীর ইতিবাচক চিত্রের তুলনায় নেতিবাচক চিত্র-ই অধিকতর লক্ষণীয়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রাতিষ্ঠানিক ইতিহাস নারীর বহুমাত্রিক অবদানকে স্বীকৃতি দেয়নি বরং তার ওপর নেমে আসা সকল নির্যাতনকে তার 'সম্ভ্রমহানিত্ব' হিসেবে দলিলবদ্ধ করেছে। বিভিন্ন সময়ে নির্মিত এসব চলচ্চিত্রে নারীকে মূলত যুদ্ধের শিকার এবং ধর্ষিতা পরিচয়েই দেখা গেছে। এছাড়া অল্প কিছু চলচ্চিত্রে নারীকে শুশ্রুষা প্রদানকারী, যৌন-কর্মী কিংবা সহযোগীর ভূমিকায় দেখা গেছে। জাতীয় ইতিহাসের সঙ্গে সমান তাল রেখে এসব ধর্ষিতা নারীকে সম্ভ্রমহীন দেখানো হয়েছে, ধর্ষণ দৃশ্যকে বাণিজ্যিক প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয়েছে এবং ধর্ষণ অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে যাওয়া এসব নারীকে হয় মরে যেতে হয়েছে, মানসিক ভারসাম্যহীন হয়ে যেতে হয়েছে অথবা অদৃশ্য হয়ে যেতে হয়েছে। ধর্ষিতা নারীকে আখ্যায়িত করা হয়েছে 'জাতির লজ্জা' হিসেবে। আবার সাম্প্রতিক মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক চলচ্চিত্রে আরেকটি প্রবণতা শুরু হয়েছে। মূল নারী চরিত্রকে ধর্ষণ অভিজ্ঞতার বাইরে রেখে তার শারীরিক সৌন্দর্যকে দর্শণীয় করে মুনাফা নিশ্চিত করার প্রবণতা। যত সময় গড়িয়েছে, মুক্তিযুদ্ধে নারীর অবদান ততই ইতিহাসের আখ্যান থেকে দূরে সরে গেছে। দেশকে মায়ের সঙ্গে তুলনা করে আক্রান্ত দেশমাতৃকার জন্য সংঘটিত যুদ্ধের ফ্রেমওয়ার্কে নারী চিত্রায়িত হয়েছে কেবলই যুদ্ধের 'ক্ষয়ক্ষতি' হিসেবে, সে মুক্তিযোদ্ধা হয়নি।

মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্রগুলোতে পরিলক্ষিত হয় যে, বাংলাদেশের সমাজে পুরুষতান্ত্রিক মতাদর্শ ছড়িয়ে দেওয়ার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে মুক্তিযুদ্ধকে বেছে নেওয়া হয় এবং চলচ্চিত্রগুলো একটা পক্ষপাতদুষ্ট ধারণার জন্ম দেয় তিনটি উপায়েঃ- ১. মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে পুরুষকে উপস্থাপন করে, ২. নারীর অসহায়ত্বের চিত্রকে গুরুত্ব দিয়ে এবং ৩. পুরুষের যুদ্ধকালীন যৌন- হয়রানির কথা চেপে গিয়ে (গায়েন, ২০১৩)। এ

সম্পর্কে এখানে একটি উক্তি উল্লেখ করা যেতে পারে-

"Dramatic action of war film is organized around the male characters and women become the object of desire for the male characters. Film has prepared the machinery suitable for male desire." (Goldstein, 2001).

উল্লেখযোগ্য মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক চলচ্চিত্রে বিভিন্ন আঙ্গিকে নারীর সামগ্রিক উপস্থাপন

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্রগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সেখানে নারীর উপস্থাপন হয়েছে পুরুষের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কাঠামোর অভ্যন্তরে। যুদ্ধ বিষয়ক চলচ্চিত্রে নারীকে সাধারণত সেবিকা, মা, স্ত্রী, প্রেমিকা, বা ধর্ষিতা হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। যোদ্ধা হিসেবে নারীর চিত্রায়ন হয় নেহাতই কম। পিতৃতান্ত্রিক সমাজের দৃষ্টিকোণ থেকে মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্রে নারীর উপস্থাপন করা হয়েছে সাধারণত-

১. পুরুষের লালসা যার ফলে নারীকে শিকারে পরিণত হতে হয়েছে যুদ্ধের সময় পুরুষের যৌনক্ষুধা নিবারণের জন্য।

২. নারী ও পুরুষের মধ্যে প্রচলিত দ্বিবিভাজনের বিষয়টিকে অনুসরণ করে নারীকে ঘরের ভেতরে আবদ্ধ রাখার পরিবেশ সৃষ্টির প্রচেষ্টা লক্ষ্যণীয়।

৩. কিছু কিছু চরিত্রে নারীর অবস্থান এর ক্ষেত্রে কিছুটা ব্যতিক্রম দেখা যায়। সেখানে নারী সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে। (মাহমুদ,২০০৫)

এখানে, প্রাক-স্বাধীনতা এবং স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে নির্দিষ্ট কিছু চলচ্চিত্রের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক চলচ্চিত্রে নারীর চরিত্র নির্মাণের ধারাকে বিভিন্ন আঙ্গিকে রূপায়ন করা হয়েছে।

❑ **প্রাক-স্বাধীনতা**

চার- দেয়ালে আবদ্ধ নারী

জহির রায়হান নির্মিত চলচ্চিত্র 'জীবন থেকে নেয়া' নামক সামাজিক চলচ্চিত্রটিতে তৎকালীন বাঙালি স্বাধীনতা আন্দোলনকে রূপকের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। চলচ্চিত্রটিতে দুই ধরনের কাঠামো দেখা যায়- একটা হচ্ছে 'ঘরের ভেতর' আরেকটি 'ঘরের বাইরে'। 'ঘরের ভেতরে' ছিল নারীরা। তারা সব সময় গৃহস্থালি কার্য সম্পাদন, সন্তান লালন-পালন, সংসার সামলানো নিয়ে ব্যস্ত থাকত। আরেকটি চিত্র হচ্ছে 'ঘরের বাইরে'- যেখানে পুরুষরা লিপ্ত ছিল দেশের সার্বভৌমত্ব ও দেশের মানুষের স্বাধীনতা রক্ষার কার্যে। পুরুষরা যেখানে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিল, নারীরা সেখানে নিযুক্ত ছিল পারিবারিক কলহে। এখানে নারী চরিত্রেরও দুটি রূপ দেখা যায়। একদিকে, শক্তিশালী ও দুষ্ট, অন্যদিকে, কোমল ও সাংসারিক। কোমল, সাংসারিক নারীটির ভূমিকা ছিল দুইরকম- একদিকে যেমন তাকে সংসারের রক্ষণাবেক্ষণ করতে হতো; অপরদিকে তাকে পূরণ করতে হতো পুরুষের যৌনচাহিদা। এই চলচ্চিত্রটির মাধ্যমে দেখা যায় যে, দেশের স্বাধীনতা লাভের প্রত্যাশা নারীর কাছে কোনো অর্থ বহন করে না। 'যুদ্ধের জন্য ছেলেকে প্রস্তুত করা, কন্যাকে না'- এমন ধারণা ধারাবাহিকভাবে

যুদ্ধ পরবর্তী সময়ের চলচ্চিত্রগুলোতেও দেখা যায়। (রায়হান, ১৯৭০)

❑ **স্বাধীনতা পরবর্তী সময়**

ধর্ষিতা নারীকে উপস্থাপন এবং বাণিজ্যিক কারণে 'ধর্ষণ'কে বাছাইকরণ

ধর্ষণদৃশ্য ব্যবহার মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্রে অন্যতম অংশ হিসেবে যুক্ত হয়। চলচ্চিত্রগুলোতে মূলত যুদ্ধের সময় নারীদের ধর্ষণের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দুর্বল অবস্থানের কথা ফুটে উঠেছে। চাষী নজরুল ইসলাম কর্তৃক নির্মিত 'ওরা ১১ জন' (১৯৭২) চলচ্চিত্রটিতে প্রধান নারী চরিত্র একটি ক্যাম্পে সেবিকা হিসেবে কাজ করত এবং এক সময় সে ধর্ষণের শিকার হয়। এই চলচ্চিত্রে পুরুষরা শৌর্য-বির্যের অধিকারী হিসেবে প্রকাশ পেয়েছে, আর প্রধান প্রধান নারী চরিত্রগুলো প্রকাশ পেয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত হিসেবে, ধর্ষিতা হিসেবে। মূলত চলচ্চিত্রটিতে পুরুষতান্ত্রিক মতাদর্শ ফুটে উঠেছে। তবে এই চলচ্চিত্রটিতে নারীর চিত্রায়নের কিছু ইতিবাচক দিক আছে। যেমন-

- মুক্তিযুদ্ধে নারীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নানামাত্রিক অংশগ্রহণের উপস্থাপন। "মুক্তিযুদ্ধে নারীর যত ধরনের অংশগ্রহণ ছিল, প্রায় সব ধরনের প্রতিনিধিত্বই এ চলচ্চিত্রে পাওয়া যায় (গায়েন, ২০১৩)।
- নারীর চেতনার জায়গাটি প্রশংসনীয়ভাবে উপস্থাপন (ইসলাম, ১৯৭২)।

তবুও এই চলচ্চিত্রে, যে সব নারী যুদ্ধে ধর্ষিত হয়েছিলেন তাদের পরিণতি কী হবে?- সে বিষয়ে একটি বোঝাপড়ার জমিন প্রস্তুত করে দেওয়া হয়েছে, যা সমাজে নারীর দুর্বল অবস্থান সৃষ্টির সহায়ক (গায়েন, ২০১৩)।

ওরা ১১ জন

বাঘা বাঙালি (১৯৭২) ও রক্তাক্ত বাংলা (১৯৭২) চলচ্চিত্রে ধর্ষিতা নারীর নিজের সতীত্ব উৎসর্গ করাকে যুদ্ধে তার একমাত্র অবদান হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। যুদ্ধের সময় নারীর বেশ্যাবৃত্তির দিকটিও তুলে ধরা হয়েছে চলচ্চিত্রে (আনন্দ, ১৯৭২; মোমতাজ, ১৯৭২)। মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্রে পুরুষকে উন্নতমনা উজ্জ্বল চরিত্রে দেখা যায়। অপরদিকে নারীরা ধর্ষিতা হওয়ার দরুন নিজেকে অপবিত্র মনে করত এবং সে আত্মহত্যা করত। অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী (১৯৭২)-তে দেখা যায়, একজন ধর্ষিতা উদ্ধার হলে সে নিজেকে অপবিত্র বলে মনে করে (দত্ত, ১৯৭২)।

"আমি বাঁচতে চাই না। আমি অপবিত্র, আমি আমার সতীত্ব হারিয়েছি" (রক্তাক্ত বাংলা)।

নারী প্রচলিত লিঙ্গভিত্তিক ভূমিকাতেই আবদ্ধ

মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্রে নারীরা প্রচলিত নারী চরিত্রের বাইরে গিয়ে খুব বেশি অবদান রাখতে পারেনি। 'আগুনের পরশমণি' (১৯৯৪)- তে একটু ভিন্ন আঙ্গিকে নারীকে চিত্রিত করা হয়েছে। এখানে নারীকে দুই উপায়ে দেখানো হয়েছে। প্রধান নারী চরিত্রটি একজন মুক্তিযোদ্ধার প্রেমে পড়ে এবং নিজে যুদ্ধ করার স্বপ্ন দেখে। কিন্তু তার যুদ্ধে অংশগ্রহণ কল্পনাতেই আবদ্ধ থেকে যায়। সে গান গাইত, চাটনি খেতো যা নারীসুলভ আচরণ হিসেবে বিবেচিত। অপরদিকে, এখানে একজন মায়ের যুদ্ধে যাওয়া সন্তানের সুরক্ষার জন্য বা যুদ্ধাহত সন্তানের সুস্থতার জন্য প্রার্থনা করার দিকটি পরিলক্ষিত হয়। তাই এই বলা যায়, এই ছবির নারী চরিত্রগুলো কিছু প্রচলিত ছাঁচে গড়া নারীসুলভ আচরণ ও ভূমিকার বাইরে গিয়ে প্রকাশ লাভ করতে পারেনি (আহমেদ, ১৯৯৪)।

আগুনের পরশমণি

সতীত্ব হচ্ছে সম্পদ; সতীত্ব হচ্ছে সম্মান

নারীসত্তার গুরুত্ব নির্ধারণ করা হয় তার 'কুমারিত্ব', 'সতীত্ব', 'পবিত্রতা' ইত্যাদি সামাজিক মূল্যবোধ দিয়ে। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বাণিজ্যিক চলচ্চিত্রগুলোতে 'সতীত্ব' বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে (পারভিন, ২০০২)। ধর্ষিতা নারী শুধুই পেয়েছে নিগ্রহ, অসম্মান। 'মেঘের পরে মেঘ' এ দেখা যায়, নারীরা দেশ রক্ষার চেয়ে তার জীবন বাঁচাতে এবং তার ইজ্জত বাঁচাতে বেশি উদ্বিগ্ন। একজন নারীর সর্বস্ব লুকিয়ে থাকে তার যৌনসত্তার পবিত্রতায়। ফলে যখন কোনো নারী ধর্ষিত হয়, সে হয়ে পড়ে পতিতা, হারায় তার ইজ্জত কিংবা জীবনের সর্বস্ব। এখানে, সন্তানহারা মায়ের চরিত্রও ফুটে উঠেছে (ইসলাম, ২০০৪)।

নারীর শারীরিক সৌন্দর্য প্রদর্শন

সম্প্রতি আর একটি ধারা লক্ষ্য করা যায়। এখনকার মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্রগুলোতে নারীকে শত্রুর চোখে শুধু যৌনতার বিষয়বস্তু হিসেবে না দেখিয়ে নারীর শারীরিক সৌন্দর্যের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। 'মেহেরজান' (হোসেন, ২০১১) এবং 'গেরিলা' (ইউসুফ, ২০১১)- দুটি চলচ্চিত্রেই নারীর সৌন্দর্যের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে দৃশ্যমান।

মেহেরজান

গেরিলা

কিছু ব্যতিক্রম

সাম্প্রতিক মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক চলচ্চিত্রে নারীর কিছুটা ব্যতিক্রমধর্মী ভূমিকার পরিচয় পাওয়া যায়, যেখানে নারী পরিচয় দিয়েছে সাহসিকতার, সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে; যা অন্যান্য চলচ্চিত্রে অনুপস্থিত। যেমন- গেরিলা (২০১১), রাবেয়া (২০০৮), হৃদয়ে -৭১ (২০১৪), একাত্তরের মা জননী (২০১৪) প্রভৃতি।

গেরিলা চলচ্চিত্রে নারীকে ভিন্ন মাত্রায় উপস্থাপন করা হয়েছে, যেখানে নারী যোদ্ধা, সংগ্রামী, সাহসী। ২৫ শে মার্চ রাতে অতর্কিতে হানাদার পাক বাহিনীর বর্বর আক্রমণে মরণপণ যুদ্ধ শুরু হয়, যার পটভূমিতে রচিত গল্প নিয়ে নির্মিত চলচ্চিত্র 'গেরিলা'। 'বিলকিস' এই গল্পের মূল চরিত্র। শিক্ষিত-সংস্কৃতিমনা-বলিষ্ঠ চিত্তের অধিকারী বিলকিসের স্বামী, প্রতিষ্ঠিত সাংবাদিক হাসান, ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে নিখোঁজ হন। আপন বোধ আর হাসানের সান্নিধ্যে বাঙালির স্বাধীনতা মন্ত্রে

উজ্জীবিত বিলকিস অসুস্থ শ্বাশুড়ীর দেখাশোনা, নিজের ব্যাংকের চাকরী, নিখোঁজ হাসানের খোঁজ নেয়ার পাশাপাশি ঢাকার গেরিলা মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে নেয়। তার মতোই আরো অনেক নারী চাকুরী বা নিজ সামাজিক অবস্থানের ছত্রছায়ায় গেরিলা যুদ্ধের নানা সাংগঠনিক যোগাযোগ ও পরিবহনের মাধ্যম হিসেবে নিয়োজিত থেকে গেরিলা যুদ্ধকে সম্ভব করে তুলেছিলেন। পাকিস্তানি বর্বরতা, বাঙালির প্রতিরোধ আর স্বাধীনতার দাবি দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে দিতে সশস্ত্র যুদ্ধের পাশাপাশি বিলকিস সহযোদ্ধাদের সাথে একটি পত্রিকার কাজেও জড়িয়ে যায়, যার নাম 'গেরিলা'। ঘটনার পরিক্রমায় শেষ পর্যন্ত বীরের মতো আত্মাহুতি দেয় বিলকিস। নিজের সাথে উড়িয়ে দেয় একটি গোটা মিলিটারী ক্যাম্প (ইউসুফ, ২০১১)।

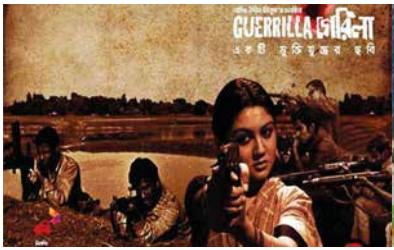

গেরিলা

হৃদয়ে ৭১

নারী নির্মাতার অভাব

নারীকে শুধু যুদ্ধের ক্ষতিগ্রস্ত, অসহায় ও অত্যাচারিত হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে চলচ্চিত্রে। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যেটা আমাদের চোখের আড়ালেই থেকে যায়, সেটা হচ্ছে- মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্রগুলোতে নারী নির্মাতা বা নারী নির্দেশকের সংখ্যা অতি নগণ্য; যা চলচ্চিত্রে নারীর যথাযথ চিত্রায়নের ক্ষেত্রে অন্যতম অন্তরায়। হাতে গোনা দু' একজন নারী নির্মাতা মুক্তিযুদ্ধের ওপর চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন। যেমন- 'ইতিহাস কন্যা' (১৯৯৯) এর নির্মাতা শামীম আক্তার এবং 'মেহেরজান' (২০১১) এর নির্মাতা রুবাইয়াত হোসেন।

বীরপুরুষ বনাম বীরাঙ্গনা

নারীসুলভ মানেই দুর্বলতা, নারী মানেই দুর্বল। মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্র, যেমন- 'ওরা ১১ জন' এ নারীর বহুমাত্রিক উপস্থিতি থাকলেও কোনোটাই পরিপূর্ণ চরিত্রের মর্যাদা পায়নি। সব নারী চরিত্রগুলো যেন পুরুষ চরিত্রনির্ভর। যেমন- নারী চরিত্রগুলোর মধ্যে একটি মাত্র চরিত্র 'কেয়া' যাকে একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে দেখানোর প্রয়াস চলচ্চিত্রটিতে লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু 'কেয়া' চরিত্রের রূপায়ন এতটাই সংক্ষিপ্ত এবং অপরিস্ফুটিত যে, তাকে একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আখ্যায়িত করার মানস দ্বিধাগ্রস্ত হয়। ধর্ষণের শিকার হয়ে সে আখ্যায়িত হয় বীরাঙ্গনা হিসেবে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে যে পুরুষ ক্ষত ধারণ করেছে সে হয়েছে বীরযোদ্ধা, আর

যে নারী যুদ্ধের ক্ষত ধারণ করেছে সে হয়েছে বীরাঙ্গনা- যে বীরাঙ্গনা কখনও বীরের মর্যাদা পায়নি। স্বাধীন বাংলার প্রথম চলচ্চিত্রে এই বীরঙ্গনাদের ভবিষ্যৎ কী হবে বা কী হওয়া উচিত তার প্রেক্ষাপট তৈরি করে দেয়া হয় ধর্ষিত সব চরিত্রের মৃত্যু- আকাঙ্ক্ষার মধ্য দিয়ে। স্বাধীন বাংলাদেশে কেন শুধু বীরপুরুষরাই সম্মানিত হবে আর বীরঙ্গনারা পাবে লাঞ্ছনার জীবন- এ সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যায় এই চলচ্চিত্রে (ইসলাম, ১৯৭২)।

ধর্মীয় কারণেও অত্যাচারিত নারী

পাকিস্তানি বাহিনী কর্তৃক মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন হত্যা, ধ্বংস, নির্যাতন ও ধর্ষণকে আখ্যায়িত করা হয় বিশ্বের এ যাবৎ কালের সংগঠিত জেনোসাইডগুলোর মধ্যে অন্যতম নিকৃষ্ট জেনোসাইড হিসেবে। মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্রগুলোতে দেখা যায়, ধর্ষণের লক্ষ্য ছিল মূলত বাঙালি হিন্দু নারীরা। কিন্তু ধীরে ধীরে কি হিন্দু, কি মুসলিম- সকল নারীই যৌন নির্যাতনের শিকার হয়। যুদ্ধকালে পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যতম লক্ষ্য ছিল হিন্দুয়ানি মুসলিম বাঙ্গালিদের প্রকৃত মুসলমানে উন্নীত করা। সুতরাং হত্যাযজ্ঞের মাধ্যমে বিদ্যমান বাঙালিদের নিধন করে, ধর্ষণের মধ্য দিয়ে বাঙালি নারীদের মধ্যে প্রকৃত মুসলমান পশ্চিম পাকিস্তানের বীজ বপন করার প্রচেষ্টা চালানো হয় (মোমতাজ, ১৯৭২)।

পুরুষের যৌন হয়রানি রয়ে যায় অন্তরালেই

বাঙালি পুরুষকে জোর করে উলঙ্গ করে তার পুরুষাঙ্গ প্রদর্শনের পাশাপাশি আরো যৌন হয়রানিমূলক আচরণের তথ্য আছে। যেমন- উলঙ্গ করে পুরো গ্রাম হাঁটতে বাধ্য করা, উলঙ্গ করে বেত্রাঘাত কিংবা পুরুষাঙ্গ নিয়ে রসিকতা। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্রগুলো নারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধকালীন যৌন নির্যাতন নিয়ে যতটা সরব, ততটাই নিশ্চুপ পুরুষের ওপর করা যৌন হয়রানির বিষয়ে। আর প্রথম মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক চলচ্চিত্র 'ওরা ১১ জন' এর কোথাও এই বিষয়টির ন্যূনতম আভাস মেলেনি। এ যেন বাঙালি পুরুষের যৌন হয়রানির ঘটনা বিলোপ করে দেয়ার চেষ্টা (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, ২০১৩)।

আমাদের বিশ্লেষণ

'মা- বোনেরা ঘর ছাড়ো, প্রীতিলতার পথ ধরো'।
'ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো'।
'তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা মেঘনা যমুনা'।

এমনই স্লোগানে উজ্জীবিত ছিল বাংলার শত শত নারীর কণ্ঠ। দেশ স্বাধীন হয়েছে শুধু পুরুষের জন্য নয়, বরং নারীরাও এক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছেন। দেশ মাতৃকার মুক্তির জন্য পুরুষের পাশাপাশি অসংখ্য নারী অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও দিক নির্দেশনা ছাড়াই স্বাধীনতা সংগ্রামে সশস্ত্র অংশ নিয়ে এটা প্রমাণ করেছেন যে, মুক্তিযুদ্ধের সকল গৌরবে তাঁরাও সমান অংশীদার। প্রণোদক, কূটনীতিক, প্রশিক্ষক, বোমা তৈরীকারক ও অস্ত্র সংগ্রাহক, বার্তাবাহক, যোদ্ধা; এ ধরনের সকল ভূমিকাই নারীরা বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পালন করেছিলেন। কিন্তু নারীর এই

ভূমিকাগুলো মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক চলচ্চিত্রে অনুপস্থিত। যুদ্ধে নারী বীর হয় না; ইতিহাসেও না; চলচ্চিত্রেও না। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্রে নারীর আদর্শ সতীরূপ এবং নারীকে উপজীব্য করে যৌনতা নির্মাণ করা হয়েছে। পুরুষের 'ক্ষতিগ্রস্ত' হিসেবে ভাবমূর্তিটি আড়াল করা হয়েছে, কারণ মনে করা হয় পুরুষ আক্রান্ত হওয়া মানে তার ক্ষমতা, যোগ্যতা, দক্ষতা এবং শক্তির দম্ভ আক্রান্ত হওয়া। সেখানে পুরুষের দুর্বল দিক চাপিয়ে রেখে একজন প্রকৃত পুরুষ হওয়ার শিক্ষা দেওয়া হয় এবং নারীকে চিহ্নিত করা হয় দুর্বল হিসেবে। পুরুষই ঘটনার সংঘঠক, নারী ঘটনার অক্রিয় অংশ। সংখ্যার বিচারে মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্রে নারীর চরিত্র, অবস্থান ও অবদানের ইতিবাচক চিত্র খুব কমই উপস্থাপিত হয়েছে। নারী চরিত্রগুলো নির্দিষ্ট কিছু রূপে বাঁধা। যেমন- জননী, স্ত্রী, অসহায় নির্যাতিতা, গৃহকোণবাসী, কামোদ্দীপক, পরনির্ভর সব মিলিয়ে গুরুত্বহীন।

ইতিহাসের পরিক্রমায় এটা প্রমাণিত হয় যে, নারীর প্রতি সহিংসতা, ধর্ষণ ও যৌন অপরাধ কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় বরং এটি পরিকল্পিত বিষয় এবং যুদ্ধকৌশল। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলার নারীরা শুধু নিজেদের সম্ভ্রমই বলি দেননি, সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন দেশ মাতৃকার মুক্তির সংগ্রামে। মুক্তিযুদ্ধে নারীদের অবদান অপরিসীম। তাদের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শনের নিমিত্তে চলচ্চিত্রে তাদের ইতিবাচক ভাবমূর্তি উপস্থাপন করা প্রয়োজন। তাদের কৃতিত্বপূর্ণ কাজের স্বীকৃতি দিতে হবে। তাই আমাদের দেশের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্রে নারীর ভাবমূর্তি যেন কোনোভাবেই নষ্ট না হয় এবং পুরুষের পাশাপাশি তাদের বীরত্বপূর্ণ অবদানগুলোও যেন ফুটে ওঠে সে ব্যাপারে সকল নির্মাতা, কলাকুশলী- সর্বোপরি, দেশের সবাইকে সচেষ্ট হতে হবে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক- সর্বক্ষেত্রে নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূর করতে হবে। আমাদেরকে কাজী নজরুল ইসলামের সেই বিখ্যাত বাণী ভুলে গেলে চলবে না যে-

'এ পৃথিবীতে যা কিছু সুন্দর, চির কল্যাণকর,
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর'।

তথ্য নির্দেশ:

- রোকেয়া কবীর (২০০৬), মুক্তিযুদ্ধ ও নারী, আইইডি প্রকাশনী, ঢাকা, বাংলাদেশ।
- কাবেরী গায়েন (২০১৩), মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্রে নারী নির্মাণ, বেঙ্গল প্রকাশনী, ঢাকা, বাংলাদেশ।

- হাসান মাহমুদ (২০০৩), মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্র, বেঙ্গল প্রকাশনী, ঢাকা, বাংলাদেশ।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা (২০১৩), ওরা ১১ জন: মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রথম চলচ্চিত্রের লৈঙ্গিক নির্মণ বিচার।
- Oldstein, J.S. (2001). War and Gender. Cambridge, Cambridge University Press, UK.
- সিতারা পারভীন (২০০২), গণমাধ্যম ও গণসমাজ, শ্রাবণ প্রকাশনী, ঢাকা, বাংলাদেশ।
- Somewhere in Blog (2014). বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্র, Available at: http://www.somewhereinblog.net/blog/Darashiko_47/29730950 [Accessed on 2nd November, 2018]
- চাষী নজরুল ইসলাম (১৯৭২), ওরা ১১ জন, বাংলাদেশ।
- আনন্দ (১৯৭২), বাঘা বাঙালি, বাংলাদেশ।
- সুভাষ দত্ত (১৯৭২), অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী, বাংলাদেশ।
- মমতাজ আলী (১৯৭২), রক্তাক্ত বাংলা, বাংলাদেশ।
- হুমায়ুন আহমেদ (১৯৯৪), আগুনের পরশমণি, বাংলাদেশ।
- রুবাইয়াত হোসেন, (২০১১), মেহেরজান, বাংলাদেশ।
- শামীম আক্তার (১৯৯৯), ইতিহাস কন্যা, বাংলাদেশ।
- নাসিরুদ্দিন ইউসুফ (২০১১), গেরিলা, বাংলাদেশ।

জান্নাতুল আনজুম অর্পি
শিক্ষার্থী, উইমেন এন্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
সদস্য, জেন্ডার এন্ড ডেভেলপমেন্ট টিম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা সংসদ

বাংলায় পালযুগে বৌদ্ধ ঐতিহ্যের প্রভাব: একটি সমীক্ষা

রোমানা পাপড়ি*

সভ্যতা ও সমাজ এমনকি কোনো জনপদে বসবাসরত জনগোষ্ঠী সম্পর্কে জানতে হলে সেই স্থানের ভৌগোলিক অবস্থান, বসবাসরত মানুষের সামাজিক আচার-আচরণ, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং কৃষ্টি-সংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা নিতে হয়। এ তথ্যগুলোর মধ্য দিয়ে একটি জাতির সামগ্রিক ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করা যায়। মহামানব গৌতম বুদ্ধ বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে তাঁর নৈতিক শিক্ষা, আর্দশ এবং মানবিক উপদেশের ওপর ভিত্তি করে ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের উন্মেষ ঘটে। সুদীর্ঘ ৪৫ বছর তিনি ধর্মপ্রচার করে মহাপরিনির্বান লাভ করেন। পরে তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যগণ বৌদ্ধধর্ম প্রচার-প্রসারে সহায়ক ভূমিকা পালন করেন। তেমনি বাংলায় বৌদ্ধধর্ম বিস্তারে পাল রাজাদের অবদান অগ্রগণ্য। তাই পাল যুগকে বাংলার বৌদ্ধধর্মের সোনালি যুগ বলা হয়।

পাল সাম্রাজ্য/বংশ

পাল সাম্রাজ্যের উৎসস্থল বাংলা অঞ্চল। নামকরণ করা হয় এ বংশের শাসকদের নামানুসারে। পাল সম্রাটদের নামের শেষে 'পাল' অনুসর্গটি যুক্ত ছিল। প্রাচীন প্রাকৃত ভাষায় এই শব্দটির অর্থ 'রক্ষাকর্তা'। তারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন। গোপালের রাজ্যাভিষেকের সঙ্গে সঙ্গে তাদের সাম্রাজ্যের উৎপত্তি ঘটে। এই বংশ চারশত বছর রাজত্ব করে। ফলে প্রাচীন বাংলার সভ্যতা, সংস্কৃতি, শিল্প, সাহিত্য, জ্ঞান ও বিজ্ঞানে বিরাট উন্নতি লাভ করেছিল। গোয়ালিয়র লিপিসূত্রে পাল রাজাদের মূল রাজ্য ও বাসভূমি বাংলাতেই ছিল।[১] পাল যুগ প্রাচীন ইতিহাসে গৌরবময় অধ্যায়। দীর্ঘকালব্যাপী রাজত্ব করে তাঁরা ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। তাঁদের এ পথ মসৃণ ছিল না। নানা চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে পাল রাজারা তাঁদের শাসন অব্যাহত রেখেছেন। বিস্তৃত সাম্রাজ্য, প্রজাবৎসল নীতি, সুষ্ঠু সমাজব্যবস্থা, বিভিন্ন শিল্পকলার ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উৎকর্ষ সাধন এবং সাহিত্য ও জ্ঞানচর্চা এ সবই পাল যুগের কৃতিত্ব ও গৌরব।[২]

পাল যুগের শুরু

প্রস্তর যুগে বাংলার জনবসতি কেমন ছিল তা জানা যায়নি। তবে ইদানীং বাংলার বিভিন্ন জায়গা থেকে মাটি খুঁড়ে প্রস্তর যুগের যেসব নিদর্শন পাওয়া গেছে, তাতে বোঝা যায় যে, প্রস্তর যুগেও জনপদের অস্তিত্ব ছিল। প্রাচীন যুগের ইতিহাস থেকে জানা যায়, তৎকালীন বাংলার বিভিন্ন নামের অনেক জনপদ ছিল, যার মধ্যে একটির নাম ছিল 'বঙ্গ'। সংস্কৃত সাহিত্যেও 'বঙ্গ' শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায়। ইতিহাস থেকে আরও জানা যায়, আজ থেকে প্রায় চারশত বছর আগে পর্যন্ত, যখন প্রস্তর যুগ অবশিষ্ট ছিল, ঠিক সেই সময়েই দ্রাবিড় গোষ্ঠী, তিব্বতি-বর্মী গোষ্ঠীর মানুষ ও অষ্ট-এশিয়াটিক জাতির মানুষ বাংলায় তাদের অস্তিত্ব জানান দিতে শুরু করে। খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম

শতাব্দীতে বর্তমানের বিহার ও বাংলা এলাকা নিয়ে গঠিত হয় মগধ সাম্রাজ্য। ভারতের চারটি মূল সাম্রাজ্যের মধ্যে এটি ছিল অন্যতম। বহু জনপদে বিভক্ত ছিল মগধ। ক্রমে ক্রমে মগধ সাম্রাজ্য প্রায় সম্পূর্ণ দক্ষিণ এশিয়ায় বিস্তার লাভ করে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলায় আসে পাল শাসন।

পাল রাজাদের আদি বাসস্থান

পাল রাজাদের রাজধানী মগধে হলেও ড. মজুমদারের ভাষায়, পাল রাজাদের আদি বাসস্থান ছিল 'বরেন্দ্রী'। সান্ধ্যকর নন্দীর রামচরিতে বারেন্দ্রীকেই পাল রাজাদের বাসভূমি বলা হয়েছে। কোনো কোনো পণ্ডিত মগধকে পালদের আদি বাসস্থান বলেন, কারণ তাঁদের বেশিরভাগ লিপি এখানে পাওয়া যায়। কিন্তু এই মত প্রমাণ ও যুক্তিসহ নয়। নাগভট্ট প্রতিহারের গোয়ালিয়র লিপিতেও পাল রাজাদের বঙ্গপতি বলা হয়।[৩]

পাল রাজাদের উৎপত্তি

পাল রাজাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে যেমন কোনো সঠিক তথ্য নেই, তেমনি তাদের আদি রাজ্য, যেখানে তারা প্রথম ক্ষমতা বিস্তার করেন, সে সম্বন্ধেও কোনো সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব নয়। সান্ধ্যকর নন্দী বিরচিত রামচরিত গ্রন্থে বরেন্দ্র (উত্তর বাংলা) পাল রাজাদের 'জনকভু' (পিতৃভূমি) বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বৈদ্যদেবের কামৌলি তাম্রলিপিতে ঐ একই ইঙ্গিত আছে। প্রথম মহীপালের বানগড় তাম্রলিপিতে যে রাজ্যম্ পিত্র্যম্ এ উল্লেখ আছে, সেটাও উত্তরবঙ্গ বলে মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। এই সব তথ্য হতে নিঃসন্দেহে বলা যায়, উত্তরবঙ্গ পালবংশের বা গোপালের আদি বাসস্থান ছিল এবং এই অঞ্চলে তাঁরা প্রথম ক্ষমতা বিস্তার করেছিল।

কিন্তু রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ ঐতিহাসিক সাধারণভাবে উক্তি করেছেন যে, পালগণ বঙ্গ অঞ্চলে ক্ষমতা বিস্তার করেছিল এবং সমস্ত বাংলাদেশ তাঁদের আধিপত্য প্রথম হতেই ছিল। যে সময়ে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার ইতিহাস সম্বন্ধে উৎসের অভাবে তেমন কোনো স্পষ্ট ধারণা করা সম্ভব ছিল না, সেই সময়ে এ ধরনের মত গ্রহণযোগ্য বলে মনে করা যেত। কিন্তু ইদানীং বিশেষ করে ময়নামতিতে প্রাপ্ত উপাদানসমূহ হতে দক্ষিণপূর্ব বাংলার ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের পক্ষে অনেকটা ধারণা করা সম্ভব। বর্তমানে অষ্টম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে দেব রাজবংশের অবস্থিতি প্রমাণিত হয়েছে। ফলে ঐ ধরনের সাধারণ উক্তি এখন আর গ্রহণযোগ্য মনে করা যায় না। তাছাড়া প্রাথমিক পাল রাজাদের যে সমস্ত লিপি আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে তা সবই বিহার হতে প্রকাশিত। এবং ওইসব লিপি অনুযায়ী সব ভূমিই হয় বিহার, না হয় উত্তর বা উত্তর-পশ্চিম বাংলায় অবস্থিত।

দ্বিতীয় গোপালের রাজত্বকালের আগে কোনো পালরাজার কোনো লিপিই দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার কোনো জায়গায় পাওয়া যায়নি। এমনকি এই লিপিখোদিত মূর্তি বহিরাগত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। সুতরাং পাল বংশের প্রাথমিক পর্যায়ে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায়

(বঙ্গে) তাদের আধিপত্য ছিল এরূপ সিদ্ধান্ত করার পিছনে তেমন কোনো যুক্তি নেই। দেব রাজবংশের অবস্থিতি ঐ অঞ্চলের পৃথক রাজনৈতিক অস্তিত্বের কথা ঘোষণা করে।

পালরাজাদের পরিচয়

প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে পাল রাজাদের অবদান অনেক বেশি। শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশ ও ধর্মীয় সহিষ্ণুতার কারণে পাল বংশের শাসনকালকে সমৃদ্ধির কাল বললে ভুল হয় না। তাঁরা ব্রাহ্মণ্য মন্দিরে সাহায্য দিতেন। বৌদ্ধধর্ম বহির্ভূত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় সম্প্রদায় থেকে এ সময়েই বিক্রমপুরের বিক্রমপুরী বিহার ও চট্টগ্রামের পণ্ডিতবিহার নির্মিত হয়েছিল।[৪] বাঙ্গালির প্রথম নির্বাচিত রাজা গোপাল, ধর্মপাল, দেবপাল, মহীপাল, ন্যায়পাল, বিগ্রহপাল, রামপাল ও বীতপাল। এরা বাংলায় বিহার নির্মাণসহ ও বৌদ্ধধর্ম প্রচার প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

পাল যুগে বাংলায় বৌদ্ধধর্ম

সপ্তম শতকে বাংলায় বৌদ্ধ ধর্মের চরম বিশৃঙ্খলা দেখা যায়। রাজা গোপালের নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বৌদ্ধ ধর্ম বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পায়। বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাসে পাল রাজাদের অবদান সম্রাট অশোক থেকে কোনো অংশে কম নয়। তাই বলা হয়, পাল রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলায় বৌদ্ধধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বৌদ্ধধর্মের বিকাশ ও সমৃদ্ধি লাভের ক্ষেত্রে পাল বংশের রাজত্বকালকে নিঃসন্দেহে স্বর্ণযুগ বলে আখ্যায়িত করা যায়। পাল রাজবংশের প্রতিষ্ঠার ফলে বাংলাদেশের বৌদ্ধধর্মের সুপ্ত আলো দেদীপ্যমান হয়ে ব্যাপক প্রচার-প্রসার লাভের সুযোগ হয়েছিল। এ বংশের প্রতিটি রাজা ছিলেন বুদ্ধের একান্ত ভক্ত ও অনুসারী।

প্রাচীনকালে বঙ্গ-মগধ ছিল পাল বংশের রাজাদের অধীনে। যেহেতু পাল রাজারা বৌদ্ধ ছিলেন। বঙ্গ-মগধ ছিল অনেক বৌদ্ধদের বসবাস।[৫] এ প্রসঙ্গে সপ্তম শতাব্দীর পরবর্তীকালে ভূমিসংক্রান্ত লিপিমালা বিশ্লেষণ করে ব্যারি মরিসন পাল আমলের বৌদ্ধ ধর্মের অবস্থা সম্পর্কে বলেছেন, "ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত কেবল মেঘনার পূর্বাঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম সমৃদ্ধশালী ছিল এবং এই অঞ্চলেই এই ধর্ম রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছে। লিপিমালার প্রারম্ভে যে শ্লোক রয়েছে, তাতে বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়েছে।"[৬] এ থকে প্রতীয়মান হয়, বাংলায় সত্য ধর্ম বিরাজমান ছিল।

যুগের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ধর্মের পরিবর্তন হয়। পাল যুগে বৌদ্ধধর্ম বিবর্তিত হয়ে মহাযান থেকে তন্ত্রযানে রূপান্তরিত হয়। বৌদ্ধধর্ম তিন পর্যায়ে পরিবর্তিত হয়। খিস্টপূর্ব ষষ্ঠশতক হতে খ্রিষ্টীয় প্রথম শতক পর্যন্ত স্থবিরবাদ বা থেরবাদ। খ্রিষ্টীয় প্রথম শতক হতে অষ্টম শতক পর্যন্ত মহাযান এবং অষ্টম শতক হতে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত তন্ত্রযান। পাল যুগে তন্ত্রযান বৌদ্ধধর্ম যথেষ্ট সমৃদ্ধ ছিল এবং আন্তজার্তিক মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল।[৭] তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম মন্ত্রযান, বজ্রযান, কালচক্রযান, সহজযানে পরিণত হয়। তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেছিলেন যারা তাদেরকে সিদ্ধাচার্য বলে। এরূপ ৮৪ জন সিদ্ধাচার্যের নাম জানা যায়। তাঁরা বাংলা ভাষায় অনেক গ্রন্থ রচনা

করেন এবং বাংলা সাহিত্যের প্রবর্তক। তান্ত্রিক সাধনার জন্য তাঁরা যে বৌদ্ধ গান ও দোঁহা রচনা করেন তাই বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন চর্যাপদ। সিদ্ধাচার্যরা নতুন মতবাদ বা ধর্মবিশ্বাস প্রচলন করেন। নাথধর্ম, কৌলধর্ম, অবদূত, সহজিয়া, আউল, বাউল ইত্যাদি।

বহির্বিশ্বে পালরাজাদের বৌদ্ধধর্ম প্রচার-প্রসার

দীর্ঘ চারশত বছরের পাল শাসনামলকে বাংলায় বৌদ্ধধর্মের স্বর্ণযুগ বলা হয়। বৌদ্ধধর্মের শ্রীবৃদ্ধির চেষ্টা বাংলার সীমানার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। বাংলার বাইরে পূর্ব ভারত তথা বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। বিশেষ করে তিব্বত, জাভায় ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম প্রচার প্রসারে পালযুগের অধিকর্তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।[৮]

পালযুগে বাংলায় বৌদ্ধবিদ্যাচর্চা

তৎকালীন পালরাজাদের অনুদানে নির্মিত বিভিন্ন বৌদ্ধ মহাবিদ্যালয়গুলো বরেণ্য পণ্ডিতদের দ্বারা পরিচালিত হতো। সকল বিষয় এখানে পড়ানো হতো। বহির্বিশ্ব থেকে শিক্ষার্থীরা এসে বিদ্যাচর্চা করত। উল্লেখযোগ্য বিহারগুলো হচ্ছে: বিক্রমপুরী মহাবিহার, জগদ্দল মহাবিহার, দেবীকোট মহাবিহার, ত্রৈকূটক বিহার, পণ্ডিত বিহার, হলুদ বিহার, সীতাকোট বিহার। এ যুগের শিক্ষাব্যবস্থা ছিল বিহারকেন্দ্রিক। সব বিহারেই অধ্যাপনা করতেন স্বনামধন্য পণ্ডিতেরা। নাগার্জুন, শীলভদ্র, চন্দ্রগর্ভ, জেতারি, বোধিভদ্র গুরুরা শুধু বিদ্যাদান করতেন না, গবেষণা, গ্রন্থ রচনা করে বিখ্যাত হয়েছিলেন।[৯]

পালযুগের চিত্রকলা

প্রাচীন বৌদ্ধ চিত্রকলার শৈল্পিক সৌন্দর্যমণ্ডিত একমাত্র নিদর্শন হচ্ছে পালযুগের তালপাতার পাণ্ডুলিপিচিত্র অর্থাৎ পুঁথিচিত্র। তবে প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থ 'দিব্যবদান' মতে, শিল্প সমালোচক গবেষকরা অনুমান করেন, খ্রিষ্টপূর্বকালে উত্তরবঙ্গের সমৃদ্ধ নগরী পুণ্ড্রবর্ধনে চিত্রকর্মের প্রচলন ছিল।[১০]

তিব্বতীয় ঐতিহাসিক লামা তারানাথের ভারতীয় বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস গ্রন্থমতে, প্রাচীন বাংলার পালরাজা ধর্মপাল ও দেবপালের আমলের দুজন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী হচ্ছেন ধীমান ও তাঁর পুত্র বিটপাল। শিল্পীদ্বয় চিত্রকর্মে যেমন নিপুন ও সুদক্ষ তেমনি ভাস্কর্য শিল্পেও সমান পারদর্শী ছিলেন। এই পুঁথি চিত্রকলা সম্পর্কে ইতিহাসবিদ নীহাররঞ্জন রায়ের অভিমত হচ্ছে, "ইহারা আকারে ক্ষুদ্র, চরিত্রে বৃহদায়ন, ক্ষুদ্র চিত্রের বৈশিষ্ট্য ইহাদের মধ্যে অনুপস্থিত। এ পর্যন্ত চিত্র সম্বলিত পাণ্ডুলিপি প্রায় কুড়ি-বাইশখানা পাওয়া গিয়াছে, ইহাদের মধ্যে মাত্র একখানা কাগজের পাতায় লেখা এবং ছবিও কাগজের পাতায় আঁকা-লেখার মাঝখানে সমান্তরালে, অন্য সবক'টি তালপাতার পুঁথি। কাগজের পাতার পুঁথিটি বাংলাদেশে কাগজ ব্যবহারের সর্বপ্রাচীন নিদর্শন।"[১১]

মহাযানীপন্থী বৌদ্ধভিক্ষু-উপাসক-সামন্ত-নৃপতি-রাজকর্মচারীদের সহায়তায় পুঁথিগুলো

মূলত ধর্মচর্চা ও পূণ্যার্জনের জন্য চিত্রশোভিত করা হয়েছে। বৌদ্ধ তান্ত্রিক ভাবধারায় এই চিত্রগুলোতে বুদ্ধ জীবনকাহিনীর চেয়ে বৌদ্ধ দেব-দেবীর ছবি বেশি অঙ্কিত হয়েছে। তালপাতার পুঁথিগুলোর চিত্রকর সম্পর্কে শিল্পবোদ্ধা আনন্দ কুমার স্বামী বলেন, "যদিও পালযুগের চিত্রকররা সুদক্ষ ছিলেন, তবুও বলতে হয় যে, গুজরাটি চিত্রকরদের মতো তাদের হাতের তুলির টান লঘু থেকে বলা হয় 'Lightness of touch ছিল না।"[১২] অঙ্কন কৌশল ও সময়ের বিবেচনায় ভারতীয় ক্ল্যাসিক্যাল শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন অজান্তার দেয়াল চিত্রের সাথে পাল যুগের এ অনুচিত্রগুলো সম্পর্কিত।[১৩]

সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য

দীর্ঘ ৪ শতকের পাল শাসনামলে যে সকল স্থাপত্যিক নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে তার সিংহভাগই ধর্মীয় নিদর্শন। এই সুদীর্ঘ স্থাপনা বৌদ্ধধর্মীয় নিদর্শন। এই সুদীর্ঘ কালপরিসরে ধর্ম-বর্ণ-নিরপেক্ষ অবকাঠামো প্রায় অনুপস্থিত। বাংলাদেশের 'সোমপুর মহাবিহার' পাল আমলে নির্মিত স্থাপ্যত্যের অনন্য একটি চিহ্ন। এর পাশাপাশি বাংলাদেশের মহাস্থানগড় থেকেও পাল আমলের অনেক নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। পাল রাজারা বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। দিনাজপুরের নবাবগঞ্জ জেলার সীতাকোট বিহার পাল আমলে নির্মিত আরেকটি বৌদ্ধ ধর্মীয় নিদর্শন। এখানে প্রাপ্ত দুটি বৌদ্ধমূর্তি বোধিসত্ত্ব পদ্মপাণি ও বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রী থেকে বিহারটির সময়কাল ধরা হয় ৭-৮ শতক, পাহাড়পুরের কেন্দ্রীয় মন্দিরের পোড়ামাটির ফলকের মতো ফলকের দেখা মিলেছে রংপুরের একটি মন্দিরে। মন্দিরের ভূমি পরিকল্পনা পাহাড়পুরের কেন্দ্রীয় মন্দিরের ভূমি পরিকল্পনা থেকে কিছুটা ভিন্ন ধরনের।

বৌদ্ধ ধর্মীয় সাংস্কৃতিক নিদর্শন হলেও এগুলোর সময়কাল সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। পক্ষান্তরে পশ্চিমবঙ্গের দিনাজপুর জেলার বানগড়ে প্রাপ্ত নিদর্শন থেকে এই অঞ্চলে পাল সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্যসূত্র থেকে পাল রাজাদের ধর্মীয় সহিষ্ণুতার পরিচয় মেলে। উদাহরণ হিসেবে বাংলাদেশের নওগাঁর বদলগাছি থানায় অবস্থিত পাহাড়পুর বিহারের কথা বলা যেতে পারে। প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে এখানে হিন্দু প্রতিমা পাওয়া যায়। যদি তাই হয় তাহলে একটি বিষয় নিশ্চিত ভাবে বলা যায়, পাল রাজারা নিজেদের পাশাপাশি হিন্দু ধর্মীয় দেব-দেবীকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন।

ধর্মীয় সহিষ্ণুতা

সাহিত্যিক সূত্র থেকে পাল আমলের ধর্মীয় সহিষ্ণুতার কথা জানা যায়। লিপিতাত্ত্বিক বর্ণনা থেকে জানা যায়, ধর্মপালের সামন্ত ছিলেন নারায়ন বর্মণ। তিনি ধর্মপালের অনুমতি সাপেক্ষে একটি মন্দির স্থাপনে ভূমি দান করেন। হিন্দুমন্দির নির্মাণের কাজে সহায়তা প্রদান করায় পালদের ধর্মীয় সহিষ্ণুতার কথা ফুটে ওঠে। ধর্মপালের খালিমপুর তাম্রশাসন থেকে তথ্য পাওয়া যায়, ধর্মপালের সময়কালে গর্গ নামে একজন ব্রাহ্মণকে

তাঁর প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেছিলেন। এ ধরনের উদারতা ইতিহাসে বিরল। এছাড়া নারায়ন পাল, দেবপালেরও এরকম অনেক ধর্মীয় উদারতার কথা মেলে।[১৪]

পোড়ামাটির ফলকচিত্রে প্রাচীন বাংলার জনজীবন

নদীমাতৃক প্রশান্ত মহাসাগরীয় আদি-অস্ট্রেলিয় সভ্যতা প্রভাবিত বাংলাদেশ পোড়ামাটির শিল্পকলার এক উল্লেখযোগ্য প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়, খ্রিষ্টীয় অষ্টম-নবম-দশম শতকে পাল শাসনামল থেকে শুরু। গঙ্গা-মেঘনা-ব্রহ্মপুত্রের পলিবিস্তৃত আঁঠালো নরম মাটির ঢেলা দিয়ে শিল্পকলা গড়ে তুলেছে। নদীর ধারে, পুকুর পাড়ে, মাঠের মধ্যে বসে কাদা নিয়ে খেলা আঁঠালো মাটির নরম ঢেলা নিয়ে বিচিত্ররূপ গড়া ও ভাঙ্গা এবং দৈনন্দিন জীবনের চলতি মুহূর্তের ক্ষণস্থায়ী কামনা বাসনার আনন্দ-বেদনার বিচিত্র গতি ও স্থিতির নানা রূপ দেয়াই বাংলাদেশের মানুষের প্রকৃতিগত স্বভাব। মাটির খেলা বিচিত্র লীলার একটা স্পষ্ট স্বাক্ষর আমরা দেখি নবম শতকে।

বৌদ্ধ শাসক পালেরা মহাযান-বজ্রযান-তন্ত্রযান; ধর্মসম্মত দেবদেবীর প্রতিকৃতি সে সময়ের মৃৎশিল্পে গড়ে তোলার উৎসাহ প্রদান করেছেন। কায়সাধনের নির্দিষ্ট ধ্যানানুযায়ী বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের বিভিন্ন দেব-দেবী, লোকনাথ, মহাকাল, অমিতাভ, অবলোকিতেশ্বর, মৈত্রেয়্য, বজ্রপাণির ভাস্কর্য পোড়ামাটির ফলকে দৃষ্টিগ্রাহ্য হলেও, ঐ শিল্পীরা দৈনন্দিন জীবনকে অগ্রাহ্য করেননি। বিশেষত সেকালের লোকায়ত জীবনের এক বিচিত্র শোভাযাত্রার পরিচয় ফলকগুলোতে দেখা যায়। তাছাড়া, মানবিক কল্পনা, সামাজিক পরিবেশ ও অনুভূতি স্থান পেয়েছে। উৎসবে ঢাক, ঢোল, বাঁশি ইত্যাদির ব্যবহার পোড়ামাটির ফলকচিত্রে পাওয়া যায়। বিয়ে, পূজা, মঙ্গলযাত্রায় কলা গাছের যে প্রচলন- এসব পাল আমলেই পাওয়া যায়।[১৫]

উপসংহার

পালযুগের গুরুত্ব বলতে গিয়ে আর.সি. মজুমদার বলেন, "অর্ধশতাব্দী পূর্বে যে দেশ পরপদানত এবং অরাজকতা ও অত্যাচারের লীলাভূমি ছিল সেই সহসা প্রচণ্ড শক্তিশালী হয়ে সমগ্র আর্যবর্তে প্রভূত বিস্তার করিবে। ইহা অলৌকিক কাহিনীর মতোই অদ্ভুত মনে হয়, এ সামাজিক বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালির নূতন জীবনের সূত্রপাত হয়, ধর্ম, শিল্পে ও সাহিত্যে।[১৬] আচার্য শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেন, "বাংলাদেশে প্রচলিত বৌদ্ধধর্মের একটা বিশেষ রূপ ছিল। অষ্টম হতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই বৌদ্ধমত বাংলাদেশের প্রচার ও প্রসার লাভ করিয়াছিল।"[১৭] পাল রাজাগণ ছিলেন খাঁটি বাঙ্গালি, সে কারণেই পালযুগের ইতিহাস বাঙ্গালি জাতির একান্ত নিজস্বতার চির উজ্জ্বল নিদর্শন এবং পালরাজগণই বাংলার শেষ খাঁটি বাঙ্গালির রাজশক্তি।

তথ্য নির্দেশিকা

১. প্রাচীন বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি, ড. আবদুল মমিন চৌধুরী, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ১২৮
২. বাংলাদেশের ইতিহাসের রূপরেখা, ড. আশফাক হোসেন, জে.কে প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, ঢাকা, পৃ. ১৩৪
৩. বাংলাদেশের ইতিহাস, মুহাম্মদ আবদুর রহিম, আবদুল মমিন চৌধুরী, এ. বি. মহিউদ্দীন মাহমুদ, সিরাজুল ইসলাম, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৭৭, পৃ. ৬৪
৪. ভারত ইতিহাস পরিক্রমা, অধ্যাপক প্রভাতাংশু মাইতি, পৃ. ৩৩০
৫. প্রাচীন বাঙলা ও বাঙালী, ড. সুকুমার সেন, পৃ. ১৪ ও ১৫
৬. প্রাগুক্ত, বাংলাদেশের ইতিহাসের রূপরেখা, ড. আশফাক হোসেন পৃ. ১৮১
৭. প্রাচীন বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি, আবদুল মমিন চৌধুরী, বর্ণায়ন প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০২ পৃ. ৮০
৮. বৌদ্ধ সংস্কৃতি বনাম বাঙালি সংস্কৃতি, ড. জিতেন্দ্র লাল বড়ুয়া, পৃ. ৫৮
৯. বাংলাদেশের প্রাচীন সমাজ, সুপ্তিকণা মজুমদার, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ১০৬
১০. বাংলার চিত্রকলা, অশোক ভট্টাচার্য, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমী, কলিকাতা, ২০০২, পৃ. ১৪
১১. বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, নীহাররঞ্জন রায়, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ৬৬৬ ও ৬৬৭
১২. ভারত শিল্প, নির্মলকুমার ঘোষ, পৃ. ৩৯
১৩. বাংলার বৌদ্ধ ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি, শিমুল বড়ুয়া, অনোমা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী, চট্টগ্রাম, ২০১২, পৃ. ৬৮ ও ৬৯
১৪. প্রত্নচর্চায় বাংলাদেশ, মো. আদনান আরিফ সেলিম, প্রকৃতি-পরিচয় প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ৭৩ ও ৭৪
১৫. তম্রপট্টোলীতে লোকায়ত বাংলা ও অন্যান্য প্রবন্ধ, সাইফুদ্দিন চৌধুরী, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ১৭-১৯
১৬. বাংলাদেশের বাঙালী বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর লোকসংস্কৃতিঃ কীর্তন, নীরু বড়ুয়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, এম.ফিল অভিসন্দর্ভ, ২০১০, পৃ.১০
১৭. বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাগীতি, শশীভূষণ দাশগুপ্ত, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, কলিকাতা, ১৯৯৮, পৃ. ৪৮

রোমানা পাপড়ি
খণ্ডকালীন শিক্ষক, পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
সমন্বয়ক, নৃতাত্ত্বিক টিম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা সংসদ

বাংলাদেশের রাজনীতির ভাষার পটভূমি ও স্বরূপ

মোছাঃ রেখা ইয়াসমিন*

মুখ্য শব্দগুচ্ছঃ ভাষা, রাজনীতি, স্লোগান, প্রতিপক্ষ, উত্তরাধিকার, স্ববিরোধিতা

ভাষা জাতীয় পরিচিতির একটি গুরুত্বপূর্ণ গঠনমূলক উপাদান। রাজনীতির ভাষা একটি ইতিহাস। ইতিহাস যেমন কথা বলে তেমনি এটিও একটি দেশের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কথা বলে। যে কোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থাতে রাজনীতির ভাষা হিসেবে স্লোগান, প্রতিবাদ, প্রতিরোধ একটি অতি সাধারণ ব্যাপার। রাজনীতির মাঠে, রাজপথে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে, রাজনৈতিক দলের মধ্যে কোনো দাবি আদায় বা কোনো সমস্যা দেখা দিলেই নানা স্লোগান প্রতিবাদ প্রতিরোধ উত্থাপিত হতে থাকে। কখনো সরকার, কখনো কোনো প্রতিষ্ঠান, কিংবা কোনো রাজনৈতিক দল ও দলের বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের বিরুদ্ধে তা উচ্চারিত হতে শোনা যায়। বাংলাদেশের রাজনীতির ভাষায় নানা রকমের স্লোগানে প্রতিরোধের ভাষা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বাংলাদেশের অব্যাহত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে ও রাজনীতির ভাষায় এর জনচরিত্রের সাধারণ প্রবণতা ও মনস্তাত্ত্বিক মাত্রাবোধের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতি এখনো গড়ে ওঠেনি। ফলে রাজনীতির ভাষা আক্রমণাত্মক ও অশোভন হয়ে থাকে। এদেশের রাজনৈতিক জনগোষ্ঠীর একটা বদনাম আছে যে, 'হুজুগে বাঙালি'। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, 'সম্রাট বাবর তার আত্মজীবনী 'তুযুক এ বাবরে' লিখেছেন, 'বাঙ্গাল' মুল্‌ক আছে যেখানে, রাস্তার পাগল যদি সিংহাসনের দাবি করে তারও সমর্থক পাওয়া যায়' (মাসুম, ২০০২:২৮)। তবে বাঙালিরা হুজুগে হলেও স্বাধীনচেতা ও প্রতিবাদমুখর আত্মপ্রত্যয়ী জাতি। প্রতিবাদ আর প্রতিরোধের মধ্য দিয়েই স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছে। ১৯৫২, ১৯৫৮, ১৯৬২, ১৯৬৯, ১৯৭১, ১৯৯০ সবই ছিল প্রতিবাদ আর প্রতিরোধের বছর। উল্লেখ্য যে, প্রাচীনকালে বাংলার আর এক নাম ছিল 'বুলঘকপুর' অর্থাৎ বিদ্রোহের দেশ (প্রাগুক্ত, পৃ-৩০)। এ কথা অনস্বীকার্য যে, ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য অতীত বাংলাদেশের জনচরিত্রের ধারাকে বহুলাংশে নিয়ন্ত্রণ করেছে। রাজনীতির ভাষায় যেহেতু জনচরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক রূপটি প্রতিফলিত হয় তাই উপযুক্ত প্রত্যয় আর প্রবণতার প্রেক্ষিতেই নির্ণীত হবে বাংলাদেশের রাজনীতির ভাষার স্বরূপ। উচ্চারিত স্লোগান, প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, পোস্টার, সন্নিবেশিত দেয়াল ও শরীর লিখন এবং প্রকাশিত বক্তব্য প্রমাণ করেছে রাজনীতির ভাষার স্বরূপ। রাজনৈতিক ভাষা কোনো অদৃশ্য ব্যাপার নয়, তার রয়েছে কাঠামোগত দিক। বাংলাদেশের রাজনীতির ভাষায় প্রচলিত বিভিন্ন রাজনৈতিক স্লোগান, দেয়াল লিখন, পোস্টার, প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের ভাষার বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হলো।

অস্থিরতা

এদেশের মানুষের চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্যে হচ্ছে এরা অস্থির প্রকৃতির। সামান্য একটু কিছুতেই এরা ভাঙচুর, হরতাল, অগ্নিসংযোগ ও জ্বালাও পোড়াও করে। মিছিল মিটিংয়ে উচ্চারিত 'জ্বালো, জ্বালো, আগুন জ্বালো' অথবা 'অ্যাকশন, অ্যাকশন, ডাইরেক্ট অ্যাকশন', স্লোগানের মাধ্যমে সামাজিক অস্থিরতাই প্রতিফলিত হয়।

রাজনীতির অঙ্গনে সরকারি দল বিরোধী দলের বিরূদ্ধে, বিরোধী দল সরকারি দলের বিরুদ্ধে, ডানপন্থি দল বামপন্থি দলের বিরূদ্ধে, বামপন্থি দল ডানপন্থি দলের বিরুদ্ধে এই স্লোগান প্রতিনিয়ত ব্যবহার করছে। এছাড়া দেয়ালে, পোস্টারে এই স্লোগান প্রায়শই লেখা হচ্ছে।

অসহিষ্ণুতা

বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে বিরাজমান অসহিষ্ণুতা বিভিন্ন সময় প্রকাশ পায় রাজনীতির ভাষাতে। স্লোগান, দেয়াল লিখন ও বিবৃতি বা বাণী যেখানেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যায়, দেখা যাবে এক দল অপর দলকে কোনোক্রমে সহ্য করতে পারছে না। রাজনীতির ভাষাতে উৎখাত এবং নির্মূলের স্লোগান বহুবার উচ্চারিত হয়েছে এবং হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, 'এরশাদের চামড়া, তুলে নেব আমরা', 'চশমা পরা বুবুজান, নৌকা করে ভারত যান'; 'শেখ হাসিনা আসছে জিয়ার গদি কাঁপছে, গদি ধরে দিব টান, জিয়া হবে খান খান' (আহমেদ, ২০০০:১৩৮)

অরাজকতা

রাজনৈতিক অঙ্গনে বিরাজমান অস্থিরতা ও অসহিষ্ণুতা থেকে সৃষ্টি হয় অরাজক অবস্থার। আর এ অরাজক অবস্থার প্রভাব পড়ে রাজনীতির ভাষার ওপর। যেমন বক্তৃতায়, মিছিলে, বিবৃতিতে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এমনকি দেয়ালে স্লোগান ওঠে- 'বুবুজান বা ভাবীজান, বাংলা ছেড়ে চলে যান', (আলম, ২০০৩:১৬৮); " 'একটা দুটো শিবির ধরো, সকাল বিকাল নাশতা করো'; 'একটা দুটো রক্ষী ধরো, সকাল বিকাল নাশতা করো'; 'আর নয় প্রতিরোধ, এবার হবে প্রতিশোধ'; 'আমরা সবাই তালেবান, বাংলা হবে আফগান'; 'নিজামীর গালে গালে, জুতা মারো তালে তালে'; 'খালেদা জিয়ার গদিতে, আগুন জ্বালাও একসাথে'; 'গোলাম আযমের চামড়া তুলে নেব আমরা'; 'সোনার বাংলা, সোনার ধান, নৌকা যাবে হিন্দুস্তান'; 'আর দিব না নৌকায় ভোট, নৌকা যাবে ভারত'; 'মাথায় হাত পেটে বিষ, আর নয় ধানের শীষ'।"

রাজনীতিতে দ্বন্দ্ব-বিদ্বেষের ফলস্বরূপ সহিংসতা একটা নিত্য নৈমত্তিক ব্যাপার। আর সহিংসতার চিত্র দেয়ালেও প্রতিফলিত হয়। রাজনৈতিক স্লোগানেও সর্বদা প্রত্যুত্তর ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়। দেয়াললিখনে দ্বন্দ্ব-বিদ্বেষ রীতিমতো চোখে পড়ার ব্যাপার। রাজনীতিতে প্রতিপক্ষের দেয়াললিখনের সময়ে আক্রমণ অথবা মুছে ফেলা অথবা বিকৃত করে দেয়া কিংবা নিজ বক্তব্যের স্বপক্ষে পরবির্তন করে দেয়া একটা মামুলি ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। এমনকি এক দল অন্য দলের স্লোগানকে নকল করে।

উদাহরণস্বরূপ, 'যতদিন রবে পদ্মা যমুনা গৌরী মেঘনা বহমান, ততদিন রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান' আলোচ্য স্লোগানের কিছু অংশ পরিবর্তন করে অন্যদল লিখেছে, 'যতদিন রবে পদ্মা মেঘনা যমুনা বহমান, ততদিন রবে কীর্তি তোমার শহীদ জিয়াউর রহমান।'

ছাত্র ইউনিয়নের মিত্র মুজিববাদী ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে জাসদ ও পিকিংপন্থী কমিউনিস্টদের স্লোগান ছিল-

'ইন্দিরা পেড়েছে ডিম
কোসিগিন দিয়েছে তা
তা থেকে বেরিয়ে এলো মুজিববাদের ছা'

স্বাধীনতাত্তোর ছাত্রলীগের সরকার সমর্থক অংশের পাল্টা স্লোগান ছিল পূর্বোক্ত স্লোগানের আংশিক নকল। যেমন-

"নিক্সন পেড়েছে ডিম,
'মাও দিয়েছে তা,
তা থেকে বের হলো বৈজ্ঞানিকের ছা'

ভাবাদর্শের সংঘাত

বাংলাদেশের রাজনীতিতে ভাবাদর্শের তীব্র সংঘাত চলছে। ১৯৭৫ সাল হচ্ছে ভাবাদর্শের পালাবদলের একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়। গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদ শিরোনামে চারটি মূলনীতি গৃহীত হয় ১৯৭২ সালের মূল সংবিধানে। পরবর্তীতে ১৯৭৭ সালে জিয়াউর রহমান ক্ষমতাসীন হওয়ার মাধ্যমে ১৯৭৯ সালে সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে ধর্মনিরপেক্ষতার স্থলে আল্লাহর প্রতি গভীর আস্থা ও বিশ্বাস, সমাজতন্ত্রের পরিবর্তে 'অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে সমাজতন্ত্র' ও বাঙালি জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ প্রতিস্থাপিত হয়, যা পরবর্তী সময়ে বিতর্কিত বিষয়ে রূপ নেয় এবং বর্তমানেও দেখা যায়। দেয়াললিখন ও স্লোগানে এসব বিতর্ক বিভিন্ন সময় উপস্থাপন করা হয়।

যেমন, ইসলাম বনাম ধর্মনিরপেক্ষতা, জয় বাংলা বনাম বাংলাদেশ জিন্দাবাদ, বাঙালি বনাম বাংলাদেশী, সমাজতন্ত্র বনাম অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার, মুক্তিযোদ্ধা বনাম রাজাকার, স্বাধীনতার স্বপক্ষ বনাম স্বাধীনতার বিপক্ষ ইত্যাদি।

জাতীয় সংকট

১৯৯০ এর গণঅভ্যুত্থান ও এর পূর্ববর্তী এবং তৎপরবর্তী দুই দশকে রাজনীতির অঙ্গনে একটির পর একটি সংকট ঘনীভূত হয়েছে। তাই ঐসব সমস্যা ও সংকট উক্ত সময়ের স্লোগান, প্রতিবাদ-প্রতিরোধ এবং দেয়াল ও শরীরলিখনে প্রতিফলিত হয়েছে। ১৯৯০ সালে এরশাদ-স্বৈরাচারবিরোধী গণতন্ত্র প্রত্যাশী স্লোগান, প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, দেয়াল ও শরীরলিখন বিরাজমান ছিল। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৮৭ সালের ১০ই নভেম্বর স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের মিছিলে অংশ নেওয়া নূর হোসেনের বুক

ও পিঠে লেখা ছিল- 'স্বৈরাচার নিপাত যাক, গণতন্ত্র মুক্তি পাক' (রহমান, ২০১৬:৭৪)। স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম একটি স্লোগান হল- 'হৈ হৈ রই রই স্বৈরাচার গেলো কই'।

১৯৯২-এর ইস্যু ছিল গোলাম আযম, ১৯৯৪-এ তসলিমা নাসরিন, '৯৫-এ বিএনপি সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার আন্দোলন। ১৯৯৬ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রত্যাশী বিএনপি সরকারবিরোধী অন্য দলগুলোর প্রতিবাদের ভাষা হিসেবে স্লোগান ছিল- 'লড়াই লড়াই লড়াই চাই, লড়াই করে বাঁচতে চাই', 'একাত্তরের হাতিয়ার, গর্জে উঠুক আরেকবার', 'চলছে লড়াই চলবে, শেখ হাসিনা লড়বে'

'৯৭- এ উপআঞ্চলিক জোট,' ৯৮-এ পার্বত্য চট্টগ্রাম ইস্যু, '৯৯-এ ট্রানজিট, ২০০০ সালে জননিরাপত্তা আইন তথা আওয়ামী সরকার হটাও এর এক দফা আন্দোলন, ২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবর লগি-বৈঠা আন্দোলন।

ধর্মীয় প্রভাব

বাংলাদেশে রাজনীতির ভাষার বক্তব্যে ধর্ম একটি অনিবার্য বিষয়। রাজনৈতিক স্লোগানে, দেয়াললিখনে, এমনকি ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী রাজনৈতিক দলসমূহের পোস্টার ও লিফলেটে ধর্মের ব্যবহার ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়ে আসছে। তবে এর বিভিন্ন রূপ চোখে পড়ে। ডান ধারার দলগুলো 'নারায়ে তাকবির আল্লাহু আকবর' ব্যবহার করে উদ্বোধনী স্লোগানে ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিভিন্ন পত্র লিখনের প্রথমে। আওয়ামী লীগসহ বামধারার দলসমূহ উদ্বোধনী 'স্লোগান হিসেবে কখনো 'নারায়ে তাকবির' ব্যবহার করেনি। তবে তাদের পোস্টার ও লিফলেটে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আল্লাহু আকবার এর বাংলা প্রতিশব্দ আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান ব্যবহৃত হয়েছে। তাছাড়া আওয়ামীলীগের নির্বাচনী প্রচারণার স্লোগানে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, নৌকার মালিক তুই আল্লাহ্' এবং জামায়াতে ইসলামীর স্লোগানে 'মার্কা মোদের দাঁড়িপাল্লা, পাশ করাইয়া দে তুই আল্লা(হ্)' ঐ রকম শব্দের উচ্চারণ ছিল বহুল। নির্বাচনী সভাগুলোতে ইসলামী সম্বোধন এবং আসসালামু আলাইকুম', 'খোদা হাফেজ' এবং ইসলামী পরিভাষা (ইনশাল্লাহ্, মাশাল্লাহ্ ইত্যাদি) এর ব্যাপক ব্যবহার পরিলক্ষিত। ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলো ধর্মকেই তাদের আবেদনের প্রধান ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করে। যেমন- জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ দলের নেতা-কর্মীরা সর্বত্র 'আল্লাহর আইন' 'আল্ কোরআনের পার্লামেন্ট' ইত্যাদি পরিভাষা ব্যবহার করেছে। এমনকি মধ্যপন্থি বিএনপি 'বিসমিল্লাহির রহ্মানির রহীম' এবং জাতীয় পার্টি 'আল্লাহর প্রতি আস্থা' এবং ইসলামী মূল্যবোধের কথা বলেছে সংবিধানে।

উত্তরাধিকারের রাজনীতি

এদেশের বড় দুটি রাজনৈতিক দলের একটির আদর্শ শেখ মুজিবুর রহমান, অন্যটির আদর্শ জিয়াউর রহমান। দুটি রাজনৈতিক দলের পোস্টার, দেয়াললিখন, স্লোগান ও বক্তব্যে ঐ প্রয়াত দুই নেতার অনিবার্য উপস্থিতি লক্ষ্যণীয়। জাতির পিতা, স্বাধীনতার

ঘোষক ও বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্থপতি হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমান এবং রাষ্ট্রনায়ক ও আধুনিক বাংলার রূপকার হিসেবে জিয়াউর রহমান; দু'জন নেতার নাম ও প্রতিকৃতি প্রতিটি মিছিলে, প্রতিটি পোস্টারে এবং প্রতিটি আলোচনায় ব্যবহার করা হচ্ছে। যেমন, 'যতদিন রবে পদ্মা যমুনা গৌরী মেঘনা বহমান; ততদিন রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান'; 'মহান দেশের মহান নেতা শেখ মুজিব শেখ মুজিব'; 'জয় বাংলার পতাকায় মুজিবের প্রতিচ্ছবি'; 'কে বলেছে মুজিব নাই, মুজিব আছে সারা বাংলায়'; 'এক নেতার এক দেশ বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ'; 'আমার নেতা তোমার নেতা শেখ মুজিব শেখ মুজিব'; 'বঙ্গবন্ধুর স্মরণে, ভয় করি না মরণে'; 'আমরা সবাই মুজিব সেনা, ভয় করি না বুলেট বোমা'; 'এক জিয়া লোকান্তরে, লক্ষ জিয়া ঘরে ঘরে'; 'সারা বাংলার ধানের শীষে, জিয়া তুমি আছ মিশে' (মাসুম, ২০০২:৩৪)। এরকম হাজারও স্লোগান প্রতিনিয়ত ব্যবহৃত হচ্ছে দেশজুড়ে।

ব্যক্তি প্রাধান্য

সম্মোহনী নেতৃত্বের বাইরের রাজনৈতিক নেতারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যক্তি ইমেজ প্রতিষ্ঠায় ব্যস্ত। তাদের স্লোগান, পোস্টার ও লিফলেট ও দেয়াললিখনে প্রতিফলিত হয় নানা রকমের খেতাব। যেমন, 'কিংবদন্তীর মহানায়ক', 'সময়ের সারথী সন্তান', 'সূর্য সারণী', 'রাজপথ কাঁপানো অবিসংবাদিত নেতা', 'অকুতোভয় রণতূর্য', 'জনদরদী', 'অগ্নিকন্যা' ইত্যাদি অভিধায় অভিষিক্ত হচ্ছে। গ্রেফতার, হুলিয়া, জেলখাটা ইত্যাদি ইতিবাচক বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এমনও চোখে পড়ে যে, রাজনীতিতে, সমাজে, প্রতিষ্ঠানে ও জনাকীর্ণ স্থানে বড় বড় অক্ষরে দেয়ালে পোস্টারে তাদের নাম মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য শোভাবর্ধন করছে। এভাবে ব্যক্তি ইমেজ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় ভাষার অপপ্রয়োগ চালানো হচ্ছে।

মৌল সমস্যার অনুপস্থিতি

হাজারও মৌলিক সমস্যার বাংলাদেশে স্লোগান, পোস্টার, দেয়াললিখনে জাতীয় মৌল সমস্যা তেমনটি চোখে পড়ে না। যেমন ক্ষুধা, দারিদ্র, দুর্নীতি, বেকারত্ব, গুম, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি ইত্যাদি বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সুষ্ঠু কোনো বক্তব্য নেই। তাদের বক্তব্যের গভীরতা কম, হালকা ধরনের; যেমন, 'এ সমাজ ভাঙতে হবে নতুন সমাজ গড়তে হবে' অথবা 'ভাত, কাপড়, বাসস্থান, ইসলাম দেবে সমাধান' (আলম, ২০০৩: ১৭২)- এ ধরনের বক্তব্য সমস্যার গভীরতায় প্রবেশ করে না।

নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি

বাংলাদেশের ১৯৯১ সাল পরবর্তী রাজনীতির ভাষা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ইতিবাচকের চেয়ে নেতিবাচক স্লোগান, পোস্টার, লিফলেট বেশি প্রতীয়মান হয়। যেমন, 'লড়াই লড়াই, লড়াই হবে, এই লড়াইয়ে জিততে হবে'; 'একটা দুটো শিবির ধরো, সকাল বিকাল নাশতা করো '; 'একটা দু'টো রক্ষী ধরো, সকাল বিকাল নাশতা করো'; 'আর নয় প্রতিরোধ, এবার হবে প্রতিশোধ'; 'আমরা সবাই তালেবান, বাংলা

হবে আফগান'; 'খালেদা জিয়ার গদিতে আগুন জ্বালাও একসাথে' ; 'মানিনা মানব না'; লড়াই লড়াই লড়াই চাই, লড়াই করে বাঁচতে চাই' (আলম, ২০০৩:১৭২) । 'এ লড়াইয়ে জিতবে কারা শেখ হাসিনা/খালেদা জিয়ার সৈনিকেরা'; 'দিয়েছিতো রক্ত, আরও দেব রক্ত।" আলোচ্য স্লোগানের মতো চরম যুদ্ধাংদেহী স্লোগান প্রতিনিয়ত আবৃত্ত হচ্ছে রাজনৈতিক ভাষায়।

স্ববিরোধিতা

রাজনীতির ভাষায় স্ববিরোধিতামূলক স্লোগান একটি অন্যতম কার্যফলাফলগত বৈশিষ্ট্য। রাজনৈতিক নেতা, রাজনৈতিক দল ও ছাত্র সংগঠনগুলো প্রতিনিয়ত যে সমস্ত বক্তব্য বা নীতি-আদর্শ প্রচার করে, বাস্তবে কাজ করে তার পুরো উল্টো। যেমন বাংলাদেশের এমন কোনো ছাত্র সংগঠন নেই, যারা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে, অস্ত্রধারীদের বিরুদ্ধে বক্তব্য দিচ্ছে না। কিন্তু শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস মোটেই কমছে না। এ বক্তব্যের সমর্থনে ছাত্র সংগঠনগুলোর কিছু সাধারণ স্লোগানের উদ্ধৃতি দেয়া যেতে পারে। যেমন;

১. শিক্ষা শান্তি প্রগতি ছাত্রলীগের মূলনীতি।- ছাত্রলীগ
২. ছাত্রলীগ দিচ্ছে ডাক, সন্ত্রাসবাদ নিপাত যাক।- ছাত্রলীগ
৩. সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাঙ্গন গড়াই ছাত্রলীগের মূল লক্ষ্য।- ছাত্রলীগ
৪. শিক্ষা ঐক্য প্রগতি ছাত্রদলের মূলনীতি।-ছাত্রদল
৫. সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে, লড়তে হবে একসাথে।-ছাত্রদল
৬. সন্ত্রাসীদের কালো হাত ভেঙ্গে দাও গুড়িয়ে দাও।- ছাত্রদল
৭. রক্তস্নাত গণতন্ত্র সংহত করে মাস্তান রুখবই।-ছাত্র ইউনিয়ন
৮. অস্ত্র ছাড়ো কলম ধরো, শিক্ষাজীবন রক্ষা করো।-ছাত্রফ্রন্ট
৯. সন্ত্রাসীদের সামাজিকভাবে বয়কট করুন।–ছাত্র সমিতি
১০. চাই সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাঙ্গনে জ্ঞানের সম্মেলন।-ইসলামী ছাত্রশিবির
১১. সন্ত্রাসীদের পৃষ্ঠপোষক সংগঠনসমূহ বর্জন করুন।-ছাত্র ফেডারেশন
১২. সন্ত্রাসের কবল থেকে শিক্ষা জীবন রক্ষা করো।-সমাজবাদী ছাত্রজোট
১৩. সন্ত্রাসী ও মাস্তানদের রাজনৈতিক ও প্রসাশনিক আশ্রয়ছল বন্ধ করো।-ছাত্রদল
১৪. হল থেকে দল থেকে সন্ত্রাসীদের বহিষ্কার করুন।-সংগ্রামী ছাত্রফ্রন্ট
(মাসুম, ২০০২:৩৭)

বিরোধিতা

রাজনীতির ভাষার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হচ্ছে- বিরোধী স্লোগান। উদাহরণস্বরূপ- 'রুশ ভারতের দালালেরা হুঁশিয়ার সাবধান'; 'ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক, নিপাত যাক';'রুশ, 'ভারত, মার্কিন, ফুরিয়ে গেছে তোদের দিন'; 'মরণ ফাঁদ ফারাক্কা বাধ ভেঙ্গে দাও, গুড়িয়ে দাও'; 'হটাও ভারত বাঁচাও দেশ'; 'রুশ যাদের মামাবাড়ি, বাংলা ছাড় তাড়াতাড়ি'; 'বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাটি, বুঝে নিক দুর্বৃত্ত'; 'নাস্তিক রাশিয়া

কিংবা বির্ধমী ভারত নয়, এ দেশ আমার বাংলাদেশ'; 'গঙ্গার পানির ন্যায্য হিস্যা চাই'; 'ভারতের দালালেরা হুঁশিয়ার সাবধান'; 'সীমান্তের ওপারে আমাদের বন্ধু আছে।" (আলম, ২০০৩:১৭৪)

বাংলাদেশের রাজনীতির ভাষায় বাঙালি মানস প্রবণতা বিদ্যমান। দেশটির রাজনীতির অঙ্গনে অস্থিরতা, অসহিষ্ণুতা, অরাজকতা, ভাবাদর্শের সংঘাত, জাতীয় সংকট, ধর্মীয় প্রভাব, উত্তরাধিকারের রাজনীতি, ব্যক্তি প্রাধান্য, মৌল সমস্যার অনুপস্থিত, নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি, স্ববিরোধিতা, বিরোধিতা প্রভৃতি বিষয়গুলোর উপস্থিতি লক্ষ্যণীয়। এ ভাষাতে রয়েছে শালীন ও অশালীন ভাষার সহাবস্থান। প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের ভাষা হিসেবে অধিকাংশ স্লোগানে আক্রমণাত্মক ভাষা ব্যবহৃত হয়। স্লোগানের মাধ্যমে কেবল জনগণকে উজ্জীবিতই করে রাখা হয় না এমনকি রাজনীতির মাঠও গরম করে রাখা হয়।

গ্রন্থপঞ্জি

- হাই, মুহাম্মদ আবদুল। (১৯৬৯)। তোষামোদ ও রাজনীতির ভাষা। ঢাকা: বাংলা বাজার।
- হক, ড.আবুল ফজল। (২০১৪)। বাংলাদেশ রাজনৈতিক সংস্কৃতি। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স।
- রহমান, মুহাম্মদ হাবিবুর। (২০১৬)। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ঘটনাপঞ্জি (১৯৭১-২০১১)। ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন।
- রহমান, শেখ মুজিবুর। (২০১৭)। অসমাপ্ত আত্মজীবনী। ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড।
- রেহমান, তারেক শামসুর, সম্পাদিত। (২০০৯)। বাংলাদেশের রাজনীতির চার দশক, প্রথম খন্ড। ঢাকা: শোভা প্রকাশ।
- সম্পাদনা: হুমায়ুন, আবীর আহাদ রফিকুজ্জামান। (২০১০)। মহাকালের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। ঢাকা: জনতা প্রকাশ।
- হোসেন, আল হাজ্ব সৈয়দ আবুল। (১৯৯৬)। শেখ হাসিনা সংগ্রামী জননেত্রীর প্রতিকৃতি।
- সিংহ, রামকান্ত। (২০০২)। একই মেরুর দুই নক্ষত্র জিয়াউর রহমান ও খালেদা জিয়া। ঢাকা: নওরোজ সাহিত্য সংসদ।
- আহমেদ, সিরাজ উদদীন। (২০০০)। জন নেত্রী শেখ হাসিনা। ঢাকা: ভাস্কর প্রকাশনী।
- আকবর, মফিদা। (২০১৫)। বাংলাদেশের সফল রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনা। ঢাকা: বিশ্ব সাহিত্য ভবন।
- আকবর, মফিদা। (২০১১)। বাংলাদেশের রাজনীতি এবং শেখ হাসিনা। ঢাকা: বিশ্ব সাহিত্য ভবন।
- খান, ডা.মোঃ জামিল। (২০১৭)। ডা. জামিল'স ভাইভা সহায়িকা (মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা), ঢাকা: কথামেলা প্রকাশন।
- খান, ঈসরাইল। (১৯৮৭)। বাংলাদেশের রাজনীতি ও ভাষা পরিস্থিতি। ঢাকা: নিউ বুক সোসাই-টি।
- বাশার, রফিকুল সম্পাদিত। (২০১২)। ভাষা ভাবনা। ঢাকা: সাম্প্রতিক প্রকাশনী।

জামিল'স, ডাঃ । (২০১৭)। ভাইভা গাইড। ঢাকা: কথামেলা প্রকাশন।

- আলম, মোঃ ছামছুল। (২০০৩)। বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির একটি বিশ্লেষণ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিলকৃত পি, এইচ.ডি অভিসন্দর্ভ, এমফিল ও পি.এইচ.ডি সেকশান, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
- আলম, মুহাম্মদ খোরশেদ। (২০১৫)। বাংলাদেশের রাজনৈতিক গণতন্ত্র বিকাশ প্রক্রিয়ায় বিরোধী

দলের ভূমিকা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিলকৃত এম.ফিল.অভিসন্দর্ভ, এমফিল ও পি.এইচ.ডি সেকশান, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

◆ খাতুন, নাসিমা। (১৯৯৫)। বাংলাদেশের রাজনীতি (১৯৮২-১৯৯০)। এম.ফিল অভিসন্দর্ভ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

◆ সরকার, পপি। (১৯৯৮)। বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি। এম.ফিল অভিসন্দর্ভ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ঢাকা -১০০০।

◆ নাহার, নাজনীন। (২০০৯)। এরশাদ শাসনামলে বিরোধী দলের ভূমিকা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিলকৃত এম.ফিল.অভিসন্দর্ভ, এমফিল ও পি.এইচ.ডি সেকশান, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

◆ রহমান, মো: এখলাছুর, বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও সংসদীয় গণতন্ত্র একটি বিশ্লেষণ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিলকৃত এম.ফিল.অভিসন্দর্ভ, এমফিল ও পি.এইচ.ডি সেকশান, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

◆ দাউদ, মো: আবু, বি.এন.পির শাসনামলে (১৯৯১-৯৫) বিরোধী দল হিসাবে আওয়ামীলীগের ভূমিকার মূল্যায়ন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিলকৃত এম.ফিল.অভিসন্দর্ভ, এমফিল ও পি.এইচ.ডি সেকশান, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

◆ Bhuyan, M. Sayefullah, Political culture in Bangladesh, Dhaka university Journal.

◆ Journal of the Asiatic Society of Bangladesh(Hum.)vol.59(2), 2014, pp.305-321, G.M. Shahidul Alam, 'Political Commnication in Bangladesh: The Use of Vile Language'.

◆ রাজনৈতিক স্লোগান আর্কাইভ। Retrieved May 17, 2009 From আমার ব্লগ.কম;

◆ শ্লোগানের রাজনীতি- রাজনীতির শ্লোগান। Retrieved February 24 From Somewhereinblog.net

◆ ১৯৯৬ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবীতে আন্দোলনে আওয়ামীলীগের ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম, Retrieved March 18,2015 From Torun Projonmo. youtube

Bangladesh Protest Against PM Khaleda Zia. Retrieved July. 21,2015. From youtube

◆ একটি কবিতার শুদ্ধ পাঠ-prothomAlo, archive.prothom-alo.com/2011-09-29

* মোছাঃ রেখা ইয়াসমিন
স্নাতক ও স্নাতকোত্তর, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্বাবদ্যালয়
এম.ফিল গবেষক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ইসলাম ও জঙ্গিবাদ

আবু সালেম হোসাইন*

মুখ্য শব্দগুচ্ছ: ইসলাম, জঙ্গিবাদ, ফিতনা ও ফাসাদ, যুদ্ধ, সন্ত্রাস, ধর্মীয় শৃঙখলা

একটি সর্বজনীন ধর্ম ইসলাম। ইসলামের মূলবাণী শাশ্বত ও সনাতন। এ কারণেই ইসলামকে মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম বলা হয়ে থাকে। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) কর্তৃক প্রচারিত ধর্মকেও সচারচর ইসলাম বলে আখ্যায়িত করা হয় ও অন্যান্য জাতির ধর্ম থেকে পৃথক করা হয়।

হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পর্যন্ত বিভিন্ন দেশে স্রষ্টা প্রেরিত সকল নবী ও রাসূলের প্রচারিত সকল ধর্মই মূলত ইসলাম ধর্ম। বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন কালে, বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন সম্প্রদায় ও জাতির মধ্যে মানব জাতিকে ন্যায় ও কল্যাণের পথ প্রদর্শনের জন্য সষ্টা কর্তৃক যেসব মহাপুরুষ, নবী - রাসূল প্রেরিত হয়েছিলেন, তারা সবাই ইসলামের নবী ও শান্তির দূত বলে আখ্যায়িত হয়ে থাকেন।

"Islam, the religion of peace, had to wage war to protect and establish itself . This has led to the vilification of islam as a religion based on force and propagated by the sword" [১]

শান্তির ধর্ম ইসলামকে আত্মরক্ষা ও নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে হয়েছিল। এর ফলে জোরজবরদস্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠিত ও তলোয়ারের সাহায্যে প্রচারিত ধর্ম বলে ইসলামের কুৎসা রটনা করা হয়েছিল।

জঙ্গিবাদ: জঙ্গি ও জঙ্গিবাদ শব্দদ্বয় ইংরেজি 'militant' বা 'militancy' শব্দদ্বয়ের অনুবাদ। শব্দগুলো কিছুদিন আগেও এত পরিচিত ছিল না। আভিধানিক বা ব্যবহারিকভাবেও এগুলো নিন্দনীয় বা খারাপ অর্থে ব্যবহৃত হতো না। শাব্দিক বা রূপকভাবে যোদ্ধা, সৈনিক বা যুদ্ধসম্পর্কীয় শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হত। 'Militant' শব্দটি এসেছে ১৫ শতাব্দীতে ল্যাটিন ভাষার 'Militare' শব্দ থেকে। অর্থ 'to serve as a soldier'।

"Militia is an organised group of people comparable to a military force"[২]

'Militant' বা জঙ্গি হল, যে ব্যক্তি তার উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য শক্তি বা জোরালো প্রভাব ব্যবহার করা সমর্থন করে। 'Merriam- Webster's collegiate Dictionary' তে এর দুটি বলা হয়েছে-

১. engaged in warefare or combat

২. aggressively active (as in a cause)

"The term 'militia' derives from latin miles or milit meaning 'soldier'. Adding suffix- 'ia' the world militia literally means military service"[৩]

ইসলামের পূর্বে সুসভ্য মানবজাতির এক বৃহৎ অংশে প্রচলিত বৌদ্ধধর্ম ও খৃস্টধর্ম অন্তত মতবাদের দিক থেকে যুদ্ধ বা যে কোনো উদ্দেশ্যে বা কারণে হত্যা করার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। শুধু মানুষের জীবন নষ্ট করা থেকে বিরত করাই যথেষ্ট নয়। এমনকি পোকা-মাকড়, জীবাণু ও বিষাক্ত প্রাণী পর্যন্ত হত্যা করাও পাপ বলে মনে করা হতো। সমস্ত নৈতিক ও ধার্মিকতার পরম উদ্দেশ্য হল শান্তি। কিন্তু বৌদ্ধ, জৈন ও খৃষ্ট ধর্মের মতো গুরুত্বপূর্ণ কতগুলো ধর্ম এই উদ্দেশ্যকে কিছুটা বাস্তবতাবিবর্জিতভাবে উপস্থাপন করেছে। বৌদ্ধ ধর্মের অহিংস বা প্রাণ হত্যা না করার মতবাদ ছিল অবাস্তব। সমস্ত জীবনই অন্য জীবনের ভক্ষক; উচ্চতরের পক্ষে নিম্নতরের ভক্ষণ করা ছাড়া অন্য উপায় নেই।

ইসলাম যুদ্ধ সম্পর্কে একটা যৌক্তিক মতবাদ প্রচার ও অনুশীলন করে। পরবর্তীকালে মুসলমান শাসকদের পরিচালিত অধিকাংশ যুদ্ধই ছিল অনৈসলামিক যুদ্ধ। কেবল ওই যুদ্ধগুলোই ছিল ইসলামি যেগুলো ইসলামকে নিরাপদ করতে ও ধর্মীয় নিপীড়নকে ঠাণ্ডা করতে রাসুলুল্লাহ ও তার সাহাবারা ঘোষণা করেছিলেন। মানবজীবনের মর্যাদা ইসলামের একটি মৌলিক বিষয় এবং কেবল মানবজীবন ও তার পরম মূল্যগুলোর ন্যায়সংগত রক্ষার জন্যই যুদ্ধের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। মানবজীবনের মর্যাদার বিষয় প্রচার করতে গিয়ে, মানবজীবনের সামাজিক সহিংসতাকেও টেনে আনা হয়েছে।

এখানে কোরানের একটি বাণী প্রণিধানযোগ্য 'অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করো না এবং ব্যাভিচার করো না। যারাই তা করবে তারাই শাস্তি ভোগ করবে' (৩৫:৩৮)

প্রাক ইসলামী যুগে আরবরা তাদের নবজাতক কন্যা সন্তানকে জনবহুল ও সামাজিক বোঝা মনে করত। ইসলাম সর্বশক্তি দিয়ে এ প্রথার অবসান ঘটিয়েছে এবং সমস্ত মুসলিম জগৎ থেকে এর মূলোৎপাটন করেছিল। এ লজ্জাকর অপরাধ সভ্য জগতে আর কখনো মাথা তোলেনি। কোনো অযৌক্তিক কারণের বশবর্তী হয়ে যদি দুজন লোক পরস্পর দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় এক্ষেত্রে নবী (স.) বলেন যে, হত্যাকারী ও নিহত উভয়েই দোযখে যাবে।

"It will be noted that wherever islam prohibits killing. It always qualifies it as killing without justice"[৪]

কোরআনে 'ফিতনা' শব্দটি 'ফাসাদ' শব্দের সঙ্গে একযোগে ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ হল, দুর্নীতি ও বিভেদ সৃষ্টি- যাতে সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও স্বেচ্ছাচারিতা বোঝায়। ইসলামে হত্যা অনুমোদন করা হয়েছে শুধু 'ফিতনা' ও 'ফাসাদ' দূর করতে। সামাজিক শৃঙ্খলা পুনঃস্থাপন করতে, উৎপীড়নের মূলোৎপাটন করতে এবং সন্ত্রাসের রাজত্বের পরিবর্তে আইনের রাজত্ব পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে। ইসলামের উত্থান, তার আত্মসংরক্ষণ এবং সাধারণ মানবীয় স্বাধীনতা ও শালীনতা সংরক্ষণের ইতিহাসে একটা বিশেষ মতবাদ প্রচারের জন্য জোরজবরদস্তির প্রয়োগ বলে অপব্যাখ্যা

দেয়া হয়েছে। শুরুতে ইসলাম ওই সমস্ত আরব গোত্র ও ইহুদি, যারা স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেনি, তাদের সঙ্গে শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেছিল এবং কুরআনে চুক্তি ও সন্ধি পালন করার ওপর খুব বেশি জোর দেওয়া হয়। মানবজাতির ধর্মীয় পথ প্রদর্শক হিসেবে যিশু ও বুদ্ধের উদাহরণ তাদের কতক অনুসারী ও অন্যান্য কিছু সংখ্যক লোককে ধার্মিকতার সঙ্গে সমস্ত যুদ্ধেরই নিষিদ্ধকরণকে এক করে দেখাতে শিখিয়েছেন। সমস্ত মুসলিম আইনবেত্তাই একমত যে, শুধু কোনো অর্থনৈতিক স্বার্থ কিংবা রাজ্য বিস্তারের জন্য যুদ্ধ করা অবৈধ। অন্যদের জোর করে ইসলামে দীক্ষিত করার জন্যও যুদ্ধ বৈধ নয়। বস্তুত জঙ্গিবাদ বলতে যে প্রপঞ্চটি আমাদের মননে মগজে বাসা বেঁধেছে, তা প্রকাশের যথাযথ শব্দ হল 'সন্ত্রাস'।

"This 'core of meaning ' includes the notion that terrorist acts are acts of coercion or of force, aiming at monetary gain (predatory terrorism), a political end (political terrorism), or a moral end (moralistic terrorism). It also includes the notion that all terrorism involves a crucial distinction between immediate victims ' and sufferers"[৫]

সন্ত্রাসের সঙ্গে যুদ্ধের মৌলিক পার্থক্য হল, সাধারণ যুদ্ধ ও গেরিলা যুদ্ধ উভয় ক্ষেত্রেই যোদ্ধারা মূলত যুদ্ধবিষয় লক্ষ্যে আঘাত করতে সচেষ্ট হয় এবং সামরিক বিজয় লক্ষ্য থাকে। সামরিক ক্ষেত্রে তা সন্ত্রাসীরা গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে মূল উদ্দেশ্যেই হল, সামরিক-অসামরিক নির্বিচারে সকল লক্ষ্যবস্তুকে আঘাত করে ভীতি সঞ্চারের মাধ্যমে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করা।

"Terrorism ; the systematic use of violence to create a general climate of fear in a population and thereby to bring about a particular political objective "[৬]

ইসলামের ইতিহাসে বিভিন্ন যুদ্ধ রয়েছে। যেমন- মুসলিম রাষ্ট্রের সঙ্গে অমুসলিম রাষ্ট্রের, মুসলিম রাষ্ট্রের সঙ্গে মুসলিম রাষ্ট্রের, মুসলিম রাষ্ট্রের সঙ্গে বিদ্রোহীদের যুদ্ধ ইত্যাদি। কিন্তু ইসলামের ইতিহাসে মুসলিম সমাজে মুসলমানদের মধ্যে অথবা অমুসলিমদের মধ্যে সন্ত্রাস বা জঙ্গিবাদের মাধ্যমে ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠা বা অন্য কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের উদাহরণ খুবই কম। সন্ত্রাসবাদ বা জঙ্গিবাদের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রিগান বলেন-

"Terrorism as the deliberate maiming or killing of innocent people, and of terrorists as 'base criminals' reflects and at the same time shapes his administrations avowed condemnation of terrorism and the diplomatic and military steps it has so far taken to fight terrorism"[৭]

সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে যুদ্ধের বিষয় জড়িত। যুদ্ধের মাধ্যমেই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। যেহেতু সাধারণ মানুষ যুদ্ধের কোনো কলাকৌশল জানে না ফলে তারাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এতে মানুষের মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়।

অন্যদিকে মানবজাতির জন্য শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তার কথা কোরআনের বহু জায়গায় স্বীকার করা হয়েছে। যদি ধর্মকে জীবনের সঙ্গে যুক্ত থাকতেই হয় এবং মানবীয় মূল্যমানগুলোকে তার পোষণ ও সংরক্ষণ করতেই হয়, তাহলে এ পরিস্থিতিতে ইসলাম কী পথের সন্ধান দিতে পারে, তা আমাদের দেখতে হবে। ইসলাম যুদ্ধের অনুমতি দেয় এবং সামাজিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে ও সমস্ত অন্যায় অবিচারের মূল বিনষ্ট করতে যুদ্ধকে একটা কর্তব্য বলে নির্দেশ করে। ইসলাম মানবতার শত্রুদের বিরুদ্ধে শক্তি পরীক্ষার জন্য তার অনুসারীদের প্রস্তুত থাকতে আদেশ দেয়। কিন্তু বিভিন্ন জাতির মধ্যে শান্তি রক্ষার জন্য সব ধরনের প্রচেষ্টা চালাতে হবে। যতদিন পর্যন্ত মানুষ একে অন্যের প্রতি হামলা করার জন্য পরস্পর যুদ্ধংদেহী দলে বিভক্ত থাকবে, ততদিন যুদ্ধ অনিবার্য ও সব সময় আক্রমণের সম্ভাবনা থাকবে।

"The greatest service that islam rendered to Humanity was the exaltation and purification of the concept of God"[৮]

ইসলামের মতে, প্রত্যেক জাতিরই যুদ্ধ ও শান্তির নীতি হিসেবে এটি গ্রহণ করা উচিত যে, যখনই কোনো অসহায় ও দুর্বল উৎপীড়িত হয়, তখনই সৎ ও ধর্মভীরুরা অত্যাচারীকে ধ্বংস করার জন্য রুখে দাঁড়াবে। ইসলামে প্রভুর পথে যুদ্ধ করার অর্থ সামাজিক ন্যায়বিচারের জন্য যুদ্ধ করা; এর অর্থ কোনো বিশেষ ধর্মপ্রচারের জন্য যুদ্ধ নয়।

আল্লাহ হলেন মানবীয় আচরণের আদর্শ। তিনি সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রতিভূ। সামাজিক ন্যায়বিচারের জন্য যুদ্ধই কেবল ইসলামে স্বীকৃত হয়েছে। জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে ইসলামি জাতীয় শক্তিমত্তার বৃদ্ধির জন্য যুদ্ধ করা চলতে পারে না।

তথ্যপঞ্জিঃ

১. khalifa Abdul Hakim, 'Islamic Ideology' (The fundamental beliefs and principles of islam and their application to practical life),(Institute of Islamic Culture, Club Road, Lahore,First Edition-1951)p.176

২. 'Oxford English Dictionary', (london: Oxford University Press-2009).

৩. Chalelaton T. Lewis, 'An Elementary Latin Dictionary', (London; Oxford University Press, 1997)

৪. 'Islamic Ideology', by Khalifa Abdul Hakim, p.180

৫. Brenda Almomd & Donald Hill, 'Applied philosophy, Morals and Meta-physics in Contemporary Debate' (London, Newyork, Routledge,1st published in-1991), p.115

৬. encyclopediabritannica.com

৭. B. Almond & D.Hill, 'Applied Philosophy', p.113

৮. Saiyed Abdul Hai, 'Muslim philosophy' (volume 1,Islamic Foundation Bangladesh, Purana paltan, Dhaka, 2nd edition, 1982) p.8

আবু সালেম হোসাইন
প্রভাষক, দর্শন বিভাগ, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

ধর্ম ও নৈতিকতার সন্দর্শন ও বিচারমূলক খণ্ডায়ন

সুমাইয়া বিনতে আলী শৈলী*

মুখ্য শব্দগুচ্ছ: ধর্ম, নৈতিকতা, আদর্শ, নৈতিকদ্বন্দ্ব, মানবতা

মানবসভ্যতার আদিলগ্ন থেকে যুগ যুগ ধরে নানা বিবর্তন ও ক্রমধারার মধ্য দিয়ে ধর্ম ও নৈতিকতা মানবসমাজকে দান করেছে একটি নিয়ন্ত্রিত ও আর্দশিক রূপধারার নান্দনিক পরিমার্জন। যার কল্যাণে মানুষ আজ একটি সভ্য, শৃঙ্খলিত, সুসামঞ্জস্য জীবনধারা অতিবাহিত করছে। ধর্ম ও নৈতিকতা পারস্পারিকভাবে সম্পর্কিত নাকি বিবর্জিত- তারই স্বরূপ, নিরীক্ষা, বিচার-বিশ্লেষণ ও খণ্ডায়নই হল বর্তমান আলোচনার মূল প্রেক্ষাপট ও বিষয়বস্তু।

মহাভারতকে অনুসরণ করলে ধর্ম শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ দাঁড়ায়, যা কিছু ধারণশক্তিযুক্ত তা-ই হল ধর্ম। ধর্মের ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Religion'-কে বিশ্লেষণ করলে দাঁড়ায়, re+legere=Religion ; যেখানে Re=পুনরায় এবং Legere= একত্রীকরণ বা বাঁধা বা 'to bind together' ; অর্থাৎ এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল 'binding together a new'। যার সাধারণ সম্মতিগ্রাহ্য অর্থ মূলত- জীবনে চলার পথ (way of life)। প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান- ধর্মের উৎপত্তি,স্বরূপ, বিবর্তনধারা বা ক্রমবিকাশ সম্পর্কে চিন্তাবিদগণের মাঝে মতপার্থক্য লক্ষণীয়।

তবুও বলতে হয়, পৃথিবী নামের এই গ্রহটি মানুষের পদচারণায় যখন মুখরিত হলো তখন মানুষ একক এবং সামষ্টিকভাবে ভাবতে শুরু করলো তার চতুর্দিকের অন্য সকল বস্তু ও প্রাণ সৃষ্টির নেপথ্য শক্তি সম্পর্কে। বিশ্ব ও মহাবিশ্বের তাবৎ সৃষ্টির যিনি স্রষ্টা ও প্রতিপালক তাঁর সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক স্থাপনের বিধিবিধান থেকেই ধর্মের আনুষ্ঠানিক প্রকাশ।[১]

যুগে যুগে দার্শনিক ও চিন্তাবিদগণ ধর্মকে নানান দৃষ্টিকোণ থেকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। কান্ট ধর্মকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন: *"ঐশ্বরিক নির্দেশ হিসেবে সকল কর্তব্য সম্পাদন করাই হলো ধর্ম"*। শ্লায়ারমেকার (Schleiermacher) বলেন: *"প্রতিটি স্বতন্ত্র বিষয়কে সমগ্রের অংশ হিসেবে গ্রহণ করা, প্রতিটি বিষয়কে অসীমের প্রতিনিধি হিসেবে গ্রহণ করাই হচ্ছে ধর্ম"*।[২]

বিশ্বাসই হল ধর্মের মূল ভিত্তি। ঈশ্বরাজ্ঞা ও প্রত্যাদিষ্টদের মাধ্যমে প্রেরিত বাণীর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমে ধর্ম মানুষের অন্তরে আধ্যাত্মিক চেতনার উপলব্ধিকে জাগ্রত করে। এই উপলব্ধি ও মূল্যবোধ জাগ্রত হওয়ার মাধ্যমে মানুষের মন ও আত্মা লাভ করে পরিশুদ্ধি, বিশুদ্ধতা ও পবিত্রতা। পরমসত্তার প্রতি বিশ্বাস ও আনুগত্যকে কেন্দ্র করে মানুষের পার্থিবসত্তার সীমাবদ্ধ ধারণাকে অতিক্রম করে অতিন্দ্রীয় সত্তা ও জগতের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে একজন ধার্মিক ব্যক্তি তার জীবনকে উত্তমপন্থায় পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। ধর্মীয় মূল্যবোধ ও আর্দশ মানুষের দৈনন্দিন

জীবনে চলার পথে মূল দণ্ডায়মান আদর্শরূপে পরিগণিত। তাত্ত্বিক মূল্যের ন্যায় ধর্মের ব্যবহারিক মূল্যও তাই সমভাবে বিবেচিত।

সুতরাং, চূড়ান্তভাবে বলা যায় যে, ধর্মের তিনটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে: (ক) ধর্ম আদর্শনিষ্ঠ (normative), এবং কোনো কিছুকে পরমমূল্যের বিষয় হিসেবে উপস্থাপন করে; (খ) ধর্ম আবেগমূলক, কারণ এই পরমমূল্যের প্রতি বিশ্বাস এবং এই পরমমূল্যকে উপলব্ধি করার পদ্ধতিগুলো আবেগাত্মক উদ্দীপনার সঙ্গে যুক্ত; এবং (গ) ধর্ম আদেশসূচক (injunctive), কারণ ধর্ম তার অনুসারীদের সুনির্দিষ্ট কিছু কাজ করতে বিশেষ এক ধরনের জীবনযাপন করতে 'নির্দেশ' দেয়।[৩]

এদিকে, নৈতিকতা হল একটি আদর্শিক মানদণ্ড, যার আলোকে মানুষের ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ, উচিত-অনুচিত প্রভৃতি বিষয়ের মাঝে সুস্পষ্ট পার্থক্যকরণ ও মূল্যবোধের শিক্ষাকে আলোকপাত করা হয়। নৈতিকতার ইংরেজি প্রতিশব্দ 'মোর‍্যালিটি' মূলত ল্যাটিন শব্দ 'মোরালিটাস' থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ চরিত্র, ভদ্রতা বা সঠিক আচরণ।

নৈতিকতাকে জীবনের নৈতিক বিধি (moral institution of life) বলে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। নৈতিকতা নৈতিক শক্তি (agency) বা ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্যকরণের কর্মক্ষমতার অর্থও প্রকাশ করে থাকে। আবার, নৈতিকতা নীতি বা সূত্র এবং চরিত্রের সংলক্ষণকেও (traits of character) জড়িত করে।[৪]

নৈতিকতা হল একটি সামগ্রিক মানদণ্ড, যেখানে যুক্তি ও বুদ্ধির দ্বারা মানুষের চরিত্র, আচার-আচরণ ও জীবনাদর্শকে মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে। নৈতিক চেতনা-অবধারণ-ভাবাবেগ, নৈতিক প্রগতি ও আর্দশ, নৈতিক ক্রিয়ার মানদণ্ড ও মনস্তত্ত্ব প্রভৃতি হল নৈতিকতার আলোচ্য অংশের সঙ্গে জড়িত বিষয়বস্তুসমূহ। নৈতিকতা তার নৈতিক সূত্রগুলোর আলোকে আমাদের প্রাত্যহিক কিংবা সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক জীবনবোধকে মূল্যায়ন করে থাকে।

ধর্মের মাধ্যমেও যেহেতু ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ, শুভ-অশুভ, কল্যাণ-অকল্যাণ, নীতি-নৈতিকতার কার্যকরী সূত্রগুলোকে মানবজীবনে প্রয়োগ ও চর্চার শিক্ষাকে অনুপ্রাণিত করা হয়, সেক্ষেত্রে অনেকেরই ধারণা হয়ে থাকে, নৈতিকতার উদ্ভব ও বিকাশ ধর্ম থেকেই। সেই সঙ্গে ধর্ম ও নৈতিকতা একই সূত্রে গাঁথা একটি সাদৃশ্যপূর্ণ প্রত্যয়। তবে এই ধারণাটি মোটেও সর্বজনগ্রাহ্য, সঠিক কোনো ধারণা হিসেবে স্বীকৃত নয়। সেই সঙ্গে মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, ধর্মের আগে নৈতিকতা নাকি নৈতিকতার আবহধারায় ধর্মের আবির্ভাব! একই সঙ্গে এদের পারস্পারিক প্রয়োজনবোধ কতটুকু বিস্তৃত বা সীমাবদ্ধ, উপরন্তু ধর্ম ছাড়া নৈতিকতা কিংবা নৈতিকতাবিহীন ধর্মের অস্তিত্ব টিকে থাকা আদৌ সম্ভব কিনা?

এসকল প্রশ্নের উত্তরে প্রথমেই বলতে হয়, মানবসভ্যতার বিবর্তন ধারায় যুগে যুগে মানবসমাজের ভিত্তি-কাঠামোকে সুনিয়ন্ত্রিত, শৃঙ্খলিত ও সুষমমণ্ডিত করার ক্ষেত্রে ধর্ম ও নৈতিকতার সম অবদানের বিষয়টি অনস্বীকার্য। ধর্মীয় চেতনা ও মূল্যবোধসম্পন্ন একজন মানুষ যেমন ঈশ্বরাজ্ঞাধীন সুনির্দিষ্ট বিধান দ্বারা জীবনকে নৈপূর্ণ্যময় করে তুলতে

সক্ষম, তেমনি একজন নৈতিকবোধসম্পন্ন মানুষও নীতি-নৈতিকতার মূল্যবোধ ও ক্রিয়াকলাপ দ্বারা জীবনকে শৃঙ্খলিত ও পরিপূর্ণ করে তুলতে সমর্থ। ধর্ম ও নৈতিকতার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে কিছুটা সাদৃশ্য বিদ্যমান থাকলেও, উভয়ের বহমান ধারার মাঝে বিস্তর পার্থক্য ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়।

- ধর্মের মৌলিক ধারণা ও বিধানসমূহ আবর্তিত হয় ঈশ্বরকে কেন্দ্র করে, পক্ষান্তরে নৈতিকতার ক্ষেত্রে কাজ করে বুদ্ধিমত্তা ও যৌক্তিকতা, যা আবর্তিত হয় মানুষকে কেন্দ্র করে।
- ধর্মকে অভিহিত করা যায় একটি অধিবিদ্যক বিষয় হিসেবে, কিন্তু নৈতিকতা তা নয়। নৈতিকতা হলো একটি মূল্য সম্পর্কীয় বিদ্যা।
- নৈতিকতা হলো মানুষের আচরণের বিশ্লেষণমূলক একটি ধারণা। সেদিক থেকে ধর্মের প্রেক্ষাপট ও বিষয়বস্তু আরো ব্যাপক ও বিস্তৃত। ধর্ম হলো মানুষের একটি সামগ্রিক জীবনবিধান।

এতটুকু থেকে বলা যায়, নৈতিকতা কোনোভাবেই ধর্ম থেকে উদ্ভূত নয়। উভয়ের প্রেক্ষাপট ও পরিধির মাঝে পার্থক্য সুস্পষ্ট। নৈতিকতার কিছু সূত্র ধর্মের একটি উল্লেখ্যযোগ্য অংশ হিসেবে বিবেচ্য হতে পারে; তাই বলে নৈতিকতা ধর্মের অবগাহনে নিমজ্জিত কোনো প্রত্যয় নয়। তার স্বকীয়তা ও উদ্ভব ধর্ম থেকে ভিন্ন। বুদ্ধিমত্তা ও যুক্তির নিরিখে নৈতিকসূত্রগুলো পরীক্ষিত ও প্রয়োগযোগ্য। তবে কি নৈতিকতা থেকে ধর্মের উদ্ভব? ধর্মের উৎপত্তি সংক্রান্ত ঐশ্বরিক, প্রাকৃতিক, অভিজ্ঞতামূলক কিংবা বিশ্বতাত্ত্বিক নানা ধরনের মতের প্রচলন এ পর্যন্ত দেখা যায়। সেক্ষেত্রে বলা যায়, ধর্মীয় বিশ্বাস সৃষ্টির ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে কাজ করে নৈতিক ভিত্তি। ধর্মীয় বিশ্বাসের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করেন ঈশ্বর; ঈশ্বরে বিশ্বাসের মূলে মানুষের মনে কাজ করে অন্তর্নিহিত নৈতিকতাবোধ; সেখান থেকে নৈতিক দ্বন্দ্বের ফলস্বরূপই ধর্মীয় বিশ্বাসের উৎপত্তি।

রবার্ট এইচ. থাউলেস-এর An Introduction to the Psychology of Religion গ্রন্থে বিষয়টি আরো বিস্তারিতভাবে উঠে এসেছে। নৈতিক অনুভূতি ও চেতনাবোধ শিখিয়ে-পড়িয়ে দেওয়া কোনো অর্জিত মূল্যবোধ নয়। নৈতিক চেতনাবোধ হলো, মানুষের অন্তর্নিহিত সহজাত একটি অনুভূতি, যা কোনো কাজের পূর্বে মানুষের মনকে আলোড়িত করে কাজটি ভালো নাকি মন্দ, তার মাপকাঠি বিচারের জন্য। একে বলা হয় এক ধরনের নৈতিকদ্বন্দ্ব। এই সক্রিয় নৈতিকদ্বন্দ্বই মানুষকে ঈশ্বর ও ধর্মে বিশ্বাসী করে তোলে। তাহলে কি নৈতিকতা ছাড়া ধর্ম অস্তিত্বহীন? এদের পারস্পরিক প্রয়োজনবোধের বিষয়টি তাহলে এবার উল্লেখ করা যাক।

নৈতিকতা ছাড়া যে ধর্মীয় বিশ্বাস গঠন একেবারেই অসম্ভব, তা কিন্তু বলা যায় না। ধরা যাক, নৈতিকতাবোধ ছাড়াও একজন ব্যক্তি হয়তো যেকোনো ধর্মে বিশ্বাস স্থাপন করল, তবে সেক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তিটির পক্ষে শুভ-অশুভ, ন্যায়-অন্যায়ের মাঝে পার্থক্যকরণের বিষয়টি উপলব্ধি করা অসম্ভব হবে। তখন সে ধার্মিক হয়েও নানা অনৈতিক কাজে জড়িয়ে যেতে পারে। তাই ধর্ম ছাড়া নৈতিকতার স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকলেও, নৈতিক শিক্ষাবিহীন ধর্মের অস্তিত্ব অনেকাংশে বিলুপ্ত। একজন নৈতিকতাসম্পন্ন

ব্যক্তিকে ধার্মিক হতেই হবে, এমন কোনো আবশ্যকতা না থাকলেও, 'একজন ধার্মিক ব্যক্তি নীতিহীন' তা হয়তো কোনো ধর্মের পক্ষে কাম্য নয়। সকল ধর্মের জন্যই নৈতিক শিক্ষা বাঞ্ছনীয় ও অপরিহার্য। পৃথিবীর সকল ধর্ম প্রচারকগণ যুগে যুগে মানবতা, উত্তমপন্থা ও নৈতিক শিক্ষাকেই ধর্মের মূল বার্তারূপে প্রচার করে গেছেন। সেক্ষেত্রে বলা যায়, ধর্মের অস্তিত্ব- টিকে থাকা কিংবা প্রয়োজনবোধের তাগিদে নৈতিকবিধি কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

তবে নৈতিকতায় ধর্মের গুরুত্ব কি একেবারেই নগণ্য- এই বিষয়টি এখন বিবেচনা করা যাক। এটা সত্য যে, নৈতিক আদর্শ, মূল্যবোধ, চেতনা কিংবা ভাবাবেগের ক্ষেত্রে ধর্ম বিশেষ একটা ভূমিকা পালন করে না। তবে সাধারণভাবে বলা যায়, পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ নীতিতত্ত্বের তুলনায় ধর্মীয় আর্দশ সম্পর্কে অধিকহারে অবগত। ফলে এটাও বলা যায় যে, ধর্ম হল মানুষের নৈতিক শিক্ষা ও আদর্শ চর্চার একটি অন্যতম বলিষ্ঠ মাধ্যম। ধর্ম ও নৈতিকতা প্রত্যয় দুটি পৃথক নাকি সম্পৃক্ত, সে আলোচনার তুলনায় আমরা মনে করি উভয়ের অভিন্ন তাৎপর্যপূর্ণ অস্তিত্ব মানবসভ্যতার স্বার্থে অধিকতর মূল্যায়নযোগ্য। নৈতিকতাহীন সমাজে কেবল ধর্মের অস্তিত্ব মোটেও কাম্য নয়। নৈতিকতার অনুপস্থিতিই যুগে যুগে সকল প্রকার সাম্প্রদায়িক যুদ্ধের একটি অন্যতম কারণরূপে বিবেচিত। ধর্মে নৈতিক আদর্শের অনুপস্থিতি ধর্মকে নানারকম অন্যায়, কুসংস্কার, অন্ধকার জগতের পথে ঠেলে দিতে সক্ষম। এদিকে ধর্ম যুগে যুগে তার শিক্ষা, আদর্শ, মূল্যবোধ দ্বারা নৈতিকতার সূত্রগুলোকে মানবসমাজে আরো বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, তাৎপর্যমণ্ডিত ও ক্রিয়াশীল করে তোলে।

মানবতাকে জিইয়ে রাখার অন্যতম মাপকাঠি হল ধর্ম ও নৈতিকতা, যারা একত্রে একটি কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম। ধর্ম ও নৈতিকতা উভয়ই মানবকল্যাণের তাগিদেই নিয়োজিত। মানবতাকে সত্য, মঙ্গল ও সুন্দরের পথে পরিচালিত করতে নৈতিকতা ও ধর্ম-উভয়কেই সমান ভূমিকা পালন করতে হবে। শান্তিপূর্ণ, সুশৃঙ্খল, মানবিক ও অসাম্প্রদায়িক চেতনার দ্বারা সমাজ, রাষ্ট্র ও একটি জাতিকে একত্ব ও ভ্রাতৃত্ববোধের বন্ধনে আবদ্ধ রাখতে একই সঙ্গে নিজ নিজ ধর্মের যৌক্তিক অনুশীলন এবং সামগ্রিকভাবে একটি সামষ্টিক রীতি-নীতি ও নৈতিকতার চর্চা অপরিহার্য ও বাঞ্ছনীয় ।

তথ্যসূত্র:

১. ড. মোঃ শাজাহান কবির, বিশ্বের ধর্ম পরিচিতি (ঢাকা: দিক দিগন্ত প্রকাশনী, মে ২০১৪), ৪র্থ প্রকাশকাল, পৃ.১৫

২. ড. আবদুল মতীন ও ড. প্রদীপ রায় (অনু.), দর্শনের রূপরেখা (ঢাকা: অবসর প্রকাশনা সংস্থা, জানুয়ারি ২০১৭), পৃ.২৮৪

৩. প্রাগুক্ত, পৃ.২৮৫

৪. মুহম্মদ আবদুল বারী, নীতিবিদ্যা (ঢাকা: হাসান বুক হাউস, আগস্ট ২০০৯), ৪র্থ সংস্করণ পুণর্মুদ্রণ,পৃ. ৪-৫

* সুমাইয়া বিনতে আলী শৈলী, শিক্ষার্থী, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সদস্য, আর্ট এন্ড কালচার টিম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা সংসদ

অস্তিত্ববাদের প্রাথমিক পাঠ

তৌকির হোসেন*

মুখ্য শব্দগুচ্ছ: অস্তিত্ববাদ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, নৈরাজ্যবাদ, সার্ত্র, অস্তিত্ব।

গত শতাব্দীর ইয়োরোপের দার্শনিক চিন্তাধারার একটি বড় জায়গা দখল করে রেখেছে অস্তিত্ববাদী দর্শন। যদিও এর ভিত গড়ে উঠতে শুরু করেছিল সেই সোরেন কিয়ের্কেগার্দের (১৮১৩- ১৮৫৫) সময় থেকে। পরবর্তীতে ফ্রিদরিখ নীৎশে, মার্টিন হাইডেগারসহ অন্যান্য ইয়োরোপীয় দার্শনিকগণ এর একটি তত্ত্বগত দিক তৈরি করে দেন। 'অস্তিত্ববাদ' নাম দিয়ে এই তত্ত্বগত জ্ঞানকাণ্ডের দার্শনিক ভিত্তি সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠা করেন ফরাসি দার্শনিক জ্যঁ পল সার্ত্র (১৯০৫- ১৯৮০) তাঁর দুটি বিখ্যাত রচনা 'বিয়িং এ্যান্ড নাথিংনেস' (১৯৪৩) ও 'এক্সিস্টেনশিয়ালিজম ইজ হিউম্যানিজম' (১৯৪৬) এর মাধ্যমে। শেষের ছোট গ্রন্থটি মূলত অস্তিত্ববাদের বিরুদ্ধে আরোপিত কিছু সমালোচনার বিশ্লেষণ এবং যুক্তিখণ্ডনের সংকলন। আত্মপক্ষ সমর্থনের মাধ্যমে এখানে সার্ত্র কিছু ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন এবং ব্যাখাগুলোর দ্বারা চমৎকারভাবে তিনি এই দর্শনের একটি সহজবোধ্য রূপরেখা দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। এই প্রবন্ধে অস্তিত্ববাদী দর্শনের বিশদ ইতিহাস আলোচনা করা হবে না। বরং এর ভাববাদী ও ব্যক্তিবাদী বৈশিষ্ট্য কীভাবে ব্যক্তিকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করে এবং ব্যক্তির স্বাধীনতার বিস্তৃতি ঘটায় তা আলোচনা করা হবে। পরিশেষে বর্তমান শতাব্দীতে এই দর্শনের কোনো গুরুত্ব অবশিষ্ট আছে কিনা তা যাচাই করে দেখা হবে।

অস্তিত্ববাদ নিয়ে এগোনোর আগে আমাদের আগে জানতে হবে 'অস্তিত্ববাদ' কী? এর মূলে কোন কোন প্রশ্ন রয়েছে। যেকোনো দর্শনের শেকড়ে থাকে কিছু প্রশ্ন যা জগৎ ও ব্যক্তিকে ঘিরে তৈরি হয়, যার অনুসন্ধান নতুন চিন্তাধারার জন্ম দেয়, নতুন পথের আলো দেখায়। সত্তার যথার্থ প্রকৃতির প্রশ্ন নিয়ে যেমন অধিবিদ্যা (Metaphysics), নৈতিকতার প্রশ্ন নিয়ে যেমন মূল্যতত্ত্ব বা নীতিশাস্ত্র (Ethics), জ্ঞান সংক্রান্ত প্রশ্ন নিয়ে জ্ঞানতত্ত্ব (Epistemology) তেমনি এই অস্তিত্ববাদের শেকড়ে একটি মূল প্রশ্ন রয়েছে। তা হচ্ছে মানুষ ও ব্যক্তির অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন। অস্তিত্ববাদ আলোচনা করে ব্যক্তির অস্তিত্ব নির্ণয়ে ব্যক্তির স্বাধীনতা এবং ভূমিকা। সার্ত্র তাঁর 'অস্তিত্ববাদ' গ্রন্থে এই দর্শনের প্রথম সূত্র উল্লেখ করেছেন, "মানুষ হচ্ছে তাই, যা সে (ব্যক্তি) নিজেকে বানায়"। অর্থাৎ, ব্যক্তির হাতেই মূল অস্ত্র রয়েছে নিজেকে তৈরি করবার, নিজেকে সংজ্ঞায়িত করবার। 'মানুষ'-এর সংজ্ঞা আগে থেকে নির্দিষ্ট নয়। একদিকে নীৎশে যেমন 'ঈশ্বর মৃত' বলে ঘোষণা করেছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীতে, তেমনি বিংশ শতাব্দীতে এসে সার্ত্র-পরবর্তী প্রজন্মের দার্শনিক মিশেল ফুকো এক অর্থে ধারণা দেন, 'মানুষ মৃত'। এখানে 'মৃত' অর্থ বলতে ফুকো বুঝিয়েছেন 'মানুষ'-এর যে সংজ্ঞা

দাঁড় করানো হয়েছে তার বয়স তিনশ বছরের বেশি নয়। প্রতিষ্ঠান তৈরি করে দেয় মানুষের সংজ্ঞা, পাগলাগারদ যে উপায়ে স্বাভাবিক/অস্বাভাবিক 'মানুষ'-এর নামকরণ করে, তেমনি রাষ্ট্রও সাধারণ/দণ্ডাদেশপ্রাপ্ত 'নাগরিক'-এর নামকরণ বা সংজ্ঞায়ন করে। ফলে ব্যক্তিসত্তা হারাতে হারাতে ক্রমেই মানুষ ধাবিত হতে থাকে নামপ্রাপ্ত সত্তার দিকে। একটা পর্যায়ে নিজ স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলে মানুষ পরিণত হয় 'অনুকরণকারী বস্তুতে যা ক্রমশ নিজের নামধারী সত্তাকে প্রমাণ করতে চায়, নিজের স্বকীয় অস্তিত্ব বাদ দিয়ে। সার্ত্র এই জায়গাটিকে বলেছেন 'আত্মপ্রতারণা' (Bad Faith এর সমার্থক বাঙলা শব্দ এটিই হতে পারে)। কেননা, অন্যের আরোপিত বিশ্বাস দ্বারা মানুষ নিজেকে যদি চরিতার্থ করতে যায় বা নিজেকে ওভাবেই অন্যের ছবির মাধ্যমে দেখতে থাকে তাহলে তা হবে তার ব্যক্তিসত্ত্বার সাথে আত্মপ্রতারণা। সার্ত্র জোর দেন, মানুষ স্বাধীন হতে বাধ্য তার জন্ম থেকেই। তার মনুষ্যসত্তা, অস্তিত্বের পূর্বগামী নয়। বরং ব্যক্তির অস্তিত্বই মনুষ্যসত্তা তৈরি করে। অর্থাৎ, যদি কোনো শিশু জন্ম নেয় তবে তার পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে নিজের মতো বিকশিত হয়ে নিজের স্বকীয় সত্তা গঠন করবার। কিন্তু, পারিবারিক কাঠামোর মাধ্যমে যদি শিশুটি আত্মস্থ করে তার লৈঙ্গিক দায়িত্ব এবং সেই অনুযায়ী নিজেকে গড়ে তুলতে প্রলুব্ধ হয় কিংবা স্কুলে শ্রেষ্ঠ ছাত্র হওয়ার জন্যে আগে থেকেই তার ভেতরে উচ্চাকাঙ্ক্ষী ধারণা প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়, শিশুটির চাওয়া না-চাওয়াকে উপেক্ষা করে, তবে নিঃসন্দেহে এটি হবে পরিবারের শিশুর ওপর চালিত শোষণ। এই ক্ষেত্রে, অস্তিত্ববাদ সর্বদাই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের ওপর নজর দেয়। অস্তিত্ববাদ জোর দেয় শিশুর স্বাধীন বিকাশের ওপর, নিয়ন্ত্রিত বিকাশ নয়। ইউরোপীয় রেনেসাঁ এবং এনলাইটেনমেন্টের সর্বোচ্চ বিকাশ ঘটেছিল বিংশ শতাব্দীতে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ সময়ের ধারাবাহিকতায় এই পর্যায়ে তার শিখরে পৌঁছায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ফ্রান্স, ইতালি ও জার্মানিতে ভয়াবহ প্রভাব ফেলে। সামাজিক ব্যবস্থার নৈরাজ্য মানুষের নিজেকে নিয়ে নতুন করে ভাববার পরিবেশ তৈরী করে দেয়। 'রাষ্ট্র বনাম রাষ্ট্র' রাজনীতির গ্যাঁড়াকলে পদদলিত হয় সাধারণ মানুষ। এই অন্যায্য সময়ে মানুষ নিজের অস্তিত্বকে সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করে। আদৌ কি তার বেঁচে থাকার কোনো মানে আছে? এই মৃত্যু শিবিরে মানুষের গুরুত্ব কোথায়? অস্তিত্বসংকটের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে ফরাসি দার্শনিকগণ, বুদ্ধিবাদীরা তখন অস্তিত্ববাদের ঝাণ্ডা তোলেন। তাঁরা বলেন, মানুষই প্রথম। এটা তার অস্তিত্ব যা সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে। রাষ্ট্র নয়, সমাজ নয়, পরিবার নয়। মানুষ নিজের সিদ্ধান্তের দ্বারা নিজেকে তৈরি করে। তার অস্তিত্ব হচ্ছে সত্তার পূর্বগামী। সংজ্ঞায়িত মানুষের নিজের অস্তিত্ব তৈরি করবার যুক্তি খোঁড়া, ব্যর্থ। একটা হাতুড়ি বা একটা কোদাল যখন তৈরি করা হয় তখন কামারের বা প্রস্তুতকারকের নির্মাণ করার আগেই হাতুড়ি বা কোদালের একটি রূপ তার কল্পনায় থাকে। কল্পিত রূপ অনুযায়ী তখন হাতুড়ি বা কোদালের প্রস্তুতকার্য চলতে থাকে। অর্থাৎ, হাতুড়ি বা

কোদালের একটি নির্দিষ্ট সংজ্ঞা তাদের অস্তিত্ব তৈরীতে ভূমিকা রাখে। সার্ত্র বলেছেন, মানুষের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি হয় উল্টো। মানুষ আগে জন্ম নেয়, বেড়ে উঠে এবং নিজেকে নিজেই সংজ্ঞায়িত করে, তৈরি করে। এই সংজ্ঞায়ন বা বিনির্মাণ মানুষের ক্ষেত্রে কিভাবে ঘটে?

ব্যক্তি যা করে, তাই তার অন্যের সাপেক্ষে ছবি বা তাকে মানুষ হিসেবে তৈরি করে। যুদ্ধের সময় এক তরুণ সার্ত্রের কাছে আসে উপদেশ নেওয়ার জন্যে। সেই সময় ফ্রান্সের সক্ষম যুবকরা দলে দলে যোগ দিচ্ছে যুদ্ধে। তরুণটিও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্যে তাগিদ বোধ করে। কিন্তু যুদ্ধে গেলে ঘরে তার অসুস্থ মা বিপত্তিতে পড়ে যাবে। তার ওপর সে তার মায়ের একমাত্র সন্তান। ঘরে অসুস্থ মা? না দেশপ্রেমের টানে অন্যদের পথে চলা? একমাত্র সন্তান হিসেবে যদি ছেলে থেকে যায় ঘরে তাহলে যেমন সবার ভ্রুকুটির লক্ষ্য সে হবে, তেমনি ঘরে মাকে ফেলে রণক্ষেত্রে চলে গেলে তার নিজের মধ্যে গ্লানির সৃষ্টি হবে। এই উভয়সংকটে পড়ে যখন সার্ত্রের কাছে এল, তিনি চরমভাবে ছেলেটিকে হতাশ করেন। তিনি সাধারণভাবেই বলেন, 'এটা তোমার সিদ্ধান্ত। তুমি যদি অন্যদের সঙ্গে যুদ্ধে যাও, তাহলে তোমার সৈনিক হিসেবে একটি বাহ্যিক চরিত্র তৈরি হবে; তেমনি মায়ের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে থেকে গেলে দায়িত্বশীল সন্তান হিসেবে তোমার চরিত্র প্রতিষ্ঠিত হবে। তুমি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হবে, এটাই তোমাকে নির্ধারণ করবে। এবং এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্যে তুমি মুক্ত, স্বাধীন।' এটাই বাধ্যতামূলক স্বাধীনতা। এখানে তরুণের মধ্যে যে উভয়সংকটজনিত কারণে উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে, যার জন্যে তাকে প্রফেসরের পরামর্শ চাইতে আসতে হয়েছে। সার্ত্রের মতে, এটি 'অস্তিত্বগত উদ্বেগ' (Existential Angst)। অবধারিতভাবে অস্তিত্ববাদী ব্যক্তিকে এই সংকট মেনে নিতে হবে। এই স্বাধীনতা প্রদানের ক্ষেত্রে অস্তিত্ববাদী দার্শনিকরা একেকজন ঈশ্বরবাদ, নিরীশ্বরবাদ বা সংশয়বাদ নানা ধারার আশ্রয় নিয়েছেন। সার্ত্র, কাম্য- যেমন নাস্তিক্যবাদী অস্তিত্ববাদ নিয়ে এগিয়েছেন, তাঁদের পূর্বসূরি কিয়ের্কেগাদ আস্তিকতায় ব্যক্তির স্বাধীনতার বিষয়টির সংযুক্তি ঘটিয়েছেন।

নাস্তিক্যবাদী অস্তিত্ববাদে নীৎশের ভাবধারার একটা প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ব্যক্তি স্বাধীনতার বিষয়টি যখন চলে আসে, একজন ব্যক্তি যাই করুক না কেন তাতে যখন নৈতিক বাধ্যবাধকতার কোনো প্রশ্ন থাকে না, তখন কি স্বেচ্ছাচারিতার আশঙ্কা থেকে যায় না? এই জায়গাতেই অস্তিত্ববাদের সঙ্গে মানবতাবাদের সংযোজনের সূত্র নিহিত। অস্তিত্ববাদের আলোকে একজন মানুষ যখনই তার সিদ্ধান্ত অনুসারে নিজেকে নির্মাণ করে তখন সে শুধু নিজেকে প্রতিনিধিত্ব করে না বরং পুরো মনুষ্যজাতিকেই প্রতিনিধিত্ব করে। এই ক্ষেত্রে নিজেকে সংজ্ঞায়িত করার পাশাপাশি পুরো মানবজাতিকে সংজ্ঞায়িত করবার দুটো অবধারিত স্রোত একইসঙ্গে প্রবাহিত হয়। মানুষ নিজের একমাত্র আইন প্রণেতা, সেইসঙ্গে ব্যক্তিবাদী সত্তা। সবকিছু তাকে ঘিরেই আবর্তিত

হয় ব্যক্তিবাদী দুনিয়ায়। তাকে অসংখ্য মানুষের সঙ্গে বসবাসও করতে হয়। যতই সে ব্যক্তিবাদী হোক না কেন, তার তীব্রতা বা কেন্দ্রিকতা যতই একরৈখিক হোক না কেন, সে আন্তঃমানবীয় সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারে না, সেই শক্তিও তার নেই। এই অর্থে, নিজের স্বার্থে যতই অগ্রসর হওয়া যাক না কেন, আন্তঃমানবীয় সম্পর্কে ব্যক্তি সর্বদাই বিদ্যমান। ব্যক্তি, নিজে মানুষ। সে যদি নিজে তৈরি হয়ে ওঠে, এক অর্থে অন্যরাও নিজেদের তৈরি করছে আবার অন্য অর্থে দুনিয়ার সকল মানুষই নিজেদের তৈরি করছে। অর্থাৎ, মানুষের গুরুত্ব কোনোভাবেই কমছে না। নিজের প্রতি দায়িত্ব আদতে মানুষের তাদের নিজেদের প্রতি দায়িত্ব। এখানে, রুশোর 'কমন গুড' এর কথা স্মরণে আনা যেতে পারে। স্বতন্ত্রভাবে নিজ নিজ উৎকর্ষ (সেটিও নিজস্ব সৃষ্টি) সাধনে কাজ করে যাওয়ার মাধ্যমে সবাই সমাজ, রাষ্ট্রের কাঠামো তৈরীতে সাহায্য করে পরোক্ষভাবে।

সার্ত্রের পরে ফরাসি বুদ্ধিবাদীদের মধ্যে মিশেল ফুকোর একচ্ছত্রবাদ যখন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন সার্ত্রের অস্তিত্ববাদ 'অস্তিত্বসংকটে' পড়ে। সিমন দ্য বুভোয়াঁ সার্ত্রকে বলেন, যদিও ব্যক্তিকে পুরোপুরি স্বাধীন ঘোষণা করা হচ্ছে কিন্তু সামাজিক কাঠামোও তো ব্যক্তির সিদ্ধান্ত, স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রিত করে দিচ্ছে। সার্ত্রের কথা কি তাহলে খানিকটা সরলীকৃত হয়ে যায় না? কিন্তু এই প্রশ্নের জবাবে সার্ত্র তাঁর ব্যক্তি স্বাধীনতার বিশ্বাসে অটল থাকেন। বুভোয়াঁর এই প্রশ্নের প্রতিধ্বনি পূর্ণ রূপ পায় মিশেল ফুকোর কাঠামোবাদী দর্শনে। ফুকোর ক্ষমতাকাঠামো কিভাবে ব্যক্তিকে শোষণ করে এবং ক্ষমতাকাঠামোর ব্যক্তি স্বাধীনতা খর্বকারী প্রভাব অস্তিত্ববাদী দর্শনের ভিত্তিগত জায়গায় একটি বিরোধিতার জন্ম দেয়। তা সত্ত্বেও, সার্ত্র, ফুকো প্রজন্ম এবং ফরাসি বুদ্ধিবাদীদের মধ্যে উজ্জ্বল শিরোমণি হিসেবে সর্বজন শ্রদ্ধেয় ছিলেন এবং এখনও আছেন।

আমাদের এই সময়ের ফ্যাসিবাদী জমানায় অস্তিত্ববাদী দর্শনের তাৎপর্য এখনও হারিয়ে যায়নি। অস্তিত্ববাদীরা উত্তরাধুনিক কাঠামোর মধ্যে ব্যক্তির আত্মসংকট আরও ভালো করে উপলব্ধি করেন। ব্যক্তির স্বাধীনতা সম্পর্কে যা বলেছেন সার্ত্র, তার সময়োপযোগিতা এখন সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আরও প্রস্ফূটিত হচ্ছে। একবিংশ শতাব্দীতে এসে আমাদের মধ্যকার ভৌগলিক বাধা অপসারিত হয়েছে, আন্তঃযোগাযোগের ব্যাপ্তি আরও বেড়েছে। ফলে ব্যক্তির অস্তিত্ব কোথায়? এর তাৎপর্যের জায়গা কোথায়? আমরা কি সবাই একই আঙ্গিকে চিন্তা করি? প্রতিযোগিতার যুগে ব্যক্তির স্বকীয়তা কোথায়? শিক্ষাব্যবস্থার পেষণকলে ব্যক্তির স্বাধীনতা কোথায়? ব্যক্তির সামগ্রিক সংজ্ঞায়ন ও নিজস্ব সংজ্ঞায়নের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? এই ধরণের নানাবিধ প্রশ্ন আজ আরও বেশি করে দার্শনিকদের আলোড়িত করে। নৈরাজ্যবাদ সম্পর্কিত যে তত্ত্ব নতুন করে আমাদের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোয় জায়গা করে নিচ্ছে তার শেকড় খুঁজতে গেলে দেখা যাবে, এখানে ব্যক্তিগত হতাশার বা আত্মসংকটের একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান অনস্বীকার্য। তখন কোনো কিছুরই কোনো মানে নেই বা সবকিছুই ভঙ্গুর, অনর্থক এই

ধরনের ভাবের প্রকাশ ঘটে নানা মাধ্যমে। এগুলো কাম্যুর সিসিফিয়ান অনথ্রে ও সার্ত্রের অস্তিত্বগত উদ্বেগের নানা রূপও হতে পারে। তবে পুরোপুরি প্রমাণ করা না গেলেও বর্তমানের নৈরাজ্যবাদের অস্তিত্ববাদী যে একটি শাঁস রয়েছে তা নাকচ করে দেওয়া যায় না। বিশেষত, উত্তরাধুনিকতা ও অস্তিত্ববাদী দর্শনের নতুন মিল খুঁজে পাওয়া গেছে। প্রথম দৃষ্টিতে দুটিকে পরস্পর স্ববিরোধী মনে হলেও, গূঢ় বিশ্লেষণ এদের মধ্যকার যোগসূত্র বের করে নিয়ে আসতে সক্ষম।

এই আলোচনা অন্যদিনের জন্যে মুলতবি রাখা যাবে না। এই আলোচনা আজকের হতে হবে, আগামীকালের হতে হবে। এই আলোচনা একপাক্ষিক হওয়া যাবে না, বরং হতে হবে দ্বিপাক্ষিক। কারণ, লেখক পাঠক উভয়েই স্বাধীন। কেউ কারও ওপর নির্ভর করে না। পাঠক নিজ দায়িত্বেই এই প্রশ্নের অনুসন্ধানে মগ্ন হতে পারেন। পাঠক-লেখক বিভেদ ভেঙ্গে ফেলে যখন প্রত্যেকেই নিজ নিজ গতিতে জ্ঞানের সন্ধানে এগোবেন তখন প্রকৃত অর্থেই ব্যক্তি স্বাধীনতার বাস্তব প্রয়োগ দেখা যাবে। কারণ, আমরা স্বাধীন হতে বাধ্য। সার্ত্র এটিই বলেছিলেন।

তথ্যসূত্র:

১. সরদার ফজলুল করিম, দর্শনকোষ, পঞ্চম সংস্করণ (ফেব্রুয়ারি ২০০২)
২. Jean Paul Sartre, Existentialism, excerpted from Existentialism and Human Emotions (1957, 1985)
৩. Nigel Warburton, A Little History of Philosophy (2011)
৪. Lydia Alix Fillingham, Foucault For Beginners (2000)
৫. Lesley Virgina Herring, The Existential and Postmodern Individual (2005)

তৌকির হোসেন
শিক্ষার্থী, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
সদস্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা সংসদ।

দর্শন, ধর্ম ও মানবতা

সায়মা সাদিয়া মুনা*

মানুষ জন্ম থেকেই কৌতূহলী এবং বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন জীব। অজানাকে জানার একটি প্রবল ইচ্ছা তার মধ্যে বিদ্যমান। আর এই কৌতূহলপূর্ণ হয়ে অজানাকে জানার তাগিদ যখন থেকেই অনুভূত হয়েছে ঠিক তখনই আবির্ভাব হয়েছে দর্শনের। সুতরাং দর্শন কী? ধর্ম কী? দর্শনের সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক কোথায়? এবং দর্শন, ধর্ম ও মানবতাবোধ কীভাবে সামঞ্জস্যপূণ?

দর্শন শব্দের উৎপত্তি 'দৃশ্' ধাতু থেকে। দর্শন শব্দের সাধারণ অর্থ সত্যকে দেখা (Truth), তত্ত্বকে দেখা (Reality) এবং তার স্বরূপ উপলব্ধি করা। দার্শনিক চিন্তার মূল হলো মানুষ। জীবন ও জগৎ সর্ম্পকে নির্দিষ্ট যৌক্তিক চিন্তা করা। এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত দার্শনিক Hirst বলেন,

"Philosophy is a rational Investigation into certain fundamental problem about nature of Man and the world he lives in."

আমরা বলতে পারি যে, দর্শন আবেগ দিয়ে নয়, বিবেক দিয়ে বিশ্লেষণ করে, যুক্তি দিয়ে বিচার করে। আর দার্শনিকদের লক্ষ্য মহৎ জীবনের। দর্শন মানে যুক্তি, মানবতা, জীবনের সর্বত্র নিজের চারিত্রিক অখণ্ডতা, দয়া, মায়া, প্রেম, সহযোগিতা, সমঝোতা এসব বিষয় গুরুত্ব পায় দর্শনের। সক্রেটিস, প্লেটো, এরিস্টটল থেকে শুরু করে বার্ট্রান্ড রাসেল এবং এ দেশের জিসি দেবসহ সব দার্শনিক মানবকল্যাণের কথা বলেছেন। মনে করা হয়, পল সার্ত্রে মানবতার কল্যাণের স্বার্থে নোবেল পুরস্কার পেয়েও গ্রহণ করেননি। জিসি দেব, এ দেশের বিশিষ্ট দার্শনিক, বুদ্ধিজীবী যিনি ১৯৭১ সালের বর্বর পাকিস্তানিদের বর্বরতার কারণে শহীদ হন। যিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন বিভাগে মানবিক মূল্যবোধের আলো ছড়িয়ে যান তিনিও মানবকল্যাণের কথা বলে গেছেন। তাঁর দর্শন ছিল জীবন দর্শন, মানবিক মূল্যবোধের দর্শন, সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার দর্শন। সুতরাং দর্শনকে বলা যায় একটি মানদণ্ড। যেখানে স্বীকৃত সত্য বা স্বতঃসিদ্ধ নীতি যৌক্তিতার ভিত্তিতে পরীক্ষা করা হয় এবং সত্য, মিথ্যা, নীতি-নৈতিকতা, বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে তত্ত্ব প্রদান করা হয়।

দর্শন, ধর্ম ও মানবতার মধ্যে বিজ্ঞানের আলোচনা না করলেই নয়, কারণ এদের সঙ্গে বিজ্ঞানের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক দুটো সম্পর্কই রয়েছে। দর্শনকে যেমন- Love of wisdom বা প্রজ্ঞার প্রতি অনুরাগ বলা হয় তেমনি বলা হয় যে, Philosophy is mother of all sciences কারণ ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, দর্শন ও বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু একই ছিল; এমনকি বিজ্ঞান দর্শনের একটি শাখা ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে জ্ঞানের প্রসার ও জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার উদ্ভবের কারণে বিজ্ঞানকে আলাদা করা হয়। দর্শন ও বিজ্ঞান বাস্তবসত্তার পাঠ অধ্যয়নে নিয়োজিত। যদিও

দুটোর দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা। বিজ্ঞান বাস্তব সত্তাকে দেখে খণ্ড দৃষ্টিতে আর দর্শন দেখে সমগ্র দৃষ্টিতে।

বিজ্ঞানের সঙ্গে দর্শনের সম্পর্ক সুগভীর। বলা হয় দার্শনিক তত্ত্ব ছাড়া যেমন বিজ্ঞান চলতে পারে না আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ছাড়াও দর্শনের তত্ত্বের ফলাফল প্রদান করা যায় না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, অর্থনীতিবিদ ড. অমর্ত্য সেন একজন অর্থনীতিবিদ ও দার্শনিক। তিনি তাঁর 'দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষ' বিষয়ক গবেষণাতত্ত্বে দার্শনিক তত্ত্বের সমন্বয় সাধন করেছেন বলেই তা নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে। এমন আরো অনেক অর্থনীতিবিদ নতুন তত্ত্ব আবিষ্কারের পরও দার্শনিক তত্ত্বের সমন্বয় না করায় তা বইয়ের পাতায়ই কেবল সীমাবদ্ধ রয়ে গেছে।

বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলাফলের সঙ্গে দার্শনিক তত্ত্বের সমন্বয় করলে একটি বড় গবেষণার পরিপূর্ণতা লাভ করা যায়। আর তাই দর্শন ও বিজ্ঞানের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য থাকলেও এদের বিষয়বস্তু এক ও অভিন্ন।

দর্শনে রাষ্ট্রদর্শন নামেও একটি অধ্যায় আছে। যেখানে প্রত্যেক রাষ্ট্রের স্বতন্ত্র দর্শন, সংস্কৃতি, কৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। বিশিষ্ট দার্শনিক Plato তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'Republic' গ্রন্থে এই রাষ্ট্রদর্শনের কথা উল্লেখ করে গেছেন। রাষ্ট্র চালাতে গেলেও যে দার্শনিক ভিত্তি লাগে তারও একটি বাস্তব প্রমাণ হলো আমাদের দেশ। যেমন বাংলাদেশ একটি স্বাধীন দেশ। এদেশের দার্শনিক ভিত্তি হলো ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। এই চেতনার ভিত্তিতেই এই রাষ্ট্রের জন্ম ও পথচলা। আমরা এ চেতনা লালন করেই বাঙালি জাতিসত্তার পরিচিতি লাভ করেছি।

দর্শন সম্পর্কে মানুষের কিছু ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে। আর তা মূলত দর্শন সম্পর্কে সুগভীর জ্ঞানের অভাবেই হয়ে থাকে। দর্শনের মানুষ নাস্তিকতা চর্চা করে। দর্শন ধর্ম বিদ্বেষী। এসব দর্শন সম্পর্কে এটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত এবং অযৌক্তিক ধারণা। এমন অনেক দার্শনিক রয়েছেন যারা ঈশ্বরে বিশ্বাসী। সক্রেটিস, প্লেটো, এটিস্টটল সবাই ঈশ্বর সম্পর্কে বলেছেন। সুতরাং দর্শন ও ধর্মের মধ্যে কোনো বিদ্বেষ নেই বরং সুসম্পর্কই রয়েছে।

ধর্ম, দর্শন ও বিজ্ঞানের মধ্যে তেমন কোনো সমস্যা নেই। এরা জ্ঞানের এক একটি শাখা মাত্র। এদের মধ্যে বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব তৈরি করেছে মানুষ। দর্শনের মানুষের সঙ্গে ধর্মের মানুষের বিরোধিতা, দর্শনের সঙ্গে বিজ্ঞানের বিরোধ যা সম্পূর্ণই অমূলক।

জ্ঞান নামক শরীরের হার্ট হলো ধর্ম। ব্রেইন হলো দর্শন আর হাত-পা হলো বিজ্ঞান। ধর্ম, দর্শন ও বিজ্ঞান হলো জ্ঞান নামক শরীরের তিনটি অঙ্গ, যা একটি ছাড়া অন্যটি অচল। ধর্ম ছাড়া জ্ঞান প্রাণহীন, দর্শন ছাড়া অসুস্থ অর বিজ্ঞান ছাড়া অক্ষম। সুতরাং একটি অপরটির পরিপূরক বলা যায়।

জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক আন্তর্জাতিক সংগঠন ইউনেস্কো

২০০২ সালে দর্শনকে বিশ্বসভায় পরিচিত করানোর উদ্দেশ্য যে মহৎ উদ্যোগ নিয়েছিলেন তার প্রেক্ষিতে প্রতি বছর নভেম্বর মাসের তৃতীয় বৃহস্পতিবার ইউনেস্কো সদর দপ্তরসহ সারা বিশ্বে একযোগে দর্শন দিবস পালিত হয়ে আসছে। আর সেই প্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি, এই মহৎ উদ্দেশ্য আজ প্রায় সফলতার দিকে।
আর অন্যদিকে মানবতাবাদের কথা বলতে গেলে দর্শন জ্ঞান, ভালোবাসা এই দুইয়ের সুষ্ঠু মেলবন্ধনে বিশ্বমানবতা প্রতিষ্ঠা করে যাচ্ছে। আর তার প্রমাণ হলো বার্ট্রান্ড রাসেলের মাধ্যমে। তিনি তাঁর বিভিন্ন দার্শনিক তত্ত্বে জ্ঞান ও ভালোবাসার সমন্বয় সাধন করেছেন এবং সাহিত্যে তিনি নোবেলও পেয়েছেন।
সামগ্রিকভাবে আমরা বলতে পারি, দর্শন মানুষের জীবনের মৌলিক বিষয়গুলো নিয়ে যৌক্তিক আলোচনা করে। দর্শন নৈতিকতার কথা বলে, মানবতার কথা বলে, মানবিক মূল্যবোধের কথা বলে, আত্মবিশ্লেষণের কথা বলে, যার প্রমাণ ইতিহাস ঘাটলেই দার্শনিকদের জীবনী থেকে পাওয়া যায়।

সায়মা সাদিয়া মুনা
শিক্ষার্থী, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
সদস্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা সংসদ।

স্বাধীনতার তথ্যচিত্র 'স্টপ জেনোসাইড'

সাইয়্যিদ শাহজাদা আল কারীম*

মুখ্য শব্দগুচ্ছ: স্টপ জেনোসাইড, চিহ্ন, প্রতীক, তথ্যচিত্র, মুক্তিযুদ্ধ, ভয়েজ অব গড, ১৯৭১

'স্টপ জেনোসাইড' বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ওপর নির্মিত একটি প্রামাণ্য চলচ্চিত্র। ইংরেজি 'স্টপ জেনোসাইড' শব্দগুচ্ছের অর্থ 'গণহত্যা বন্ধ করো'। বরেণ্য চলচ্চিত্রকার জহির রায়হানের প্রথম তথ্যচিত্র 'স্টপ জেনোসাইড'। ১৯৭১ সালে এটি নির্মাণের মধ্য দিয়ে এই কিংবদন্তির তথ্যচিত্র নির্মাণে অভিষেক ঘটে। বিশ মিনিটের এই তথ্যচিত্রে মূলত ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি সেনাদের নির্মম অত্যাচার, নির্বিচারে গণহত্যা, নির্যাতন ও এর ফলাফল হিসেবে পূর্ব বাংলার মানুষের শরণার্থী শিবিরে মানবেতর জীবনযাপনের চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। জহির রায়হান ১৯৭১ সালের এপ্রিল-মে মাসের দিকে এই তথ্যচিত্রের জন্য পূর্বপরিকল্পনা শুরু করেন এবং এক মাসেরও কম সময়ে, জুন মাসে তিনি এর কাজ সম্পন্ন করেন। এ তথ্যচিত্র নির্মাণে চলচ্চিত্রনির্মাতা আলমগীর কবির তাঁকে সবরকম সহযোগিতা করেন। পর্দার পেছনে আমরা যে কণ্ঠ শুনতে পাই তাও আলমগীর কবিরেরই দেয়া।

এ তথ্যচিত্রটির নির্মাণশৈলীর সঙ্গে কিউবান চলচ্চিত্রকার সান্তিয়াগো আলভার্জ এর কাজের ধরনের অনেক মিল পাওয়া যায়। ধারণা করা হয়, জহির রায়হান তাঁর এ তথ্যচিত্র নির্মাণে আলভার্জকেই অনুসরণ করেছেন। এর শ্যুট হয় ৩৫ মি. ফিল্মের মাধ্যমে (লিহায়, ২০০২)।

মোড

স্টপ জেনোসাইডে প্রধানত এক্সপোজিটোরি মোড এবং কিছুটা রিফ্লেক্সিভ মোডের সমন্বয় রয়েছে। এক্সপোজিটোরি মোডের প্রধান বৈশিষ্ট হচ্ছে 'ভয়েস অব গড' এর ব্যবহার। কী বলা হচ্ছে এবং বাচনভঙ্গি কেমন তা 'ভয়েস অব গড' এ সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ। স্টপ জেনোসাইডে আলমগীর কবিরের যে কণ্ঠ ব্যবহার করা হয়েছে তা এতটাই শক্তিশালী এবং প্রভাবশালী যে, তা দর্শকের কান দিয়ে মর্মে আঘাত করে; যেন বাঙালির দুর্দশার কথা বিশ্ববাসীর কাছে তীক্ষ্ণভাবে আঘাত করে। এছাড়া এ তথ্যচিত্রে মূলত দর্শকদের উদ্দেশ্য করে বিভিন্ন তথ্য দেওয়া হয়েছে, কারণ এর উদ্দেশ্যই ছিল বিশ্বের মানুষকে যুদ্ধকালীন অবস্থার কথা জানানো।

তত্ত্বকথা

বিভিন্ন চিহ্ন, কোড, মেসেজ, টেক্সট, সিস্টেম ইত্যাদির মাধ্যমে একটি চলচ্চিত্রে অর্থ তৈরি করা আর তা দর্শকদের কাছে অর্থবহ হয়ে ওঠার বিষয় নিয়ে আলোচনা করে চিহ্নবাদী চলচ্চিত্রতত্ত্ব যেখানে বিজ্ঞানভিত্তিকভাবে চলচ্চিত্রশিল্পে লুকানো অর্থ

খুঁজে বের করা হয় (আউয়াল, ২০১৪; পৃ-১২৮)। চিহ্নতত্ত্ববিদরা চিহ্ন বা সাইনকে সিগনিফায়ার আর সিগনিফায়েড এই দুটি ভাগে ভাগ করে বুঝতে চেষ্টা করেন; যেখানে সিগনিফায়ার হচ্ছে ওই সাইন বা চিহ্ন এবং সিগনিফায়েড ওই চিহ্ন দ্বারা নির্দেশিত বস্তু বা বিষয় (মোনাকো, ২০০০, পৃ. ১২৭)। স্টপ জেনোসাইড তথ্যচিত্রটিতে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন চিহ্নের ব্যবহার লক্ষণীয় এবং চলচ্চিত্রটির অন্তর্নিহিত অর্থ বোঝার জন্য শব্দ ও ছবির মাধ্যমে তৈরি করা এসব চিহ্নের দিকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন।

সামগ্রিক পর্যালোচনা

দেশের সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে আর্থিক, রাজনৈতিক সমস্ত প্রতিকূলতাকে তুচ্ছ করে পরিচালক এ তথ্যচিত্র নির্মাণ করেন এবং তার যে উদ্দেশ্য ছিল অর্থাৎ, যুদ্ধের ভয়াবহতাকে ফুটিয়ে তোলা, তা জীবন্ত কিছু ফুটেজের মাধ্যমে সফলভাবে বস্তবায়ন করেন।

তথ্যচিত্রের শুরুতেই আমরা ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিনের বিখ্যাত একটি উক্তি শুনতে পাই-

যারা স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে আলাদা হওয়ার অধিকার দাবি করে, তাদেরকে বিচ্ছিন্নতাবাদি বলে অভিযুক্ত করা, বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকারকে পারিবারিক ব্যবস্থা ধ্বংসের নামান্তর বলে অভিযোগ করার মতোই নির্বুদ্ধিতা এবং অসততা।

এই প্রতিবাদী এবং একই সঙ্গে মানুষের অধিকার বিষয়ক মর্মস্পর্শী ও যুক্তিসঙ্গত উক্তি থেকেই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানিরা সম্পূর্ণই জোরপূর্বক এবং কোনো যথাযথ যুক্তি ছাড়া পূর্ব পাকিস্তানে হামলা করেছিল। কারণ পূর্ব পাকিস্তানিরা তখন স্বাধিকার আদায়ের আন্দোলনই করে আসছিল। আর তাই তাদের ওপর বিনা নোটিশে এই অকথ্য অত্যাচার কেবল নির্বুদ্ধিতা আর অসততারই পরিচয় ছিল। পরিচালক শুরুতেই এমন উক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দর্শকদের এই তথ্যচিত্রের বিষয়বস্তু কতটা গভীর আর মর্মস্পর্শী তার ইঙ্গিত দিতে চেষ্টা করেছেন।

শুরুর দিকে ক্রেডিট লাইনের মাঝামাঝি অংশে দেখানো হয়, গ্রাম্য মহিলার ঢেঁকিতে পাড় দেবার দৃশ্য। এর দ্বারা যুদ্ধের আগে বাংলার অর্থাৎ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সামাজিক অবস্থা আর সাধারণ মানুষের জীবন-যাপনের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। এর পরই পর্দায় ক্রেডিট লাইন দেখার পেছনে আমরা শুনতে পাই অনেকগুলো বুটের শব্দ, এরপর বোমা এবং গুলির শব্দ সঙ্গে কুকুরের আর্তচিৎকার। ঠিক পর মুহূর্তেই আমরা বেশ কয়েকটি স্থিরচিত্র দেখতে পাই, যেখানে ভাঙ্গা ঘরবাড়ি, নানা বয়সের মানুষের সঙ্গে পশুপাখির ছিন্নভিন্ন লাশ। ভি আই লেলিনের এমন উক্তির পর এরকম বিধ্বস্ততার চিত্র বিশ্বের কাছে বাঙালির ওপর পশ্চিম পাকিস্তানিদের অযৌক্তিক নির্যাতনের কথাই আলোকচিত্রিক চিহ্নের মাধ্যমে তুলে ধরে।

পরবর্তীতে আমরা একটি শরণার্থী সারি দেখতে পাই। ক্ষুধা, চিন্তাক্লিষ্টতা, জীবনের কঠোরতা, নিজের বাড়িঘর ছেড়ে অন্য এক দেশে যাওয়ার অনিশ্চয়তা, জীবন সংশয়ের ভীতি সবকিছু যাদের আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে। এই জনগোষ্ঠীর জীবনের এক দুর্বিষহ অধ্যায় এখানে তুলে ধরেছেন পরিচালক। তাদের এই চরম কষ্টকে

ভয়েস ওভারের মাধ্যমে এভাবে তুলে ধরা হয়েছে-

দিনের পর দিন শরণার্থীর মিছিল এগিয়ে চলে। আহার নেই, ঘুম নেই, দুঃসহ ক্লান্তি; তবু থেমে বিশ্রাম নেবার উপায় নেই।

দীর্ঘ লাইনের যাত্রায় একটা সময় দেখা যায় যে কাদার মধ্যে দিয়ে যাবার সময় মানুষের পা দেবে যাচ্ছে সে কাদা পানিতে, আবার পা তুলে পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে বেশ কষ্ট হচ্ছে। এ যেন বাংলাদেশের তৎকালীন মানুষের বাস্তব চিত্র একটু রূপকভাবেই চিহ্নিত হয়েছে। যুদ্ধের ভয়াবহতায় জীবন চলার পথে মানুষ যেমন আটকে গেছে তেমনি কাদায় পা আটকে যাওয়া যেন সে কঠিন বাস্তবতার দিকেই ইঙ্গিত দেয়।

এই মানুষগুলোর নিরন্তর যাত্রা একসময় শেষ হয়। তারা ঠাঁই নেয় হয় গাছতলায়, নয়তো শরণার্থী শিবিরে। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে তাদের ঠাঁই দেবার জন্য শরণার্থী শিবির তৈরি করা হলেও প্রতি ঘণ্টায় যখন হাজার হাজার শরণার্থী আসে তখন আশ্রয়ের সংকট দেখা দেয়। এখানে পরিচালক হয়তো এটাই বোঝাতে চেয়েছেন, নিজের দেশ থাকতেও হাজার হাজার মানুষকে শরণার্থী হয়ে মর্মান্তিক জীবন যাপন করতে হচ্ছে।

শরণার্থী শিবিরে নব্বই বছরের এক বৃদ্ধাকে দেখা যায়, যিনি বৃষ্টি নামার আগে শিবিরের কোনো এক কোণে জায়গা পাবার আশায় হেঁটে যাচ্ছেন। অথচ এই শেষ বয়সে এসে তো তাঁর নিজের ভিটা বাড়িতে নিরাপদে বিশ্রাম নেবার কথা। এভাবে অসহায়ের মতো শরণার্থী শিবিরে এতটুকু আশ্রয়ের আশায় হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ানোর কথা নয়। এই বৃদ্ধা যেন একটি প্রতীক হিসেবে সমগ্র বিশ্বের কাছে নিরীহ বাঙালির আশ্রয়হীন অবস্থাকে চিহ্নিত করছে।

পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নিষ্ঠুরতা, বিবেকহীনতা আর পাশবিকতার নমুনা আমাদের কাছে ফুটে উঠেছে এক কিশোরীর করুণ অবস্থার চিত্রায়নের মাধ্যমে। পাকিস্তানি সেনাদের নির্যাতনের শিকার এই মেয়েটি। মেয়েটির মুখ, চোখের ক্লোজ আপ শটের মাধ্যমে তার লাঞ্ছিত জীবনের অসহায়ত্ব ফুটে উঠেছে দর্শকদের নিকট। এরপর পরিচালক দর্শকের সামনে উপস্থাপিত করেছেন আশি বছরের এক বৃদ্ধকে, যিনি তার চোখের সামনে পাকিস্তানি সেনাদের দ্বারা একটি গ্রামকে নিঃশেষ হয়ে যেতে দেখেছেন। তারা প্রথমে কর্মক্ষম পুরুষদের হত্যা করেছে আর নারীদের ওপর চালিয়েছে নির্যাতন। এরপর একে একে দেখতে পাওয়া যায়, ফরিদপুরে ২৫৩ জনকে নির্বিচারে হত্যা, বুড়িগঙ্গার পূর্বতীরে ৬০০০ এর বেশি মানুষকে হত্যা, শ্রমিকদের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে তাদের হত্যার তথ্যসমূহ। হানাদারদের গণহত্যার চিত্র এভাবেই তথ্যচিত্রটিতে ফুটে ওঠে।

বাংলার আদি রাজধানী গৌড়ে পৌঁছে পরিচালক সেখানে অবস্থানরত ছিন্নমূল শরণার্থীদের করুণ দশা চিত্রিত করেছেন। ধারাভাষ্যে তা ফুটে উঠেছে এভাবে-

গৌড় জাতির ইতিহাস যেন আবার নতুন করে শুরু হল। এতগুলো শতাব্দী এখানে যেন অচল, স্থবির হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আজ এখানে আশ্রয় নেয়া ভীত-সন্ত্রস্ত, ছিন্নমূল মানুষগুলো ইতিহাসেরই জিম্মি। সমস্ত মানবজাতির বিবেক এত বড় অন্যায়ের কালিমা থেকে মুক্ত হতে পারে না।

অতঃপর এক বৃদ্ধার করুণ এক যাত্রার দৃশ্য তুলে ধরা হয় তথ্যচিত্রটিতে, যিনি চোখে দেখতে পারেন না, কানেও শুনতে পান না। হাতের একমাত্র লাঠিকে অবলম্বন করে পার করেছেন প্রায় একশ মাইল। মানববর্বরতা কোন পর্যায়ে পৌঁছুলে একজন মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধাকে মৃত্যুরই হাত থেকে বাঁচার জন্য এত কষ্ট করতে হয়, এই ছিল সেখানে প্রশ্ন। হতে পারে এই বৃদ্ধাকেও একটি চিহ্নরূপে ব্যবহার করা হয়েছে যেখানে বৃদ্ধা সারাবিশ্বের প্রতীক যারা পাকিস্তানিদের এত অত্যাচার সম্পর্কে জানার পরও চোখ-কান বন্ধ করে আছে।

তথ্যচিত্রের শেষ পর্যায়ে আবার দেখানো হয় অসহায় মানুষের মুখ। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বিশ্বের যে কোনো দেশের, কালের ও জাতির মুক্তিকামী মানুষের জনযুদ্ধেরই একটি অংশ। বাংলাদেশে পাকিস্তানি বর্বরদের চালানো গণহত্যা বন্ধের দৃঢ় আহ্বানের মধ্য দিয়ে শেষ হয় 'স্টপ জেনোসাইড'।

ভয়েস ওভার

স্টপ জেনোসাইড এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য এর অনন্য আঙ্গিকের ধারা বর্ণণা বা ভয়েস ওভার। যৌক্তিকভাবে সঠিক শব্দচয়নের মাধ্যমে যেমন পরিস্থিতিকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে তেমনি ভয়েস প্রজেকশন বা উচ্চারণের দিকেও যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যেন তা দর্শকের মর্মমূলে আঘাত করে। ভয়েস ওভারে যুদ্ধের নির্মমতাকেই শুনতে পাই কাব্যিক এক আঙ্গিকে। প্রথমেই আমরা শুনতে পাই-

ওদেরকে খুঁজে বার করতে অসুবিধা হয়নি। দেখলাম দিগন্ত বিস্তৃত আধমরা মানুষের চলমান মিছিল। দেহের শক্তি নিঃশেষ তবু ওদের চলতে হয়। স্টপ...

এর মাধ্যমে যে শরণার্থীদের ইঙ্গিত করা হয়েছে তা শুনেই যেকোনো মানুষ ধারণা করতে পারবে এবং এ কথার পরেই 'স্টপ' শব্দটির ব্যবহারও এখানে বিশেষ অর্থ বহন করে। ভয়েস ওভারে এভাবে অনেকবারই এই 'স্টপ' শব্দের ব্যবহার রয়েছে। যেমন শরণার্থী শিবিরে এক বৃদ্ধার করুণ অবস্থা তুলে ধরতে গিয়ে বলা হয়েছে-

নব্বই বছরের এই বৃদ্ধা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারেন না যে জীবনের শেষ প্রান্তে এসে এই ভরা বর্ষায় একটু ঠাঁইও পাবেন না। মরণের আতঙ্ক আবারও মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। সুদূর বাংলাদেশে বাপ-দাদার ভিটে বাড়ি ছেড়ে হেঁটে এসে শেষ পর্যন্ত এখানে এভাবে মরতে হবে। স্টপ...

এছাড়া এক কিশোরীর ওপর হানাদার বাহিনীর নির্যাতনের বর্ণণা দিয়ে বলা হয় 'স্টপ'। পরিচালক সম্ভবত এখানে 'স্টপ' শব্দের মাধ্যমে এটাই বোঝাতে চেয়েছেন যে বাঙালির ওপর এমন অকথ্য নির্যাতন সমগ্র মানবজাতির ওপর নির্যাতনের অনুরূপ এবং অনতিবিলম্বে এ অত্যাচার বন্ধ হওয়া উচিৎ। সমগ্র বিশ্ববাসীকে তিনি এ অত্যাচার বন্ধে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন এই 'স্টপ' শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে।

রাজনৈতিক আঙ্গিকে এ তথ্যচিত্রের ভয়েস ওভার বা ধারাভাষ্যের গুরুত্ব অনেক। আমরা জানি সমগ্র বিশ্বের আন্তর্জাতিক রাজনীতির নিয়ন্ত্রক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। তৎকালীন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন ছিলেন পাকিস্তান প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের পক্ষে। এ পক্ষপাত যে কতটা অযৌক্তিক ও অসঙ্গত, তা তুলে ধরা হয়েছে এভাবে-

লেফটেন্যান্ট উইলিয়াম ক্যালির বিরুদ্ধে হত্যা মামলায় প্রেসিডেন্ট নিক্সন অপরাধীর পক্ষে হস্তক্ষেপ করেন। ভিয়েতনামের নিলাই গ্রামে শত শত নিরস্ত্র নারী-পুরুষ-শিশুকে হত্যার অপরাধে ক্যালিকে আদালতে দোষী সাব্যস্ত করা হয়।

এর মাধ্যমে এই ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে যে প্রেসিডেন্ট নিক্সন শুরু থেকেই হত্যাকারীদের পক্ষে অবিবেচকের মতো অবস্থান নিয়েছেন। সমস্ত বিশ্বের কাছে তিনি এই রাজনৈতিক নেতার নড়বড়ে অবস্থানের কথা তুলে ধরেছেন ভয়েস ওভারে উইলিইয়াম ক্যালির হত্যাযজ্ঞের কথা তুলে ধরার মাধ্যমে।

এছাড়া ভয়েস ওভারে আমরা আরো শুনতে পাই-

মানুষের পৃথিবী ছেড়ে চন্দ্রে অবতরণের পর স্বপ্ন দেখছিলাম যে মানুষের বিরুদ্ধে মানুষের অন্যায়, অত্যাচার, অনাচার শীঘ্রই প্রাচীন ঘটনা বলে চিহ্নিত হবে। কিন্তু রক্তপিপাসু পাকিস্তানি দানবদের তাণ্ডবনৃত্য সব ধুলায় মিশিয়ে দিল।

এর মাধ্যমে আধুনিকতার চূড়ান্ত উৎকর্ষের সময় বাঙালি জাতি কী করে নির্যাতিত হচ্ছে তার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। পরিচালক সবচেয়ে বড় প্রশ্ন তুলেছেন মানবাধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর প্রতি, এত বড় অবিচারের পরও তাদের নীরবতার প্রতি। সবচাইতে অবিশ্বাস্য ব্যাপার এই যে, এমন বর্বরতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে প্রকাশ্যে। অথচ মানবাধিকার সংরক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত আন্তর্জাতিক সংস্থাটি তখন এর নীরব দর্শক।

পরিচালক জাতিসংঘের মানবাধিকার সংক্রান্ত নিয়ম-নীতির প্রতিও প্রশ্ন তুলেছেন যেখানে সেসবকে উপেক্ষা করে ভিয়েতনামে চলেছে নৃশংস হত্যাযজ্ঞ। আর এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশেও পাকিস্তানি বাহিনীর অত্যাচারের পরেও নীরব সেই শান্তিরক্ষার সংগঠন।

মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পে প্রবেশের পর কমান্ডারের এই যুদ্ধের প্রতি প্রতিক্রিয়া তুলে ধরার মাধ্যমে পরিচালক যুদ্ধের প্রতি বাঙালির অনাগ্রহ এবং বাঙালির আত্মিক শক্তি ও দেশপ্রেমের গভীরতা প্রকাশ করেছেন।

শব্দ ও সঙ্গীতের ব্যবহার

স্টপ জেনোসাইডে বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক শব্দ বা এমবিয়েন্স সাউন্ড এবং মিউজিকের ব্যবহার, সেই সঙ্গে ধারা বর্ণনার বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। শুরুতেই একটা বৈপ্লবিক ধাঁচের মিউজিক আমরা শুনতে পাই এবং এর পর ভি আই লেলিনের উক্তি শুনতে পাই যার মর্মার্থ মিউজিকের সঙ্গে সঙ্গতি প্রকাশ করে। ক্রেডিট লাইন দেখানোর সময় ঢেঁকির শব্দ এবং এরপর ক্রমে ক্রমে সৈন্যদের বুটের শব্দ, বোমা ও গোলাগুলির আওয়াজ, কুকুরের ঘেউ ঘেউ এবং একই সঙ্গে কাকের কা কা শব্দ। এরপরই আমরা পর্দায় স্টিল ছবিতে ঘরবাড়ির ধ্বংসাবশেষ, ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন লাশ, মৃত পশুপাখির চিত্র দেখতে পাই সঙ্গে থাকে কুকুরের ঘেউ ঘেউ আর কাকের কা কা শব্দ। মূলত এই ক্রমধারার শব্দের ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থাৎ ঢেঁকির শব্দের মাধ্যমে প্রথমে বাংলার সুখী পরিবেশ, বুটের শব্দের মাধ্যমে, এতে হানাদারদের প্রবেশ এবং গোলাগুলির শব্দের মাধ্যমে নিরীহ বাঙালির ওপর সেনাদের নির্যাতন, হত্যাযজ্ঞ বোঝানো হয়েছে। শুধু শব্দের সঠিক ব্যবহার যে একটা পরিস্থিতিকে সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করতে পারে তা এই তথ্যচিত্রের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি। এভাবেই শব্দ ও সঙ্গীতের ব্যবহারের মাধ্যমে এ তথ্যচিত্রকে করে তোলা হয়েছে আরও মর্মস্পর্শী।

নৈতিক দিক

মুক্তিযুদ্ধপরবর্তী সময়ে জহির রায়হানের একটি সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায় যে, পাকিস্তানি বাহিনীর কর্মকাণ্ডের মধ্যে তিনি এ দেখে সবচেয়ে বেশি অবাক হয়েছেন যে, তারা গণহত্যা, লুটপাট চালানোর পর সবকিছু ভিডিও ক্যামেরা দিয়ে শুট করত এবং পরবর্তীতে দৃশ্য সম্পাদনার কাজ করে বিশ্ববাসীর নিকট প্রচার করত যে বাঙালিরা নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষের মাধ্যমে গণহত্যা চালাচ্ছে এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে। তখন জহির রায়হান বিশ্ববাসীর কাছে বাংলাদেশের মানুষের আসল অবস্থা জানানোর উদ্দেশ্যে 'স্টপ জেনোসাইড' নামক তথ্যচিত্রটি তৈরি করেন। কিছু স্থিরচিত্রসহ এ তথ্যচিত্রের সব ফুটেজই যুদ্ধের সময় সংগ্রহ করা। কোনো ধরনের স্টেজিং এখানে করা হয়নি। বস্তুত যুদ্ধকালীন ফুটেজগুলো এমনভাবে নেওয়া যা সে সময়কার পরিস্থিতিকে যথাযথভাবেই তুলে ধরতে সক্ষম ছিল। এছাড়া যুদ্ধ চলাকালেই এর নির্মাণকাজ শেষ হয়। সেক্ষেত্রে রিস্টেজিং করার কোনো প্রয়োজন হয়নি সে সময়। সাধারণত যুদ্ধকালীন তৈরী তথ্যচিত্রের প্রধান লক্ষণীয় বিষয় থাকে, এটি কতটা বাস্তবসম্মত এবং নৈতিক বা ইথিকাল দিক থেকে কতটা গ্রহণযোগ্য। 'স্টপ জেনোসাইড' তথ্যচিত্রে তৎকালীন বাংলার বাস্তব চিত্রই তুলে ধরা হয়েছে। শরণার্থী শিবির থেকে শুরু করে সমগ্র বাংলার তখনকার অবস্থা কোনো ধরনের বাহুল্য ছাড়াই তুলে ধরা হয়েছে। এদিক থেকে পরিচালকের নৈতিক দিক যথেষ্ট শক্তিশালী। একটি অংশে পাকিস্তানী সেনাদের হাতে নির্যাতিত এক কিশোরীকে দেখানো হয়। যদিও বাস্তব অবস্থা বোঝানোর জন্য তাকে দেখানোর প্রয়োজন ছিল কিন্তু এমতাবস্থায় এক নারীকে সবার সামনে পরিচয় করিয়ে দেওয়া কতটা যুক্তিযুক্ত তা প্রশ্নসাপেক্ষ।

শেষ কথা

শহীদ বুদ্ধিজীবী জহির রায়হানের নির্মিত এই তথ্যচিত্রটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের এক অসামান্য দলিল। এটি তৈরী হয়েছিল ইংরেজিতে, বিশ্ববিবেককে নাড়া দেয়ার লক্ষ্যে। এর ভাষান্তর করেন জহির রায়হায়নের সহকারী, মুক্তিযোদ্ধা এবং চলচ্চিত্রকার আলমগীর কবির। 'স্টপ জেনোসাইড' শুধু আমাদের মুক্তিযুদ্ধের অসামান্য দলিলই নয়, শিল্পমানের দিক থেকেও এটি অনবদ্য।

তথ্যসূত্র

- আউয়াল, সাজেদুল (২০১৪), চলচ্চিত্রকলার রূপ-রূপান্তর, ঢাকা: দিব্যপ্রকাশ।
- মোনাকো, জেমস (২০০০), হাউ টু রিড এ ফিল্ম (৩য় সংস্করণ), অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস: নিউ ইয়র্ক।
- লিহায়, জেমস (২০০২), ফিল্মস্ দ্যাট মেক আ ডিফারেন্স, সান্তিয়াগো আলভারেজ এন্ড দ্য পলিটিক্স অব বেঙ্গল: সিকলন. সেন্সেস অব সিনেমা (২৩)।

সাইয়্যিদ শাহজাদা আল কারীম
শিক্ষার্থী, টেলিভিশন, ফিল্ম এন্ড ফটোগ্রাফি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
সদস্য, আর্ট এন্ড কালচার টিম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা সংসদ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পুষ্টিমান ও খাদ্যতালিকাগত অভ্যাস পরিমাপ: দুইটি আবাসিক হলের ওপর ভিত্তি করে গবেষণা

খাদিজা তাহেরা তরী*

মুখ্য শব্দগুচ্ছ: পুষ্টিকর খাদ্য, খাদ্যতালিকা, শিক্ষার্থী, সচেতনতা, বিশ্ববিদ্যালয়

সারমর্ম

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পুষ্টিগত অবস্থান নির্ণয় করা গুরুত্বপূর্ণ, কেননা এই সময়ই তারা নিজেদের জীবন ও অভ্যাস নিজেদের ইচ্ছা অনুসারে গড়ে তোলে যা কি না তাদের পরবর্তী জীবনে ভূমিকা রাখে। কিছু শিক্ষার্থীরা আবার আবাসিক হলে বসবাস করে সুতরাং তাদের পুষ্টির মানের সঙ্গে অনাবাসিকদের পার্থক্য রয়েছে। আবার পুষ্টিগত মানের দিক থেকে একটি ছেলে ও একটি মেয়ের মধ্যেও পার্থক্য রয়েছে। তাই পুষ্টিগত মানের যে জেন্ডার পার্থক্য তা আমাদের জানা উচিত, বিশেষ করে আবাসিক শিক্ষার্থীদের মধ্যে। এর ফলস্বরূ বর্তমান গবেষণায় ইন্টারভিউ ও এফজিডি ব্যবহার করে পুষ্টিগত মান ও খাদ্যতালিকার যে জেন্ডার পার্থক্য তা দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। গবেষণার ফলাফলে দেখা গেছে খাদ্যতালিকাগত অবস্থান থেকে ছেলেরা পিছিয়ে আছে মেয়েদের থেকে এবং তারা তুলনামূলকভাবে বেশি অসুস্থতার শিকার হচ্ছে। তবে মেয়েদের অবস্থাও খুব ভালো না। তারাও অপুষ্টিতে ভুগছে এবং ছেলে মেয়ে উভয়েরই প্রয়োজন তাদের এই স্বাস্থ্যগত মান উন্নয়ন করা। কেননা এর ক্ষতিকারক দিক এখন লক্ষ্য করা না গেলেও পরবর্তী জীবনে এর মারাত্মক প্রভাব পড়তে পারে।

ভূমিকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন আবাসিক ছাত্রী হিসেবে দীর্ঘ ৪ বছর আবাসিক থাকার পর লক্ষ্য করলাম, আবাসিক শিক্ষার্থীদের পুষ্টিগত অবস্থান অন্যান্য ছাত্রদের থেকে আলাদা। আমি আরো লক্ষ্য করলাম এই পার্থক্য ছেলে ও মেয়েভেদেও আলাদা। তাই আমি এর সত্যতা নির্ণয়কল্পে এবং সে লক্ষ্যে গবেষণার জন্য দুইটি আবাসিক হল নির্ধারণ করা হয়।

আমাদের অঙ্গ ও টিস্যুর সঠিকভাবে কাজ করার জন্য একটি ভারসম্যগত খাদ্যতালিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সঠিক পুষ্টির অভাবে আমাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়, শরীর দুর্বল হয় এবং স্বাভাবিক কাজকর্ম ব্যহত হয়। পুষ্টিকর খাদ্য আমাদের মানবিক উন্নয়নের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ (চৈ, ১৯৯৯)।

বর্তমান গবেষণাটি করা হয়েছে ৪০ জন স্বেচ্ছাসেবী শিক্ষার্থীদের নিয়ে যাদের ধারাবাহিকভাবে নির্ধারণ করা হয় দুটি হল থেকে (একটি ছেলেদের ও একটি মেয়েদের হল)। তাদের বয়সের সীমা ছিল ২১ থেকে ২৫ বছর। তাদের ২৪ ঘন্টার

খাদ্যতালিকা ও তাদের মতামত গ্রহণ করা হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

প্রধান উদ্দেশ্য: ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পুষ্টিগত পার্থক্য নিরূপণ

অন্যান্য উদ্দেশ্য: ১। খাদ্যতালিকার জেন্ডারগত পার্থক্য বের করা।

২। খাদ্যতালিকা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মতামত গ্রহণ করা।

প্রণালীবিদ্যা

গবেষণার উদ্দেশ্য হচ্ছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পুষ্টিগত মান ও খাদ্যতালিকা বের করা। এই গবেষণার জন্য ৩০ জন শিক্ষার্থীর ইন্টারভিউ নেয়া হয়েছে, যার মধ্যে ১৫ জন ছেলে ও ১৫ জন মেয়ে শিক্ষার্থী। দুইটি আবাসিক হল (শামসুন নাহার ও বিজয় একাত্তর) থেকে ধারাবাহিকভাবে শিক্ষার্থী নির্ধারণ করা হয়েছে।

গবেষণার দ্বিতীয়ভাগে দুইটি এফজিডি (ফোকাসড্ গ্রুপ ডিসকাশন) করা হয়েছে; একটি ছেলেদের নিয়ে ও অন্যটি মেয়েদের নিয়ে। উদ্দেশ্য ছিল তাদের কাছে পরিবেশিত খাদ্যের তালিকা ও পুষ্টিগত মান সম্পর্কে তাদের মতামত নেওয়া। ছেলে এবং মেয়ে, উভয়ের এফজিডিই করা হয়েছে তাদের স্ব স্ব হলে গিয়ে। দুই গ্রুপেই সদস্য সংখ্যা ছিল ৬ জন করে। ইন্টারভিউ ও এফজিডি'র সকল তথ্য শিক্ষার্থীদের অনুমতিক্রমে রেকর্ড করা হয়েছে।

অংশগ্রহণকারী

এই কোয়ালিটেটিভ গবেষণায় ডাটা সংগ্রহের জন্য মূলত ইন্টারভিউ ও এফজিডি করা হয়েছে। তাদের মতামতের বিভিন্নতা ও পর্যাপ্ততা নিশ্চিত করার জন্য ২য় বর্ষ থেকে মাস্টার্স পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ করতে বলা হয়। প্রথম বর্ষের কোনো শিক্ষার্থী নেওয়া হয়নি, কেননা আবাসিক শিক্ষার্থী হিসেবে তাদের অভিজ্ঞতা যথেষ্ট নয়।

গবেষণার যৌক্তিকতা

এই গবেষণাটি শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য প্রযোজ্য। তাদের খাদ্যতালিকা ও পুষ্টিগত মান সম্পর্কে তারা জানতে পারবে। এর ফলে তারা নিজেদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন হবে। তাদের সঠিক স্বাস্থ্য গঠনে এই গবেষণাটি অনুপ্রেরণা জোগাবে।

গবেষণার ফলাফল

গবেষণার ফলাফলে দেখা যায়, শিক্ষার্থীদের পুষ্টির মান খুবই নিম্নমানের। ছেলে মেয়ে উভয়ই পুষ্টির ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। তবে ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে পুষ্টিগত মানের পার্থক্য রয়েছে। পার্থক্য সীমিত হলেও তা পার্থক্যই।

খাদ্যগ্রহণ: ছেলেরা সাধারণত ক্যাম্পাস থেকে খিচুড়ি বা ফ্রাইড রাইস কিনে খায় যা ক্যাম্পাসের জনপ্রিয় খাবার হলেও অস্বাস্থ্যকর। অপরপক্ষে মেয়েরা হলের ক্যান্টিন থেকে বা নিজেরা রান্না করে খায় যা তুলনামূলক স্বাস্থ্যকর। ছেলেদের মধ্যে সকালের নাস্তা না করার প্রবণতা বেশি দেখা যায় এবং তারা নাস্তা হিসেবে যা খায় তার মধ্যে

তৈলাক্ত খাবারের সংখ্যা বেশি। তৈলাক্ত খাবার খাওয়ার প্রবণতা মেয়েদের মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়।

অর্থ খরচ: ছেলে মেয়ে উভয় ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, তারা তাদের অর্থের বেশিরভাগ ব্যয় করে খাদ্যের পেছনে। তবে সব খাবার পুষ্টিকর নয়, কেননা শিক্ষার্থীরা পেট ভরা ও স্বাদগহণের ওপর বেশি জোর দেয়। অর্থ খরচের দ্বিতীয় খাত হিসেবে দেখা গেছে, ছেলেরা তাদের অর্থ ব্যয় করে সামাজিক সম্পর্ক উন্নয়নে অর্থাৎ আড্ডার পেছনে, যেখানে একটা বিষয় থাকে চা ও সিগারেট-যেটা স্বাভাবিকভাবেই অস্বাস্থ্যকর। মেয়েদের অর্থব্যয়ের দ্বিতীয় খাত হিসেবে দেখা যায় রূপচর্চাকে। মেয়েরা লোশন, ক্রিম কেনার সঙ্গে সঙ্গে তাদের ফিগার মেন্টেইন করতে চায়; তাই তারা ফাস্টফুড থেকে দূরে থাকে। যা তাদের স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী।

অসুস্থতা: ছেলেদের মধ্যে অসুস্থতার পরিমাণ বেশি লক্ষ্য করা গেছে। অধিকাংশ শিক্ষার্থীই হলজীবনের পূর্বে বাসায় থাকাকালীন মায়ের ওপর নির্ভরশীল ছিল, ফলে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যসচেতনতা গড়ে ওঠেনি। তবে মেয়েদের স্বাস্থ্যগত অবস্থা তাদের আগের জীবনের চেয়ে খারাপ পর্যায়ে রয়েছে।

খাদ্যের উৎস: মেয়েরা সাধারণত রান্না করে খায়, তাই তাদের খাদ্য তুলনামূলক সতেজ ও স্বাস্থ্যসম্মত হয়। অন্যদিকে ছেলেরা তাদের খাবার কিনে খেতে বেশি পছন্দ করে, তাই তাদের খাদ্য অস্বাস্থ্যকর হওয়ার সম্ভবনা বেশি থাকে।

গ্যাস্ট্রিক: এটা একটা অভিন্ন সমস্যা, যেটা প্রতিটা অংশগ্রহণকারীর মধ্যেই লক্ষ্য করা গেছে। এর একটি কারণ হচ্ছে, প্রথমবারের মতো অনেকেই বাসার বাইরে থাকতে আসে এবং তাদের খাদ্যাভ্যাসে একটি বিশাল পরিবর্তন আসে। হঠাৎ পাওয়া স্বাধীনতা শিক্ষার্থীদের তারুণ্যের নিয়ম ভাঙ্গার প্রবণতার দিকে আকৃষ্ট করে। ফলে যথাসময়ে খাবার গ্রহণ কিংবা স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য নির্বাচন থেকে দূরে থাকে।

শিক্ষার্থীদের খাদ্যতালিকায় আরো অনেক বিষয়ের প্রভাব রয়েছে। যেমন- খাদ্যের রুচি, খাদ্যের দাম, পারিবারিক নিয়ম, সামাজিক অবস্থান, পরিবেশের প্রভাব, সহজলভ্যতা, জীবনযাত্রার অভ্যাস, ক্যান্টিনের খাবারের মান, একাডেমিক বা অন্যান্য পরীক্ষা ইত্যাদি।

খাবারের স্বাদ: শিক্ষার্থীদের মতে খাবারের স্বাদের একটা ভূমিকা আছে, যেটার কারণে তারা অনেক সময়ই স্বাস্থ্যকর খাদ্য নির্বাচন করতে পারে না।

খাদ্যের দাম: খাদ্যের দাম একটা ভূমিকা পালন করে খাদ্য নির্বাচনে। ছেলেরা আবার চা ও ধুমপানের পেছনে বেশি অর্থ ব্যয় করে।

আবাসিক রুমের পরিবেশ: মেয়েরা সাধারণত রুমে একত্রে রান্না করে খায় যা অবশ্যই স্বাস্থ্যসম্মত। যে সুযোগ সাধারণত ছেলেদের হলগুলোতে নেই।

শিক্ষার্থী সংসদ: এটা মূলত শিক্ষার্থীদের চা ও ধূমপানের অভ্যাসে ভূমিকা রাখে। টিএসসি, হাকিম চত্বর, সামাজিক বিজ্ঞান চত্বর প্রভৃতি জায়গার আড্ডাগুলোতে চা ও

ধুমপান একটি বড় অংশ দখল করে থাকে।

পরীক্ষা: এই সময় সবারই খাদ্যাভাসে পরিবর্তন আসে। তাদের খাদ্য কম খাওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। কিন্তু এই সময়ই যথেষ্ট পুষ্টিকর খাবার প্রয়োজন।

খাদ্য নির্বাচন: খাদ্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে সবাই যে জিনিসটির উপর জোর দেয় তা হল, 'টেস্ট বা স্বাদ'। তবে তাদের তথ্য অনুযায়ী ক্যান্টিনের খাবার টেস্টলেস বা স্বাদহীন।

ধূমপান: ছেলেদের মধ্যে এই অভ্যাসটা বেশি লক্ষ্য করা যায়। ছেলেদের আবাসিক হলে তারা মদ্যপানও করে থাকে।

সামাজিক সহযোগিতা: পারস্পারিক সহযোগিতার মাধ্যমে মেয়েরা রান্না করে খাচ্ছে অপরদিকে ছেলেরা একসাথে বাইরে খেতে যাচ্ছে। এর প্রভাব তাদের খাদ্যে পড়ে।

অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ: মেয়েরা সাধারণত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের কারণেই ডাইনিংয়ের খাবার পরিহার করে। হলের রান্নাঘর খুব অস্বাস্থ্যকর এবং বিড়াল সারাক্ষণ ঘোরাঘুরি করে এবং খাবারের মধ্যে বিভিন্ন পোকামাকড় পাওয়া যায়। যেটা ফুড পয়জনিংয়ের একটা অন্যতম কারণ।

তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

বিভিন্ন দিক বিচার করলে স্বাস্থ্যকর খাদ্য নির্বাচন অনেকক্ষেত্রেই কঠিন হয়ে পড়ে। শিক্ষার্থীরা মূলত সেসব খাদ্য বেশি নির্বাচন করে যা দ্রুত, সহজলভ্য ও কম দামে পাওয়া যাবে। তারা স্বাস্থ্যের দিকে নজর কম দেয়। খাদ্য নির্বাচনে স্বাদ ও দামের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। শিক্ষার্থীদের মতে কম দামে স্বাস্থ্যকর খাবার পাওয়া যাওয়া উচিত। শিক্ষার্থীদের এই অবস্থা ব্যাখ্যা করা যায় Ajzen's Theory of planned behaviour এর মাধ্যমে। এই থিওরিতে জোর দেওয়া হয় শিক্ষার্থীদের ইচ্ছার ওপর। কেননা একজন শিক্ষার্থী যদি চায় যে সে কম দামে স্বাস্থ্যকর খাবার খাবে তাহলে শাক সবজি ও ফলমূলের দাম কম এবং স্বাস্থ্যসম্মত; কিন্তু তারা এটা খাচ্ছে না। সুতরাং এটা নির্ভর করছে তাদের ইচ্ছার ওপর।

এই Theory of planned Behaviour of Ajzen's (১৯৮৮, ১৯৯১) আমাদের বুঝতে সাহায্য করে যে আমরা কীভাবে একটা মানুষের ব্যবহার পরিবর্তন করতে পারি। এই থিওরির মূল বক্তব্য হল, আমাদের ব্যবহার হচ্ছে আমাদের ইচ্ছার প্রকাশ। আমাদের ইচ্ছা আমাদের ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রণ করে। একজন শিক্ষার্থী যদি চায় যে সে স্বাস্থ্য সম্মত খাবারই গ্রহণ করবে তবে যে কোনো পরিস্থিতিতে সে তা চেষ্টা করবে। সুতরাং স্বাস্থ্যকর খাদ্য গ্রহণে আমাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছার ভূমিকা অনেক।

অন্যান্য স্বাস্থ্যবিষয়ক থিওরি যেমন- Social Cognitive Theory (SCT) of Bandura (১৯৬১) and the Social Ecological Model (SEM) by Urie Bronfenbrenner (১৯৮০) এর মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে, আমাদের খাদ্যাভাসে আমাদের পরিবেশের ভূমিকা আছে। অর্থাৎ আমাদের খাদ্যের অভ্যাস এবং ধরন আমাদের পরিবেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আমাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছা,

পরিবেশের প্রভাব ও আমাদের আচরণের মধ্যে পারস্পারিক সম্পর্ক বিদ্যমান। পরিবেশের বিভিন্ন দিক মানুষের আচরণে প্রভাব ফেলে। এটা আমাদের ঘরের বাইরের পরিবেশে খাদ্যাভাস বোঝার জন্য জরুরি। বাড়িতে সাধারণত মায়ের শাসনে স্বাস্থ্যকর খাদ্য গ্রহণ করতে বাধ্য হয়, তবে বিশ্ববিদ্যালয়ে সে পরিবেশ নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ে আবাসিক হলে খাদ্য গ্রহণের বিষয়ে আরো অনেক বিষয় ভূমিকা রাখে, যার ফলে স্বাস্থ্যকর খাদ্য গ্রহণ করা কষ্টকর হয়। এর পেছনে সামাজিক কারণের পাশাপাশি মানসিক কারণও রয়েছে।

শিক্ষার্থীদের মতে, বাড়িতে তাদের খাদ্যের চিন্তা সাধারণত তাদের মায়েরা করেন। পরিবারে ছেলেরা সাধারণত মায়ের ওপর বেশি নির্ভরশীল হয়। তাই আবাসিক হলে এসে তাদের খাবার কিনে খেতে হয় এবং তারা অসহায় বোধ করে। অন্যদিকে মেয়েরা সাধারণত পরিবারে রান্নার কাজে মায়েদের সাহায্য করে এবং রান্না সম্পর্কে ধারনা পায়, তাই আবাসিক হলে এসে তারা রান্না করে খেতে পারে যা তুলনামূলক স্বাস্থ্যকর।

পরিবার ছাড়াও বন্ধুবান্ধবরা খাদ্যাভ্যাসে ভূমিকা রাখে। ছেলেরা এক জায়গায় হলে কেনা খাবার বেশি পছন্দ করে এবং ধুমপানের প্রবণতা তাদের মধ্যে বেশি লক্ষ্য করা যায়। অন্যদিকে মেয়েরা একসাথে হলে রান্না করে যা স্বাস্থ্যকর।

আবাসিক হলে থাকার কারণে বিভিন্ন ফাস্ট ফুড যেমন নুডুলস, চিপস, কেক, চকলেট, আইসক্রিম এসব খাওয়ার প্রবণতা বেশি দেখা যায় যা বাসায় থাকলে কম হয়। সবজি আর ফল খাওয়ার প্রবণতাও শিক্ষার্থীদের মধ্যে খুবই কম। পরীক্ষার সময় শিক্ষার্থীরা খাদ্যের পেছনে সবচেয়ে কম সময় ব্যয় করে।

শিক্ষার্থীদের অস্বাস্থ্যকর খাদ্য নির্বাচনে এবং স্বাস্থ্যগত অবনতির পেছনে হলের ক্যান্টিন/ডাইনিংয়ের ভূমিকা রয়েছে। এই গবেষণায় দেখা গেছে বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্যান্টিন/ডাইনিংয়ে স্বাস্থ্যকর খাবারের সংখ্যা কম। ক্ষুদ্রতর পরিবেশ যেমন ক্যাম্পাস, বাড়ি এসব জায়গায় আমাদের ব্যক্তিগত আচরণ আমাদের বৃহত্তর পরিবেশ যেমন সামাজিক অবস্থান ও আচরণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

আলোচনা

এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পুষ্টিগত অবস্থান ও পার্থক্য সনাক্ত করা। আমি মূলত জানতে চেয়েছিলাম তাদের খাদ্য গ্রহণ পদ্ধতিটা কেমন। ছেলে-মেয়ে উভয় শিক্ষার্থীই পুষ্টিগত সমস্যায় ভুগছে। ছেলেরা মেয়েদের থেকে বেশি অসুখে পড়ে এবং মেয়েদের তুলনায় কম পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ কররে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের একমাত্র উদ্দ্যেশ্য ক্ষুধা নিবারণ করা। ছেলেরা চা সিগারেটে বেশি আসক্ত হয় তবে মেয়েদের মধ্যেও চা পানের প্রবণতা দেখা যায়। ছেলেরা বিভিন্ন খেলাধুলা বা শারীরিক পরিশ্রম বেশি করে বিধায় তাদের ক্যালরি বেশি খরচ হয়।

মেয়েদের অবস্থাও খুব ভালো নয়। পিরিয়ডের সময় তাদের অতিরিক্ত পুষ্টিকর খাবার দরকার হয় যা তারা পায় না। রান্নার করার মত শারীরিক ও মানসিক অবস্থা তার নাও থাকতে পারে।

হতাশাজনক বিষয় হচ্ছে শিক্ষার্থীরা তাদের নিজেদের স্বাস্থ্যগত ব্যাপার সম্পর্কে সচেতন নয়। তারা তাদের স্বাস্থ্যগত দিকে কোনো গুরুত্ব দিচ্ছে না। ফলে দুর্বল স্বাস্থ্যের জন্য তারা পড়াশোনায় পিছিয়ে পড়তে পারে এবং তাদের পরবর্তী জীবনেও এর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে। বিশেষ করে মেয়েদের গর্ভকালীন সময়ে এর প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। যা শুধু এই প্রজন্ম নয় বরং পরবর্তী প্রজন্মের জন্যও ক্ষতিকর।

ছেলে-মেয়ে উভয় শিক্ষার্থীরই ডাইনিং-ক্যান্টিনের খাবার সম্পর্কে মতামত অভিন্ন। তাদের অভিযোগ হচ্ছে, ক্যান্টিনের খাবার অস্বাস্থ্যকর ও স্বাদ বাজে। তাই তারা এসব খাবার এড়িয়ে চলে। তারা খাবারের মান নিয়ে মোটেই সন্তুষ্ট নয়।

এই গবেষণাটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজনীয়। তারা তাদের স্বাস্থ্যগত অবস্থা সম্পর্কে সচেতন হবে এবং পুষ্টিকর খাবারের অভ্যাস গড়ে তুলতে পারবে।

তথ্যসূত্র

১. Ro, Hee-Kzung. “Gender Differences in Physical Activity, Dietary Habit and Nutrient Intake of Upper Grade Students in Elementary School.” Preventive Nutrition and Food Science, vol. 8, no. 4, 2003, pp. 401–405., doi:10.3746/jfn.2003.8.4.401.

২. “Indicator D6: How Can Parents Influence the Education of Their Children?” doi:10.1787/888932310567.

৩. Sakamaki, Ruka, et al. “Nutritional Knowledge, Food Habits and Health Attitude of Chinese University Students –a Cross Sectional Studz–.” Nutrition Journal, vol. 4, no. 1, 2005, doi:10.1186/1475-2891-4-4.

৪. Gropper, Sareen S., et al. “Changes in Bodz Weight, Composition, and Shape: a 4-Year Studz of College Students.” Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism, vol. 37, no. 6, 2012, pp. 1118–1123., doi:10.1139/h2012-139.

৫. Small, Meg, et al. “Changes in Eating and Physical Activity Behaviors Across Seven Semesters of College.” Health Education & Behavior, vol. 40, no. 4, 2012, pp. 435–441., doi:10.1177/1090198112467801.

খাদিজা তাহেরা তরী
শিক্ষার্থী, উইমেন এন্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
সদস্য, জেন্ডার এন্ড ডেভেলপমেন্ট টিম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা সংসদ।

ছাত্ররাজনীতি এবং ছাত্রসংগঠনসমূহের ওপর একটি পর্যালোচনা

পলিটিক্স টিম*

ছাত্ররাজনীতি রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড যার মধ্য দিয়ে ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব বিকশিত হয়। বর্তমান সময়ে আমাদের দেশের প্রেক্ষিতে ছাত্ররাজনীতি বৃহৎ রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর কিছু বিতর্কিত কর্মকাণ্ডের জন্য জনমানুষের পরিপূর্ণ আস্থা অর্জনে সক্ষম হয়নি। ছাত্ররাজনীতিই জাতির পরবর্তী নেতৃত্ব তৈরি করে দেয়। ছাত্ররাজনীতিতে পরিচ্ছন্ন এবং সৎ নেতৃত্ব তৈরি হলে সেটি দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি এবং কাঠামো পরিবর্তনে সক্ষম।

ছাত্ররাজনীতির ধারণা

রাজনীতিকে আদর্শিকভাবে বলা হয়ে থাকে- দেশের কল্যাণে সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত রেখে ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধ্বে থেকে সর্বদা হীনস্বার্থের বিরুদ্ধে অবস্থান করা। যখন বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে সেটাকে ছাত্ররাজনীতি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

ছাত্ররাজনীতি হওয়া উচিৎ সবার কল্যাণের জন্য।শিক্ষার্থীদের কল্যাণ, তাদের দাবি-দাওয়া তুলে ধরা এবং তাদের সমস্যার সমাধানই হওয়া উচিৎ ছাত্ররাজনীতির মূল উদ্দেশ্য। এভাবে করেই ছাত্ররাজনীতি থেকে ভবিষ্যতে মূল ধারার রাজনীতির নেতারাও ওঠে আসবে।

বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে ছাত্ররাজনীতি সম্পর্কে খুবই নেতিবাচক ধারণা বিদ্যমান। তারা মনে করে মেধাবী ছাত্রদের রাজনীতিতে জড়ানো একটি ভুল সিদ্ধান্ত। ক্ষমতায় যাবার জন্য পেশিশক্তি হিসেবে ছাত্ররাজনীতি এক প্রতিশব্দ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং অন্যায়-অনৈতিক কাজের জন্য মুখোশ হয়ে পড়েছে এটি। এমনকি সাধারণ ছাত্রদের ভেতরেও ছাত্ররাজনীতি নিয়ে প্রচুর অনাকাঙ্ক্ষা রয়েছে। অথচ বাংলাদেশের ছাত্ররাজনীতির রয়েছে গৌরবময় ইতিহাস।

বিশ্বব্যাপী উন্নত দেশগুলোতে ছাত্ররাজনীতির ধারণা আমাদের দেশ থেকে তুলনামূলকভাবে ভিন্ন। তারা ছাত্ররাজনীতি বলতে বোঝে, মূল ধারার রাজনীতিবিদদের সঙ্গে রাষ্ট্রপরিচালনা বিষয়ক কর্মকাণ্ডে ছাত্রদের সম্পৃক্ততা। একবিংশ শতাব্দীর রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে পাঠ্যসূচির পরিবর্তন আনায় ছাত্রদের ভূমিকা; তাদের শিক্ষা, চিন্তা ও দক্ষতা দ্বারা তাদের ছাত্ররাজনীতি প্রভাবিত হয়েছে। মোদ্দাকথা দাঁড়ায় যে, তারা চায় ছাত্ররাজনীতির ফলাফল হিসেবে দক্ষ নীতিনির্ধারক এবং মূলধারার রাজনীতির উত্তম নেতা তৈরি হোক।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫০তম সমাবর্তনে বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ বলেন, "ছাত্ররাজনীতির বর্তমান হালচাল দেখে মনে হয় যে, এখানে আদর্শের চেয়ে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী স্বার্থের প্রাধান্য বেশি।"

বর্তমানে দেশের ছাত্ররাজনীতির প্রেক্ষাপট বিবেচনা করলে দেখা যায়, সাধারণ মানুষের ধারণা সম্পূর্ণ ভুল নয়। এখন যেন ছাত্ররাজনীতি ছাত্রদের বা দেশের কল্যাণের জন্যে নয়। বরং ব্যক্তি স্বার্থ উদ্ধার করা, মূলধারার রাজনীতিতে যাবার পথ প্রশস্ত করা, পেশিশক্তি দ্বারা শিক্ষাঙ্গনে প্রভাব বিস্তার, হল দখল, টেন্ডারবাজি, বিরোধী দলকে দমিয়ে রাখাই সমকালীন ছাত্ররাজনীতির উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদিও আমাদের দেশের ইতিহাস থেকে পরিলক্ষিত হয় যে '৫০ ও '৬০ এর দশকের বিভিন্ন আন্দোলন এবং '৯০ এর স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন ছিল আদর্শ ছাত্ররাজনীতির বহিঃপ্রকাশ, সেসকল দিন আজ শুধুই অতীত।

উন্নত দেশগুলো আদর্শ রাজনীতির ধারা বজায় রেখেছে। যুক্তরাজ্যের ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনৈতিক ছাত্রসংগঠন- উইলবারফোর্স সোসাইটি, আফ্রিকান দেশ তিউনিশিয়ার সংবিধান তৈরিতে সহায়তা করে। এছাড়াও তারা ক্যামব্রিজ এলাকার বাস্তুহারাদের পুনর্বাসনে এবং যুক্তরাজ্যের বিবাহবিষয়ক নীতি প্রনয়নেও ভূমিকা রাখে; তারা গবেষণাধর্মী সংগঠন- BDMF এর সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করেছে রাজনীতির ওপর বৈজ্ঞানিকদের প্রভাব সম্পর্কে।

বহিঃবিশ্বের কয়েকটি ছাত্রসংগঠন পর্যালোচনা

ছাত্ররাজনীতির ধারণা পৃথিবীর অনেক দেশেই রয়েছে। তবে বহিঃবিশ্বের ছাত্রসংগঠনগুলো তুলনামূলকভাবে আমাদের দেশের থেকে কম সক্রিয় এবং ভিন্নতর। এজন্যই আন্তর্জাতিক ছাত্রসংগঠনগুলোর কর্মপরিধি সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখা প্রয়োজন। কারণ ছাত্ররাজনীতির সূচনা হয়েছিল বিশ্ববিদ্যলয়ের সূচনালগ্ন থেকে। তেরো শতাব্দীতে প্যারিস ও বলোগনার শিক্ষার্থীরা আন্দোলন করেছিল। আন্তর্জাতিক ছাত্রসংগঠনগুলো মূলত শিক্ষার্থীদের সুযোগ-সুবিধা নিয়ে আলোচনা করে। নিম্নে এরকম কয়েকটি ছাত্র সংগঠন সম্পর্কে আলোকপাত করা হল।

চীন: চীনের শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন আন্দোলন ছিল মূলত চীনা জাতীয়তাবাদের জন্য। প্রথমে তারা চীনা জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় আফিম যুদ্ধের সময় কিং ডাইনেসটির বিরুদ্ধে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল। এছাড়াও শিক্ষার্থীরা গণতন্ত্র, আমেরিকাবিমুখী ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন সময়ে আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। যেমনটা দেখা যায় ১৯১৯ সালে পিকিং ইউনিভার্সিটির আন্দোলনে।

ফ্রান্স: ফ্রান্সের শিক্ষার্থীরাও তাদের এবং দেশের মানুষের অধিকার আদায়ে সোচ্চার ছিল সর্বদা। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, ১৯৬৮ সালের পুঁজিবাদ, ভোগভাগ ও আমেরিকার কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলা। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে 'দ্যা ন্যাশনাল ইউনিয়ন অব স্টুডেন্টস অব ফ্রান্স' নামক সংগঠন।

জাপান: জাপানি ছাত্র-ছাত্রীদের সাংগঠনিক আন্দোলন সর্বপ্রথম দেখা যায় সম্রাট তিয়াসের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সময়; যাকে বলা হয় Tiasho Democracy।

সম্রাট তিয়াসের অত্যাচারের বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীগণই সবচেয়ে বেশি সোচ্চার ছিল। বিশ্বযুদ্ধের পর বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ বাড়তে থাকে। এমনকি ১৯৬৮ সালে বামপন্থিদের একটি আন্দোলনে পুলিশের সঙ্গে তাদের সশস্ত্র সংঘর্ষও হয়। এছাড়াও ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরুদ্ধে, বর্ণ বৈষম্যের বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীরা সোচ্চার ছিল।

ভারত: ভারত উপমহাদেশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, স্বদেশী আন্দোলন, বঙ্গভঙ্গ, অসহযোগ আন্দোলন, ভারত ছাড় আন্দোলন ও ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে বিদ্রোহীদের অগ্রণী অংশগ্রহণ ছিল। এছাড়াও ১৯৭৯-১৯৮৫ সালে আসামে অবৈধ নাগরিকের বিরুদ্ধে আন্দোলনে 'All Asam Student Union' (AASU) এবং 'All Asam Gana Sangram Parishad' (AAGSP) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বাংলাদেশের ছাত্ররাজনীতি

বাংলাদেশের ছাত্রসমাজের সোনালি অতীত ইতিহাস পৃথিবীতে অনন্য। পঞ্চাশের দশকে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশ বিভক্ত হওয়ার পর তৎকালীন ছাত্রসমাজের অনেকেই ছাত্ররাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। স্বাধীনতাপূর্ব ছাত্ররাজনীতির উদ্দেশ্য ছিল, ছাত্রসমাজ এবং পূর্ব পাকিস্তানের কল্যাণ সাধন। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে তৎকালীন ছাত্ররাজনীতির প্রধান লক্ষ্য ছিল পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন এবং পরবর্তীতে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুত্থান। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে ছাত্রসমাজের আত্মবিসর্জন আমাদেরকে দিয়েছিল রাষ্ট্রভাষার সম্মান। প্রকৃতপক্ষে ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ সালেই রচিত হয়েছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রথম কবিতা।

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে ছাত্রসমাজই প্রথমে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মুক্তিযুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়েছিল। মুক্তিযুদ্ধে সারা বাংলার ছাত্রসমাজের ভূমিকা অনস্বীকার্য এবং তাদের এই আত্মত্যাগ পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন সংকটে ছাত্রদের অনুপ্রাণিত করেছে।

১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলনে ছাত্রসমাজ অনুঘটকের ভূমিকা পালন করেছিল। 'শিক্ষা আন্দোলন' হিসেবে বহুল পরিচিত এ আন্দোলন রাজনৈতিক দিক থেকেও ইতিহাসে অপরিসীম গুরুত্বের দাবিদার। শিক্ষাক্ষেত্রে চরম বৈষম্যের বিরুদ্ধে উক্ত আন্দোলনের নেতৃত্ব এবং দায়িত্ব ছাত্রদের উপর বর্তায়।

নব্বইয়ের দশকে স্বাধীন বাংলাদেশ এক সংকটপূর্ণ সময় অতিবাহিত করছিল। বাংলাদেশের ঘাড়ে ভর করছিল স্বৈরাচারী শাসক। সেই সময়ে স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে নূর হোসেন বুকে 'স্বৈরাচার নিপাত যাক, গণতন্ত্র মুক্তি পাক' শ্লোগান লিখে রাস্তায় নামলে পুলিশের গুলিতে তিনি শহিদ হন। নূর হোসেন ছিলেন ছাত্রসমাজের প্রতিনিধি। এরকম অসংখ্য নূর হোসেনের ত্যাগ-তিতিক্ষার ফলশ্রুতিতে স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের পতন হয়েছিল। শুরু হয়েছিল সংসদীয় গণতান্ত্রিক সরকারের যাত্রা।

২০০৬ সালে বিএনপি সরকার ক্ষমতা ছাড়লে তত্ত্বাবধায়ক সরকার দুই বছর রাষ্ট্র পরিচালনা করে। এ সময় ২০-২২ আগস্ট ২০০৭ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-সেনা

সংঘর্ষ হয়। ছাত্রদের প্রতিরোধের মুখে সেনা সদস্যরা ক্যাম্পাস ছাড়তে বাধ্য হয়। বাংলাদেশের আপামর ছাত্রসমাজের ন্যায্য দাবী প্রথম শ্রেণির চাকরিতে বিদ্যমান কোটা সংস্কারের দাবিতে ২০১৮ সালের এপ্রিল মাসে সারাদেশ উত্তাল হয়ে উঠে। প্রধানমন্ত্রী মহান জাতীয় সংসদে দাঁড়িয়ে কোটা বিলুপ্তির ঘোষণা দিলে আন্দোলন সাময়িকভাবে স্তিমিত হয়। পরবর্তীতে পুনরায় আন্দোলন এবং ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে জাতীয় সংসদে ১ম ও ২য় শ্রেণির চাকরিতে কোটা বাতিল করা হয়।

তাছাড়া শহীদ রমিজ উদ্দিন কলেজের দুই ছাত্র নিহতের ঘটনায় সারাদেশে স্কুল-কলেজের ছাত্রদের নেতৃত্বে রাষ্ট্রসংস্কার তথা নিরাপদ সড়ক চেয়ে আন্দোলন প্রশাসনের চোখে আঙ্গুল দিয়ে সড়কপথে চলমান অনিয়ম-বিশৃঙ্খলা দেখিয়ে দেয়।

ইতিহাস বলে, বাংলাদেশের ছাত্রসমাজ কখনো ন্যায্য দাবি আদায়ে পিছপা হয়নি। ব্যর্থ হয়নি কোনো ছাত্র আন্দোলন। তাই বাংলাদেশে ছাত্র আন্দোলন প্রেরণার উৎস। যেকোনো অশুভ শক্তির যম। সুতরাং বাংলাদেশের ছাত্ররাজনীতিকরা এর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে দেশের যেকোনো সংকট মোকাবেলায় নিজেদের অতীত ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করতে পারেন।

বাংলাদেশের প্রধান ছাত্রসংগঠনসমূহ

বাংলাদেশ ছাত্রলীগ

১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলের অ্যাসেম্বলি হলে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠা লাভ করে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে। প্রতিষ্ঠাকালে এর নাম ছিল 'পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ'। বাংলাদেশ ছাত্রলীগের উল্লেখযোগ্য অবদান হলো- ১৯৫২'র বাংলা ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪'র যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ১৯৬২'র শিক্ষার অধিকার, ১৯৬৬'র বাঙালির স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা, ১৯৬৯'র গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭১'র স্বাধীনতা ও স্বাধিকার আন্দোলন। শিক্ষা, শান্তি , প্রগতি শ্লোগানে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের রয়েছে অসংখ্য নেতা-কর্মী।

বাংলাদেশ ছাত্রদল

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এর ছাত্র সংগঠন। ১লা জানুয়ারী ১৯৭৯ সালে কেন্দ্রীয়ভাবে এই সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করেন সাবেক রাষ্ট্রপতি ও সেনাপ্রধান বীর উত্তম জেনারেল জিয়াউর রহমান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া কাজী আসাদকে আহ্বায়ক করে ছাত্রদলের প্রথম কমিটি ঘোষণা করা হয়। ছাত্রদলের শ্লোগান হচ্ছে - শিক্ষা, ঐক্য, প্রগতি। নব্বইয়ের স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে সংগঠনটি ভূমিকা রাখে।

ইসলামী ছাত্রশিবির

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির বাংলাদেশের একটি ইসলামভিত্তিক রাজনৈতিক ছাত্রসংগঠন। ১৯৭৭ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে শিবির প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন মীর কাশেম আলী এবং প্রতিষ্ঠাকালীন দলটির

সদস্য ছিলো মাত্র ছয় জন। সংগঠিত হওয়ার পর সংগঠনটি দ্রুততম সময়ের মধ্যে গ্রাম-গঞ্জে ছড়িয়ে পড়ে। যুদ্ধাপরাধের দায়ে অভিযুক্ত জামায়াতের ছাত্রসংগঠন হওয়ায় বর্তমানে তারা বেশ সমালোচিত।

বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন

বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন ১৯৫২ সালের ২৬শে এপ্রিল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সংগঠনটি বিভিন্ন সময় বৈষম্যহীন, বিজ্ঞানভিত্তিক, অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল ধারার শিক্ষানীতির জন্য আন্দোলন করে থাকে । বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় সংগঠনটির নিজস্ব গেরিলা বাহিনী ছিল। ১৯৭৩ সালের ১লা জানুয়ারি এই সংগঠনের মতিউল ও কাদের নামের দুজন কর্মী আমেরিকা কর্তৃক ভিয়েতনাম আগ্রাসনের প্রতিবাদে ঢাকায় মিছিল করে। মিছিল চলাকালে পুলিশের গুলিতে মৃত্যুবরণ করায় ভিয়েতনাম তাদের জাতীয় বীরের মর্যাদা দিয়েছিল।

বাংলাদেশ ছাত্র মৈত্রী

মহান ভাষা আন্দোলনের রক্তাক্ত ইতিহাসের মধ্য দিয়ে স্বৈরাচার, সাম্রাজ্যবাদ, সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী প্রগতিশীল ছাত্র আন্দোলন সংগঠিত করার আহ্বান নিয়ে ১৯৫২ সালের ২৬ এপ্রিল গড়ে ওঠে তৎকালীন 'পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন'। তারই ধারাবাহিকতা এবং উত্তরাধিকারে গঠিত হয় 'বাংলাদেশ ছাত্র মৈত্রী'।

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট

১৯৮৪ সালের ২১ জানুয়ারি সামরিক স্বৈরাচারবিরোধী ছাত্র গণআন্দোলনের সময়ে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট আত্মপ্রকাশ করে। সংগঠনটির প্রতিষ্ঠালগ্নে ঘোষণা দিয়েছিল, শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ার লক্ষ্যে সর্বজনীন, বৈষম্যহীন, সেক্যুলার, বিজ্ঞানভিত্তিক, একই পদ্ধতির গণতান্ত্রিক শিক্ষার দাবিতে বাংলাদেশে ছাত্র আন্দোলন পরিচালনা করবে।

ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন

বাংলাদেশ ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন ১৯৮৭ সালে চরমোনাই পীর সৈয়দ রেজাউল করিমের তত্ত্বাবধানে প্রতিষ্ঠিত। সংগঠনটির উদ্দেশ্য- দুনিয়ায় শান্তি ও আখিরাতের মুক্তি লাভের জন্য আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন। সংগঠনটির মতে এর মূল লক্ষ্য, প্রচলিত জাহেলি সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করে ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়নের মাধ্যমে খেলাফতে রাশেদা নমুনায় বাংলাদেশকে একটি কল্যাণরাষ্ট্রে পরিণত করা।

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র মজলিশ

৫ জানুয়ারি বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র মজলিসের প্রতিষ্ঠা দিবস। ১৯৯০ সালের এই দিনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ থেকে এই সংগঠনের যাত্রা শুরু হয়। জ্ঞান অর্জন, চরিত্র গঠন ও ইসলামী সমাজ বিপ্লবের দীপ্ত শপথে উজ্জীবিত একদল তারুণ্যের 'আমরা নীরব হব না নিস্তব্ধ হব না, যতদিন আল কুরআনকে

সংবিধান পাব না' ঘোষণার মাধ্যমে এই কাফেলা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রতিষ্ঠার পর সংগঠনটি সকল ইসলামি আন্দোলন এবং জাতীয় আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছে।

সমাপনী

জাতীয় জ্ঞানকোষ বাংলাপিডিয়ায় ছাত্ররাজনীতি সম্পর্কে বলা হয়েছে, উনিশ শতকের গোড়ার দিকে ছাত্ররাজনীতি বাংলার রাজনীতিতে একটি নতুন মাত্রা যোগ করে। বিশ শতকের গোড়ার দিকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ছাত্রদের সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণে প্রণোদনা জোগায়। তবে জাতীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ সত্ত্বেও ১৯২৮ সালে কংগ্রেসের উদ্যোগে 'নিখিল বঙ্গ ছাত্র সমিতি' গঠিত হওয়ার আগে বাঙালি ছাত্রদের কোনো নিজস্ব সংগঠন ছিল না। ১৯৩০ সালের ১২ জুলাই ঢাকায় অনুষ্ঠিত মুসলিম ছাত্রদের একটি সম্মেলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. শহীদুল্লাহ্‌কে একটি মুসলিম ছাত্র সমিতি গঠনের দায়িত্ব দেয়া হয় এবং ১৯৩২ সালে নিখিলবঙ্গ মুসলিম ছাত্র সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর বিশেষত ১৯৪৮ সালে রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে জিন্নাহর ঘোষণার পর ওই বছর পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম স্টুডেন্টস লীগ গঠন করা হয়। এ বছরই শুরু হয় ভাষা আন্দোলন এবং তাতে নেতৃত্ব দেয় বাংলাদেশ ছাত্রলীগ। পরবর্তী সময়ে বিশেষভাবে নব্বইয়ের স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে দেশের প্রায় সকল ছাত্র সংগঠন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বাংলাদেশের ছাত্র সংগঠনগুলো যেকোনো অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার থাকবে এবং নিজেরাও অন্যায়-অবিচারকে প্রশ্রয় দেবে না এই প্রত্যাশা সাধারণ মানুষের। বাংলাদেশে সকল ছাত্র সংগঠনের গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণমূলক রাজনীতির মাধ্যমে সৎ ও দক্ষ আগামীর নেতৃত্ব তৈরি হবে এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বৈষম্যহীন সোনার বাংলা বিনির্মাণে ছাত্র সংগঠনগুলোর দায়িত্বশীল আচরণ অপরিহার্য।

* শবনুর এ জান্নাত, আব্দুল্লাহ আল রাশেদ, সাকিন তানভীর
মালিহা তাসনীম, মোঃ সোহাগ হোসেইন, মোঃ নাজমুল হোসেইন।

সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা এবং স্বতন্ত্র সত্তা বিশ্বায়নের প্রবাহে ক্রমশ ম্রিয়মান হয়ে যাচ্ছে: পর্যবেক্ষণভিত্তিক পর্যালোচনা

ইতিহাস টিম*

তথ্য প্রযুক্তির অবাধ প্রবাহ এবং উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা বিশ্বব্যাপী বহুজাতি, বহু সংস্কৃতির পারস্পরিক আদানপ্রদানকে বহুতর সহজ করে দিয়েছে। বাঙালি গ্রামীণ সংস্কৃতির ভাষায়, সাহিত্যে, সংগীতে গুণগত এবং অর্থবহ পরিবর্তন মূলত এখানে সাংস্কৃতিক বিশ্বায়নের (ওভারগ, কালেভরো ১৯৬০) সুস্পষ্ট প্রভাবকেই চিত্রায়িত করে। বাঙালি জনপদের বাউল গান, জারিগান, পুঁথিপাঠের আসর এবং নবান্ন উৎসবের মতো আচারানুষ্ঠানগুলো পশ্চিমা ধাঁচের সংস্কৃতির অবাধ প্রবাহে বিলুপ্তপ্রায়।

উপস্থাপনা

বাঙ্গালি জাতির হাজার বছরের পুরানো সংস্কৃতি, বহু ঝড় ঝঞ্চার মধ্য দিয়েও তার স্বকীয়তা এবং স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ন রেখেছে। এসেছে আরব, তুর্কি, মুঘল পাঠান এবং ইংরেজ জাতি। কিন্তু এ জাতি স্বযত্নে তার মাতৃভাষা, সাহিত্য, সংগীত ,জারি গান, পালা গানের চর্চা অব্যহত রেখেছে। পাকিস্তানের অন্যায্য দাবি প্রত্যাখ্যান করে বুকের রক্ত দিয়ে রক্ষা করেছে প্রাণের ভাষা, সংস্কৃতির অধিকার। সত্তরের দশক পরবর্তী বিশ্বব্যাপী তথ্য প্রযুক্তির বিকাশ এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভূত উন্নয়নের ফলে সমগ্র বিশ্ব এক নতুন ছায়াতলে নিজেদের আবিষ্কার করে; তা হলো-বিশ্বগ্রাম (মার্শাল ম্যাকলুহান ১৯৬২)। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রথা, ঐতিহ্যের মিশ্রন বিশ্বসমাজকে এক অভিন্ন সংস্কৃতির দিকে ধাবিত করে। তবে বিপরীতে সূচিত হয় বিভিন্ন সংস্কৃতির স্বকীয়তার অবক্ষয়। বর্তমান গবেষণা মূলত আমাদের নিজ গ্রামের মানুষদের সাংস্কৃতিক আচরণগত এবং প্রথাগত পরিবর্তনের ওপর প্রস্তুতকৃত একটি পর্যবেক্ষণ। তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে আরো অধিক সংখ্যক অংশগ্রহণকারীর তথ্য গবেষণাটিকে আরো সুসংগঠিত এবং সমৃদ্ধ করতে পারত। বর্তমান গবেষণায় এটিই ছিল আমাদের সীমাবদ্ধতা।

সংজ্ঞায়ন:

- সংস্কৃতি: সমাজের সদস্য হিসেবে মানুষের অর্জিত জ্ঞান, বিশ্বাস, শিল্পকলা, নৈতিকতা, আইন, রীতিনীতি এবং অন্য যেকোনো দক্ষতা ও অভ্যাসের জটিল সমষ্টিই হলো সংস্কৃতি। সংস্কৃতির বস্তুগত অবস্তুগত দুই ধরনের উপাদান আছে।
- বিশ্বায়ন: বিশ্বায়ন প্রতিটি দেশ বা অঞ্চলের বৈশ্বিকভিত্তিতে অন্যান্য দেশ বা অঞ্চলের সঙ্গে একীভূত করার প্রক্রিয়া। বহুমুখী এ প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে অর্থনৈতিক, কারিগরি, সামাজিক ও কৃষ্টি এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রাবলি (জোসেফ ই. স্টিগলিজ ২০০৩)।
- সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য: একটি দেশের ভৌগোলিক কাঠামো, ঐতিহাসিক পটভূমি, প্রাকৃতিক গঠন এবং আবহাওয়ার ওপর ভিত্তি করে সংস্কৃতির যে উপাদানগুলো গড়ে

ওঠে তাই 'সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য' (কে, জে টরেনলি এবং এন, জে অলসন ২০১৭)

অনুমিত সিদ্ধান্ত

অত্র গবেষণায় বিভিন্ন মাধ্যমিক তথ্যের বিশ্লেষণ করে অনুমিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, বিশ্বায়ন আমাদের সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা এবং স্বাতন্ত্র্যকে হুমকির মুখে ফেলে দিয়েছে।

পদ্ধতি

এটি একটি ব্যাখ্যাধর্মী গবেষণা। এ গবেষণায় তথ্যসংগ্রহে আমরা অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি বেছে নিয়েছি। আর গবেষণার ক্ষেত্র হিসেবে আমরা নোয়াখালী জেলার সেনবাগ উপজেলার বীরনারায়নপুর গ্রাম এবং ওই এলাকায় বসবাসরত ৫০ জন মানুষকে পর্যবেক্ষণের আদিষ্ট জনগণ হিসেবে বাছাই করেছি। প্রথমত আমরা পর্যবেক্ষণ কাঠামো প্রস্তুত করতঃ বিভিন্ন নির্দেশক স্থির করে অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম চালিয়েছি। পরবর্তীতে তথ্যের নির্ভরতা বৃদ্ধির প্রয়াসে বিভিন্ন মাধ্যমিক তথ্যের সাহায্য নিয়ছি। তথ্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আমরা গুণবাচক গবেষণা পদ্ধতি অবলম্বন করেছি।

প্রাপ্ত তথ্য

অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ এবং পর্যালোচনা পরবর্তীতে গবেষকগণ গ্রাম-বাংলার জীবনযাত্রার বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করেন। এ ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ কাঠামোতে নির্দেশিত নির্দেশকগুলির ওপর পর্যবেক্ষণের প্রাপ্ত বিবরণী প্রদত্ত হলো-

সমাজ কাঠামোয় আমূল পরিবর্তন

গ্রাম-বাংলার প্রাচীন সমাজব্যবস্থা, যেখানে সমাজের গণ্যমান্য মোড়লদের মাধ্যমে সমাজ পরিচালিত হতো। বর্তমানে সে ব্যবস্থায় ধ্বস নেমেছে। বহুধা বিভক্ত সমাজ আজ সামাজিক প্রথা, রীতি-নীতির উর্ধ্বে উঠে ক্রমশই মানুষ আত্মকেন্দ্রিক হয়ে উঠছে।

ভাষা

ভাষা ক্রমশই পরিবর্তনশীল। বিশ্বায়নের প্রভাবে ক্রমশই অধিকাংশ ছাত্র ছাত্রী, চাকরিজীবী ইংরেজি ভাষার দিকে ধাবিত হচ্ছে। বিভিন্ন ভাষার বিদেশি শব্দ বাংলা ভাষায় মিশে যাচ্ছে।

বসতি ও নৃতত্ত্ব

সম্প্রতি গবেষণাপত্রের একজন গবেষক নিজ এলাকায় রোহিঙ্গা অভিবাসীদের খোঁজ পান। অনেক সংখ্যালঘু এবং অনেক ভাগ্যান্বেষী মানুষ এলাকা ছেড়ে চলে যাচ্ছে দেশে বিদেশে, যা মূলত নৃতাত্ত্বিক পরিবর্তন সম্ভব করেছে।

সাহিত্য

এক সময় এ দেশীয় সাহিত্যের বিষয়বস্তু ছিল পৌরাণিক, রাজা বাদশাহের স্তুতি এবং ধর্মকেন্দ্রিক। কিন্তু বর্তমানে বিশ্বায়নের ফলে সাহিত্যে কিয়দাংশ বস্তুবাদী আবার

অনেকাংশেই যৌনলিপ্সা নির্ভর হয়ে পড়েছে।

সংগীত, নাটক, থিয়েটার

এক সময় চিত্তবিনোদনের মাধ্যম হিসেবে যাত্রাগান, জারি গানের আসর, পুঁথি পাঠ এবং বিভিন্ন লোকগীতি, বাউল গানের আসর বসত। কিন্তু বর্তমানে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার অবদানে অধিকাংশ মানুষ হলিউড, বলিউড প্রভৃতি ধারার নিত্যনতুন র‍্যাপ সং, থিম সং এবং আইটেম সং এর সাথে অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছে।

পোশাক পরিচ্ছদ

এদেশের মানুষের পোষাক ছিল লুঙ্গি, ধুতি, পাঞ্জাবি এবং নারীদের শাড়ি। বিশ্বায়ন বর্তমানে আমাদের অভ্যস্ত করিয়েছে শার্ট, প্যান্ট, স্যুট-টাই এবং মেয়েদের সেলোয়ার কামিজ। আর অন্যদিকে খড়মের বদলে স্থান করে নিয়েছে সু এবং বাহারি নকশার জুতো।

খাদ্যাভ্যাস

মাছে ভাতে বাঙ্গালি একসময় ঘি ভাত, মাখন, মিষ্টান্ন সন্দেশ, বিভিন্ন জাতের পিঠা এবং বিভিন্ন উপলক্ষে মাংসের ব্যবস্থা করত। কিন্তু বর্তমানে মানুষ মাংস-ভাত প্রধান অবলম্বন ধরে। মাংসের বিভিন্ন ধরনের রান্না যেমন- চিকেন ফ্রাই, কাবাব, ভুনা মাংস ইত্যাদি খেতে পছন্দ করে। ফাস্টফুড জাতীয় খাবার এবং কোমল পানীয় এখন নিত্যসঙ্গী হয়ে উঠছে।

শিক্ষাব্যবস্থা

পাঠাগার, পাঠশালা, মসজিদ, মক্তবকেন্দ্রিক পড়াশোনায় অভ্যস্ত মানুষ ধীরে ধীরে ইংরেজি এবং আধুনিক শিক্ষাকেন্দ্রগুলোর দিকে ধাবিত হচ্ছে। শিক্ষককেন্দ্রিক পড়াশোনা বর্তমানে আমূল পরিবর্তিত হয়ে প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক পড়াশোনা পদ্ধতি চালু হয়েছে। ধর্ম, নৈতিকতা, জাতীয় গৌরব এবং ঐতিহ্যকেন্দ্রিক শিক্ষা পাঠক্রম বর্তমানে বস্তুবাদী এবং তথ্য প্রযুক্তিকেন্দ্রিক হওয়ার মাধ্যমে বিলুপ্ত হয়েছে। বর্তমানে পশ্চিমা আদলে পাঠ্যপুস্তক রচনার হিড়িক পড়েছে।

বিশ্বাস ও প্রথা

বর্তমানে তথ্যের অবাধ প্রবাহ গ্রামবাসীর মনে আগের যে সামাজিক বিশ্বাস, মূল্যবোধ এবং প্রথা লক্ষ্য করা যেত, এখন পশ্চিমা জাগতিক/যান্ত্রিক বিশ্বাস সে স্থান দখল করেছে , যা পশ্চিমা সংস্কৃতির এবং প্রথার সুস্পষ্ট নমুনা।

পারিবারিক প্রথা

পরিবার হল সমাজের সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ মৌলিক সংগঠন। বর্তমানে পরিবারব্যবস্থা পশ্চিমা বিশ্বের যান্ত্রিক জীবনের আদলে এ দেশেও ক্রমশ হুমকির মুখে পড়ছে। স্বামী-স্ত্রী উভয়ের কর্মব্যস্ত জীবন এবং পারিবারিক সম্পর্কের প্রতি উদাসীনতা সাম্প্রতিককালে বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটনাকে অত্যন্ত সাধারণ করে তুলেছে। যাতে পরিবার ক্রমশ ছোট এবং একসময় ভেঙে যাচ্ছে।

আইন

গুণীজন, বয়স্ক, গ্রাম্য মোড়লদের নির্দেশনা, সামাজিক মূল্যবোধ, প্রথা এবং ধর্মীয় বিধি-নিষেধই একসময় আইনের মূল উৎস হিসেবে গণ্য হত। গ্রাম্য সালিশ, বৈঠক এবং ফতোয়ার মাধ্যমে বিচার হতো। বর্তমানে গ্রামীণ জীবনেও ফৌজদারি, দিওয়ানি বিধি নিষেধ এবং মানুষ ক্রমশই কোর্টকাচারিনির্ভর হয়ে যাচ্ছে।

ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য

ধর্মীয় কঠোর অনুশাসন, অনেক সময় গোড়ামি এবং কুসংস্কারে নিমজ্জিত ছিল আমাদের গ্রামীণ জনপদ। বিশ্বায়ন বর্তমানে কুসংস্কার এবং গোড়ামি দূর করার পাশাপাশি ধর্মীয় অনুশাসনকেও নিরুৎসাহিত করে। যা মূলত অধর্মকে উৎসাহিত করছে।

ক্রীড়া

গোল্লাছুট, মুষ্টিযুদ্ধ, মোরগ লড়াই, ইচিং বিচিং, লুকোচুরি, রুমালচুরি, হা-ডু-ডু ইত্যাদি খেলায় অভ্যস্ত জনপদ ক্রমশই ক্রিকেট, ফুটবল, বাস্কেটবল, টেবিল টেনিস, দাবা এবং সাম্প্রতিককালে শিশুরা ইলেকট্রনিক গেমস খেলায় আসক্ত হচ্ছে।

গণমাধ্যম

গ্রামীণ জনপদে কিছুকাল পূর্বেও মানুষ রেডিও জাতীয় টেলিভিশননির্ভর থাকত। কিন্তু বর্তমানে ডিস এন্টেনা সংযোগের ফলে মানুষ দেশীয় মাধ্যমের চেয়ে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম বিবিসি, সিএনএ, আলজাজিরা, টিআরটি ওয়ার্ল্ড, রয়টার্স প্রভৃতির প্রতিবেদনকে বিশ্বাসযোগ্যতার দিক থেকে অধিক গুরুত্ব দেয়।

যোগাযোগের মাধ্যম

আগে যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম ছিল চিঠি। ক্যাসেট রেকর্ডার প্রেরণ করা হতো কোনো ব্যক্তি অথবা ডাক অফিসের মাধ্যমে। কিন্তু এখন ফেসবুক, হোয়াটস অ্যাপ, টুইটার, স্কাইপে, ইমো ইত্যাদির মাধ্যমে মূহুর্তের মধ্যেই যোগাযোগ এবং সংবাদ প্রেরণ করা যায়।

বিশ্লেষণ

পর্যবেক্ষণে প্রাপ্ত তথ্য এবং বিভিন্ন বুদ্ধিভিত্তিক গবেষণা প্রতিবেদন এবং প্রবন্ধের সহযোগিতায় আমরা যে বিষয়গুলো বিশ্লেষণ হিসেবে পাই তা হলো-

বিশ্বব্যাপী সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য ধীরে ধীরে সাংস্কৃতিক একীভূত হওয়ার দিকে ঝুকছে। বিশ্বায়নের অবাধ তথ্য প্রবাহ, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং আদান-প্রদান মূলত সারা বিশ্বের বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক সত্তাগুলোকে ক্রমাগত একক সর্বজনীন সংস্কৃতির দিকে ধাবিত করছে। একটি মানুষ বাঙালি অথচ তার আচার-আচরণ এবং কার্যধারা পশ্চিমা ধাচের। আবার পোশাক পরিচ্ছদে বাঙালি এবং পশ্চিমাদের সমন্বয়, যাকে বলা যায় মিশ্র সংস্কৃতি। এভাবেই সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা লোপ পাচ্ছে।

পশ্চিমা সংস্কৃতির আধিপত্য

বিশ্বব্যাপী অবাধ সংস্কৃতির মিলনমেলায় বৈশ্বিক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিমাবিশ্ব নিজেদের সংস্কৃতিকে বিশ্বময় ছড়িয়ে দিচ্ছে। এক্ষেত্রে তারা আন্তর্জাতিক সংস্থা, সংবাদমাধ্যম, বেসরকারি ধাতব্য সংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয় এবং বুদ্ধিবৃত্তিক লেখালেখির মাধ্যমে সারা বিশ্বে নিজেদের সংস্কৃতির আধিপত্য সৃষ্টি করছে।

সামাজিক অধঃপতন

বিজাতীয় সংস্কৃতির অবাধ প্রবাহ, যে প্রবাহে মূলত দেশীয় মৌলিক সাংস্কৃতিক উপাদানগুলোর কোনো সম্পর্ক নেই তবে তা অন্য রাষ্ট্রের সামাজিক সম্পর্ক এবং কাঠামোর ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলে।

সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ভাঙ্গন

বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতি এবং সম্প্রদায় তাদের ভৌগোলিক কাঠামো, আবহাওয়া, সম্পদ এবং জীবনাচরণের ওপর ভিত্তি করে তাদের সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলে। এক্ষেত্রে যখন বিশ্বায়ন পরবর্তী মানুষ চমকপ্রদ পশ্চিমা সমাজের প্রতি আগ্রহী হয় তখনই তাদের স্বকীয় সমাজ ব্যবস্থায় ধ্বস নামে। পূর্বেকার সামাজিক রীতিনীতি আচারানুষ্ঠান বিলুপ্ত হয়। সামাজিক সম্পর্ক সবার কাছে মূল্যহীন হয়ে পড়ে। এভাবে সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোও অকেজো হয়ে পড়ে।

পারিবারিক ব্যবস্থা ভাঙ্গনের আশংকা

সমাজের সবচেয়ে মৌলিক প্রতিষ্ঠান হলো পরিবার। বর্তমান বস্তুবাদী সমাজব্যবস্থায় মানুষ পশ্চিমা কায়দায় ক্রমশই যান্ত্রিক, কর্মব্যস্ত হয়ে পড়েছে। বাবা, মা, ভাই, বোন ইত্যাদি সম্পর্কের প্রতি অনাগ্রহী হয়ে পড়ছে। ফলে যৌথ পরিবার ভেঙ্গে একক পরিবার বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু মানুষের যান্ত্রিকতা এতটাই প্রকট হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, সে আরো নিঃসঙ্গতা চায়। যার দরুণ সম্প্রতি বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটনা বাড়ছে। এছাড়া ঝামেলা এড়াতে বেবি কেয়ার, ওল্ড হোম ইত্যাদি সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে। ব্যক্তির কাছে বিভিন্ন সম্পর্ক হয়ে উঠেছে মূল্যহীন।

বস্তুবাদ নির্ভর সমাজ প্রতিষ্ঠা

আধুনিক বিশ্ব তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, কম্পিউটার এবং আধুনিক বিজ্ঞানের বিস্ময়কর আবিষ্কার মানবজাতিকে অনেকটা প্রযুক্তিনির্ভর করে তুলেছে। যা তাদের সামাজিক নীতি নৈতিকতা, ধর্মবিশ্বাস এবং মূল্যবোধের ধারনা হতে বিমুখ করে ভোগবিলাসময় জীবনের প্রতি উৎসাহিত করছে। যা মূলত সমাজব্যবস্থা, সামাজিক সম্পর্ক, পারিবারিক বা ব্যক্তিসম্পর্ককে নিরর্থক করে তুলেছে।

মানসিক অবনমন

পশ্চিমাদের চাকচিক্যময় সমাজব্যবস্থা এবং উন্নত জীবনযাত্রার তথ্য বিশ্বায়নের যুগে সারা বিশ্বে পৌঁছে যায়। তা সারাবিশ্বের মানুষের মনোলোকে ধীরে ধীরে অধীনতার

আবরণ সঞ্চার করে। কল্পিত জগতে একটি জাতি উন্নত দেশের পরাধীনতার শৃঙ্খলে ধীরে ধীরে নিজেদের আবদ্ধ করে।

অর্থনৈতিক আধিপত্যবাদ কায়েম

গণমাধ্যম, সামাজিক মাধ্যম, চলচ্চিত্র এবং বুদ্ধিভিত্তিক প্রবন্ধ ইত্যাদি মাধ্যমগুলোর সর্বোচ্চ ব্যবহার করে বিশ্বের বড় বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং বহুজাতিক কোম্পানিগুলো তাদের একচ্ছত্র আধিপত্য কায়েম করেছে। সাংস্কৃতিক বশ্যতা এবং মানসিক হীনম্মন্যতা, অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশের মানুষদের বিদেশী পণ্যের প্রতি আগ্রহ, আসক্তি এবং বিশ্বাস জন্মায়। এছাড়াও যেকোনো প্রকার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক চুক্তি সম্পাদনে অনুন্নত দেশগুলো প্রকাশ্যে এবং অপ্রকাশ্যে উন্নত বিশ্ব, বিশ্বব্যাংক এবং আই.এম.এফ দ্বারা প্রভাবিত হয়।

রাজনৈতিক বশ্যতা স্বীকার

সংস্কৃতি ব্যক্তির মনোজগত নিয়ন্ত্রণ করে। আর উন্নত বিশ্বসংস্কৃতি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে একটি দেশের রাজনীতিবিদ, স্বার্থান্বেষী বিভিন্ন গ্রুপ, সেনাবাহিনী এবং সরকারের মনোজগতে পশ্চিমাদের আনুগত্যের রশ্মি জ্বেলে দেয়। এই আনুগত্য প্রতিভাত হয় মূলত দুইটি পরিসরে।

ক) দেশীয় নীতি নির্ধারণ

উন্নত পশ্চিমাবিশ্বের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে আমাদের দেশীয়, স্বকীয় ব্যবস্থার প্রতিফলন না ঘটিয়ে দেশে পশ্চিমা মডেলের গণতন্ত্র এবং বাজার অর্থনীতির প্রসার মূলত তাদের সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদকেই নির্দেশ করে। রাজনৈতিক দল গঠন কার্য পরিচালনা সরকার গঠন এবং প্রশাসন ব্যবস্থা সর্বত্রই পশ্চিমাদের অনুকরণ মূলত আমাদের স্বকীয়তাকে বিপন্ন করে তুলেছে।

খ) বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ

উন্নয়ন সহযোগিতা, দাতাসংস্থা সহযোগিতামূলক জোট এবং অবাধ অর্থনীতির নামে পশ্চিমা বিশ্ব অন্যান্য অনুন্নত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর মতো আমাদের দেশকেও বিভিন্নভাবে বিভিন্ন গণ্ডিতে আবদ্ধ করে ফেলেছে। অভিন্ন বৈদেশিক নীতি প্রতিষ্ঠার নামে মূলত উন্নত বিশ্ব আমাদের ওপর তাদের নীতি আদর্শ চাপিয়ে দিচ্ছে, যাতে আমাদের জাতীয় স্বার্থ এমনকি সার্বভৌমত্ব পর্যন্ত লঙ্ঘিত হচ্ছে।

সমাপনী

সংস্কৃতি, প্রথা, ঐতিহ্য এবং আচারিক মেলবন্ধন এবং বিভিন্ন জাতির মাঝে সংস্কৃতির আদান প্রদানের মাধ্যমে একটি সর্বজনীন সংস্কৃতি লাভের ধারণাকে লালন করাই হলো বিশ্বায়ন (মার্শাল ম্যাকলুহান ১৯৬২)। তবে পরিতাপের বিষয় এই যে, সাংস্কৃতিক বিশ্বায়নের এই স্রোতে পশ্চিমাবিশ্বসহ বিভিন্ন জাতি রাষ্ট্রগুলো তার উন্নত প্রচারমাধ্যম ব্যবহার করে অনুন্নত দেশের সংস্কৃতির ওপর সুস্পষ্ট আধিপত্য কায়েম করার প্রয়াস অব্যহত রেখেছে। বিজাতীয় সংস্কৃতির করাল গ্রাসে পতিত হয় দেশীয়

সংস্কৃতি। যার সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে যাচ্ছে আমাদের বাঙালি সংস্কৃতি। তাই ভবিষ্যতে আমাদের এই ক্রান্তিকালীন পরিস্থিতি হতে উত্তরণের যথাযথ নির্দেশনা লাভের আশায় এটি আরো গবেষণার দাবি রাখে।

তথ্যসূত্র

- K, J olson & K, J Torenli (2017) Redefining Home: How Cultural Distinctiveness Affects the Malleability of InGroup Boundaries and Brand Preferences.
- Oberg, Kalervo (1960), 'Cultural Shock: Adjustment to New Cultural Environments,' Practical Anthropology, 7, 177–82.
- M. Macluhan (1962) The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man.
- Joseph E. Stigliz (2003) Globalization and it's discontent.

মুহাম্মাদ তানবীরুল ইসলাম, কাওছারা বেগম
কাজী ফাইজা, সুরাইয়া রহমান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্য শিল্পের নান্দনিকতা

নৃবিজ্ঞান টিম*

'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়' দুই শব্দের একটি আবেগের নাম। এই বিশ্ববিদ্যালয় বহন করে বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি। নানান সময়ের প্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে তৈরি হয়েছে নানান রকম স্থাপনা। ৬০০ একর আয়তনের এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আনাচে কানাচে রয়েছে নানান রকম নানান আঙ্গিকের বিভিন্ন জিনিসের প্রতিচ্ছবি। সেই প্রতিচ্ছবি কখনো প্রতিবাদের, কখনো স্মৃতি রক্ষার, আবার কখনো কারো সম্মানার্থে। এইসব প্রতিচ্ছবিই প্রতিফলিত হয়েছে বিভিন্ন কারুকার্যে, শিল্পকর্মে এবং স্থাপনার মাধ্যমে। নতুন প্রজন্মের সামনে ইতিহাসের বস্তুনিষ্ঠ বার্তা তুলে ধরার মাধ্যমে তাদের স্মৃতিতে বাংলাদেশের এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা লালনের জন্য এইসব স্থাপনার গুরুত্ব অপরিসীম।

অপরাজেয় বাংলা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থাপত্যশিল্প নিয়ে কথা বলতে গেলে, অবিসংবাদিতভাবেই প্রথমে আসে 'অপরাজেয় বাংলা' ভাস্কর্য প্রসঙ্গ। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সমার্থক মূর্তপ্রতীক হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের সামনে স্বগৌরবে উচ্চশীরে দাঁড়ানো এই ভাস্কর্যটি নির্মাণ করেছেন ভাস্কর সৈয়দ আবদুল্লাহ খালিদ। যাতে সুনিপুণ শৈল্পিকতায় ফুটে উঠেছে মহান মুক্তিযুদ্ধে ছাত্রসমাজসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের অংশগ্রহণের মোহন দৃশ্য। ১৯৭২-৭৩ সালে অপরাজেয় বাংলার কাজ শুরু হয় ডাকসুর উদ্যোগে এবং শেষ হয় ১৯৭৯ সালে। ৬ ফুট বেদির উপর নির্মিত এর উচ্চতা ১২ ফুট, প্রস্থ ৮ ফুট ও ব্যাস ৬ ফুট। ভাস্কর্যটির তিনটি মূর্তির একটির ডান হাতের দৃঢ় মুষ্টিতে রাইফেলের বেল্ট ধরা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি। এই ভাস্কর্যের একজন মডেল আর্ট কলেজের ছাত্র মুক্তিযোদ্ধা বদরুল আলম বেনু। থ্রি নট থ্রি রাইফেল হাতে সাবলীল ভঙ্গিতে দাঁড়ানো অপর মূর্তির মডেল সৈয়দ হামিদ মকসুদ ফজলে। আর নারী মূর্তির মডেল হাসিনা আহমেদ। ফার্স্ট এইড বক্স হাতে সেবিকা, সময়ের প্রয়োজনে রাইফেল হাতে তুলে নেয়া গ্রীবা উঁচু করে ঋজু ভঙ্গিমায় গ্রামের টগবগে তরুণ এবং দুহাতে রাইফেল ধরে রাখা আরেক শহুরে মুক্তিযোদ্ধা।

রাজু স্মারক ভাস্কর্য

টিএসসি প্রাঙ্গনে অবস্থিত ভাস্কর্যটি সন্ত্রাসবিরোধী নিদর্শন হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। ১৯৯২ সালের ১৩ মার্চ গণতান্ত্রিক ছাত্র ঐক্যের মিছিল চলাকালে সন্ত্রাসীরা গুলি করলে সংগঠনটির কেন্দ্রীয় নেতা মঈন হোসেন রাজু নিহত হন। রাজুসহ সন্ত্রাসবিরোধী আন্দোলনের সকল শহীদের স্মরণে নির্মিত এই ভাস্কর্য ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ভাস্কর্যটি ১৬ ফুট দীর্ঘ, ১৪ ফুট প্রশস্ত এবং ১০ ফুট উঁচু। এটি নির্মাণে অবদান রেখেছেন ভাস্কর শ্যামল চৌধুরী ও সহযোগী গোপাল পাল। নির্মাণ ও স্থাপনের অর্থায়নে ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক আতাউদ্দিন খান (আতা খান) ও মুন্সীগঞ্জের বিক্রমপুর সমিতির সভাপতি লায়ন নজরুল ইসলাম খান বাদলা।

স্বোপার্জিত স্বাধীনতা

টিএসসির সড়কদ্বীপে অবস্থিত ভাস্কর্যটির নির্মাতা ভাস্কর শামীম শিকদার। মাটি থেকে ১৩ ফুট উঁচু, ৮ ফুট ৪ ইঞ্চি প্রস্থ এবং ১২ ফুট ৪ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য একটি বেদীর উপরে স্থাপিত হয়েছে এটি। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর অত্যাচারের কয়েকটি খণ্ডচিত্র বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এই ভাস্কর্যটি। চৌকো বেদির ওপর স্থাপিত মূল ভাস্কর্যের বামে মুক্তিযোদ্ধা কৃষক আর ডানে অস্ত্র হাতে দুই বীর মুক্তিযোদ্ধা। মাঝখানে অস্ত্র হাতে নারী ও পুরুষ যোদ্ধারা উড়িয়েছেন বিজয় নিশান। এই পতাকা ওড়ানোর জন্য বাঙালির রক্ত দান আর নির্যাতনের কয়েকটি খণ্ডচিত্র বেদির চারপাশে চিত্রায়িত। বেদির বাম পাশে আছে ছাত্র জনতার ওপর অত্যাচারের নির্মম চেহারা। ১৯৮৮ সালের ২৫ মার্চ ভাস্কর্যটি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক।

বসুনীয়া তোরণ

১৯৮৫ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি রাত এগারোটা। সূর্যসেন হল, মহসীন হল হয়ে জহুরুল হক হল ও স্যার এ এফ রহমান হলের মধ্যবর্তী সড়ক ধরে এগোতে থাকে একটি মিছিল। ঠিক সেই মূহুর্তেই স্যার এ এফ রহমান হল থেকে মিছিলে কাটা রাইফেলের গুলিবর্ষণ করে সরকার সমর্থিত 'নতুন বাংলা ছাত্র সমাজ' এর সন্ত্রাসীরা। গুলিতে নিহত হন স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের সোচ্চারকণ্ঠ জাতীয় ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় যুগ্ম সম্পাদক রাউফুন বসুনিয়া। তার এই আত্মত্যাগ স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনকে বেগবান করে। তার আত্মত্যাগকে সম্মান জানিয়ে পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে একটি আবক্ষ প্রতিকৃতি নির্মাণ করা হয়। ১৯৮৭ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি তার দ্বিতীয় মৃত্যু বার্ষিকীর সময় এই ভাস্কর্য উদ্বোধন করে তৎকালীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আব্দুল মান্নান।

স্মৃতি চিরন্তন

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটক 'মুক্তি ও গণতন্ত্র তোরণ' দিয়ে প্রবেশ করে কিছুদূর সামনে এগোলে উপাধ্যক্ষের বাসভবনের সামনে চোখে পড়বে গ্রানাইট পাথরের ছোট বড় ১৪ টি দেয়াল। বেদিতে ওঠার সময় কালো সিঁড়ির উভয় পাশে বাংলা ও ইংরেজিতে মুক্তিযুদ্ধের সময় নিহত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও এর শহীদ সদস্যদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে 'স্মৃতি চিরন্তন' শিরোনামে নামফলক । স্মৃতিফলকটি নির্মাণ করা হয় ১৯৯৫ সালে, আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয় একই বছরের ২৬ মার্চ, স্বাধীনতা দিবসে।
স্থপতি মহিউদ্দীন শাকের, শিল্পী রফিকুন্নবী অনুমোদিত আবু সাঈদের ড্রইংয়ে কংক্রিটের দেয়ালে বসানো পোড়ামাটির ফলকে উঠে এসেছে পাক বাহিনীর নিষ্ঠুর, অমানবিক নির্যাতনের ইতিহাস।

মুক্তি ও গণতন্ত্র তোরণ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই এসোসিয়েশন (ডিইউএএ) কর্তৃক ২০২১ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ উপলক্ষে এর অভ্যন্তরে ৬টি গেট নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। উদ্যোগের বাস্তবায়ন হিসেবে 'মুক্তি ও গণতন্ত্র তোরণ' গেটটি নির্মিত হয়েছে নীলক্ষেত থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশ মুখে। এটি নির্মাণে আর্থিক সহায়তা দিয়েছে ন্যাশনাল ক্রেডিট এন্ড কমার্স (এনসিসি) ব্যাংক। তোরণটি ৯৯ ফুট দৈর্ঘ্য, ১৩ ফুট প্রস্থ ও উচ্চতা প্রায় ৩৭ ফুট।

মা ও শিশু

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলের গেট দিয়ে একটু এগিয়ে হাতের ডান পাশে লক্ষ্য করলেই চোখে পড়বে ভাস্কর্যটি। স্থপতি- নভেরা আহমেদ। কবে স্থাপিত হয় এটি তা সঠিকভাবে জানা না গেলেও, ২০০৬ সালে স্থাপন করা হয়েছে বলে সম্ভাব্য তথ্য পাওয়া যায়।

ঢাকা গেট

বর্তমানে 'ঢাকা গেট' নামে পরিচিত স্থাপনার মূল নাম 'মীর জুমলা গেট'। পূর্বে রমনা প্রবেশের জন্য ব্যবহৃত হত বলে একে 'রমনা গেট' নামকরণ করা হয়। একসময় একে 'ময়মনসিংহ গেট' নামেও ডাকা হত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার দোয়েল

চত্বর পেরিয়ে টিএসসির দিকে যেতে এর দেখা পাওয়া যায়। গেটটি তিন অংশে বিভক্ত, এক অংশ তিন নেতার মাজারের পাশে, মাঝের অংশ সড়ক বিভাজকের উপর এবং আরেকটি নবায়নযোগ্য শক্তি গবেষণা কেন্দ্রের দিকে অবস্থিত। অযত্ন, অবহেলায় ঢাকার অর্থনৈতিক ও সামাজিক দুইশ বছরের স্মৃতি বহনকারী গেটটির অবস্থা এখন জরাজীর্ণ।

দোয়েল চত্বর

কার্জন হলের সামনে অবস্থিত স্থাপত্যটি প্রায় ৮ হাজার বর্গফুট বৃত্তাকার এলাকাজুড়ে অবস্থিত। জাতীয় পাখির প্রতীকে ১৯৭৪ সালে স্থপতি আজিজুল জলিল পাশা চত্বরটির নির্মাণ করেন। সাদা-কালো রঙের এই পাখি এক সময় ঢাকা শহরে অহরহ দেখা যেত তবে নগরায়ণের ফলে এখন দোয়েল পাখি হারিয়ে গেছে নগরীর কোলাহলে। নান্দনিক এই স্থাপত্য তৈরীর আর্থিক সহায়তা দিয়েছিল উত্তরা ব্যাংক।

সড়ক দুর্ঘটনা স্মৃতিস্থাপনা

২০১১ সালের ১৩ আগস্ট মানিকগঞ্জের জোকা এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় অকাল প্রয়াত প্রখ্যাত চলচিত্র নির্মাতা তারেক মাসুদ ও সাংবাদিক মিশুক মুনীরসহ মোট পাঁচ জনের স্মৃতি স্মরণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন নাহার হল সংলগ্ন পথে তৈরি করা হয় সড়ক দুর্ঘটনা স্মৃতিস্থাপনা। শিল্পী ঢালী আল মামুনের পরিকল্পনায় এই স্থাপনার নকশা প্রণয়ন করেন শিল্পী সালাউদ্দিন আহমেদ এবং ব্যবস্থাপনা করে 'তারেক মাসুদ মেমোরিয়াল ট্রাস্ট'। ১ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ সালে স্থাপনাটি উদ্বোধন করেন ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত মাইক্রোবাসটি ঢাকায় আনা হয় এবং এটি ব্যবহার করে স্মৃতিস্থাপনা নির্মিত হয়। পুরো স্থাপনায় সাদা রঙ ব্যবহার করা হয়। স্থাপনাটিতে বিধ্বস্ত সাদা মাইক্রোবাসের ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে যা দেখলে মনে হয় কিছুক্ষণ আগেই একটি মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। গাড়িটিতে পাঁচটি হাত সংযুক্ত আছে যা পাঁচ জনের মৃত্যুর স্মৃতি বহন করে।

বুদ্ধ মূর্তি

জগন্নাথ হলের উপাসনালয়ের উত্তর পশ্চিম দিকে অবস্থিত ৩০ ফুট উচ্চতা, ১৬ ফুট প্রস্থ, মাটির নিচে প্রায় ১৬ ফুট গভীর সম্পূর্ণ পাথর দিয়ে ঢালাই করা আরসিসি কলাম দ্বারা নির্মিত বুদ্ধ মূর্তিটি যেন নান্দনিক শিল্পের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। মূর্তির চারধারে ২৪টি স্টিল পাইপ বসিয়ে টানিয়ে দেওয়া হয়েছে শিকল। বেজমেন্টে রয়েছে আরো ২৪টি স্টিলের পাইপ। মূর্তিটি রক্ষাকর্তা বুদ্ধ বা ভয়হরণকারী বুদ্ধের প্রতীকী রূপ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজের সাবেক চেয়ারম্যান ও বিশ্ব বৌদ্ধ ফেডারেশন, বাংলাদেশ চ্যাপ্টারের সভাপতি প্রফেসর ডক্টর সুকোমল বড়ুয়া এই বুদ্ধ মূর্তিটি তৈরির উদ্যোগ নেন। এটি নির্মাণে আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছেন বাংলাদেশ বৌদ্ধ সমিতি ঢাকা অঞ্চলের সাধারণ সম্পাদক স্বপন বড়ুয়া চৌধুরী। শিল্পী মং খি মং শৈল্পিক এই মূর্তিটি নির্মাণের দায়িত্ব পালন করেন।

তথ্য নির্দেশনা:
১. https://www.manobkantha.com
২. http://dainikamadershomoy.com
৩. https://www.jugantor.com
৪. http://bonikbarta.net
৫. https://www.youtube.com/watch?v=9ZGbNdUFZ8s
৬. http://www.daily-sun.com/arcprint/details/158857/Tareque-Masud-and-Mishuk-Munier/2016- 08-14
৭. http://archive.ittefaq.com.bd
৮. http://www.dailyjanakantha.com/details/article
৯. http://ajkerpatrika.com/last-page/2015/03/24/26895
১০. http://www.dumcjnews.com
১১.https://bangla.bdnews24.com/bangladesh/article962446.bdnews
১২. http://onlinebangla.com.bd

রোমানা পাপড়ি, মুন্সী ইয়াছির আরাফাত, রুবাইয়াত শারমিন,
মোঃ মাহাবুবুর রহমান, মুকসিতা জাহান উপমা, শবনুর-এ-জান্নাত

ভাষাবিজ্ঞান প্রসঙ্গে

তানজিয়া সিদ্দিকা*

ভাষাবিজ্ঞান মূলত ভাষার ধ্বনিপ্রণালী, গঠন ও অর্থের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে ভাষার তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক গবেষণা করে থাকে (র‍্যাডফোর্ড, ১৯৯৯)। এই প্রসঙ্গে সমাজবিজ্ঞান, স্নায়ুবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, পুরাতত্ত্ব ও বিভিন্ন শাখা ভাষাবিজ্ঞান গবেষণার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। কিন্তু ভাষাবিজ্ঞান প্রসঙ্গে কিছু ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত রয়েছে। যার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ভাষাবিজ্ঞানকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্নতাত্ত্বিক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত ধরে নেওয়া। দ্বিতীয়ত, ভাষাবিদকে বহুক্ষেত্রে ব্যাকরণবিদ বলে তুলনা করার প্রবণতাও লক্ষ্য করা যায়। যদিও বর্ণনামূলক ব্যাকরণ শিক্ষা ভাষাবিজ্ঞান গবেষণার বিশেষ সহায়ক, তবুও ব্যাকরণশিক্ষাই কেবল ভাষাবিজ্ঞানের মূল বিষয়বস্তু নয়। ভাষাবিজ্ঞানের মূল লক্ষ্য হল, ভাষার সামগ্রিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে ভাষার গঠন ও প্রয়োগবিধি সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করা। কিন্তু তাই বলে, ভাষাবিদদের সরাসরি সাহিত্য সমালোচক বলে সম্বোধন করা যথার্থ নয়। এর কারণ বিশ্লেষণে উদাহরণস্বরূপ ফলিত ভাষাবিজ্ঞানের একটি শাখার বর্ণনা দেওয়া যেতে পারে। ফলিত ভাষাবিদরা গাণিতিক ও গণনীয় ভাষাতত্ত্ব অধ্যয়নের মাধ্যমে তথ্যপ্রযুক্তি ও ভাষা সম্পর্কিত গবেষণাকে একধাপ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অতএব, ভাষাবিদরা বস্তুত ভাষার গঠন প্রকৃতি এবং ব্যবহার প্রণালি সম্পর্কে উদ্বিগ্ন, কেবল সাহিত্যের মাপকাঠি বিশ্লেষণে নিযুক্ত নয়। চতুর্থত, ভাষাবিদদের 'প্রায়ই কয়টি ভাষা' জানা আছে প্রসঙ্গে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। এটি সত্য যে, বিভিন্ন ভাষা জানা থাকলে ভাষার গঠন প্রণালির তুলনামূলক গবেষণার গুণগত উন্নয়ন পর্যবেক্ষিত হতে পারে। তাই বলে বহু ভাষা শিক্ষা নেয়া অথবা দেয়া ভাষাবিদদের মূল লক্ষ্য নয়। ভাষাগত প্রশিক্ষণ একজন ভাষাবিদকে গবেষণার কাজে সহায়তা করতে পারে (হানকে, ২০১৪)।

পেশা নির্বাচনের ক্ষেত্রে ভাষাবিদরা পরবর্তীতে শিক্ষা ও গবেষণাতে নিযুক্ত করতে পারেন। ফলিত ভাষাবিদরা বিভিন্ন ভাষা ও শাখায় পাঠদান করতে পারেন, বিভিন্ন সংস্থায় ভাষা পরিচালনা, প্রকাশনা, সম্পাদনায় নিযুক্ত হতে পারেন। অনেক ভাষাবিদরা অনুবাদক, দো-ভাষী, ভাষা-পরামর্শকদাতা ও ভাষা সংরক্ষণ কাজে নিযুক্ত হতে পারেন। ভাষাবিদ হতে ভাষাবিজ্ঞান বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি বিশেষ প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা জরুরি। পাশাপাশি বিভিন্ন ভাষায় দক্ষতা ও তথ্যপ্রযুক্তি ফলিত ভাষাবিজ্ঞান শাখার কর্মকাণ্ডে সহায়ক হতে পারে। ভাষাবিদরা ভাষার দালিলিকরণে মুখ্য ভূমিকা রাখতে পারে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভাষার দালিলিকরণকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে ভাষা সংরক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বিপন্ন ও বিপন্নপ্রায় ভাষা সংরক্ষণে তরুণ গবেষকরা এগিয়ে আসতে পারে। অতএব, বলা যেতে পারে একজন আদর্শ ভাষাবিদ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে ভাষার মতো এই অসাধারণ ক্ষমতা বোঝার লক্ষ্যে

প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে অগ্রসর হয়ে থাকেন। তরুণ ভাষাবিদরা, এই মর্মে, ভাষাবিজ্ঞান সম্পর্কিত প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা পাল্টে ভাষাবিজ্ঞানের বিভিন্ন গবেষণা ও পেশায় নিযুক্ত হয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে।

তথ্যপঞ্জি

র‍্যাডফোর্ড, এ., আতকিনসন, এম., ব্রিটেইন, ড., ক্লাহসেন,এইচ., এন্ড স্পেনসার, এ.. (১৯৯৯). লিঙ্গুইস্টিকস, এন ইন্ট্রোডাকশন. ক্যামব্রিজ: ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস.

হানকে, হ. [দি ভার্চুয়াল লিঙ্গুইস্টিক ক্যাম্পাস]. (২০১৪). হোয়াট ইজ লিঙ্গুইস্টিক. রিট্রিভড ফ্রম https://www.youtube.com/user/LinguisticsMarburg.

তানজিয়া সিদ্দিকা
প্রভাষক, ইউনিভার্সিটি অব লিবার‍্যাল আর্টস বাংলাদেশ

প্রাথমিক শিক্ষায় প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জিত হচ্ছে না কেন

আল ফয়সাল বিন কাশেম কানন*

মুখ্য শব্দগুচ্ছ: প্রাথমিক শিক্ষা, প্রান্তিক যোগ্যতা, চাহিদা, ফলপ্রসূ

একটি চৈনিক প্রবাদ আছে, 'শিক্ষার্থীকে তোমরা (শিক্ষকেরা) কেবল তোমাদের শিক্ষাতেই বেঁধে ফেলো না; মনে রেখো, তারা তোমাদের সময়ে নয়, তাদের সময়ে জন্মেছে।' পরিবর্তনশীল পৃথিবীর সঙ্গে শিক্ষার্থীকে খাপ খাওয়ানোর এই প্রচেষ্টা বোধ করি সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে। কারণ, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রমাণ মিলেছে এ স্তরে অর্জিত জ্ঞান শিক্ষার্থীদের মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী ও ফলপ্রসূ প্রভাব ফেলে। বিশেষত, বাংলাদেশে, যেখানে প্রাথমিকে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের এক-তৃতীয়াংশই অষ্টম শ্রেণীর আগে ঝড়ে পড়ে, সেখানে প্রাথমিক শিক্ষার ভিত্তি মজবুত করা অনস্বীকার্য। কাজেই এই স্তরের শিক্ষার কাঠামো কেমন হওয়া উচিত, এর উদ্দেশ্য কী হবে, পাঠ্যক্রম কী উপাদান ধারণ করবে ইত্যাদি বিষয়গুলো বাড়তি নজরের দাবি রাখে।

সৌভাগ্যের বিষয়, বাংলাদেশ সরকারও অনুভব করে, এমনভাবে প্রাথমিক শিক্ষার কাঠামোকে সাজানো উচিত, যাতে প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমেই জীবনের অবশ্য প্রয়োজনীয় দক্ষতাগুলো শিক্ষার্থীরা অর্জন করতে পারে। এটাও মাথায় রাখা হয়, বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে তারা যেন নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে ধারণা পায়। এ অনুভবের প্রেক্ষিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আওতায় আলাদা প্রাথমিক অধিদপ্তর স্থাপন, ১৮৩৪ টি সহকারী থানা পরিষদের ওপর প্রাথমিক শিক্ষার দায়দায়িত্ব ন্যস্তকরণ, শিক্ষকদের ধারাবাহিক প্রশিক্ষণ প্রদান, বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোকে সরকারিকরণ ইত্যাদি পদক্ষেপ নেয়া হয়। কিন্তু এসব পদক্ষেপ গ্রহণের পরেও এক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রগতি হয়নি।

এখানে যে বিষয়টিকে প্রাধান্য দিতে হবে, সেটি হল, শিক্ষাকে শুধু বর্তমানের চাহিদা মেটানোর জন্য নয়, বরং ভবিষ্যৎ জীবনে তাকে সক্ষম করার ব্যাপারটিতেও গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। আর এ সামর্থ্য অর্জন নিশ্চিত করার জন্য অনাবশ্যক তত্ত্ব ও তথ্য শেখার পরিবর্তে একান্ত আবশ্যকীয় যোগ্যতা অর্জনের দিকটি অধিক মনোযোগের দাবি রাখে। সামর্থ্য অর্জনের এই দক্ষতা যেগুলো প্রাথমিক শিক্ষা শেষে শিশু অর্জন করবে বলে ধরে নেয়া হয়, সেগুলোই প্রাথমিক শিক্ষার প্রান্তিক যোগ্যতা।

এই প্রান্তিক যোগ্যতা নিশ্চিতকরণের জন্য বাংলাদেশ সরকার তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আওতায় (১৯৮৫-৯০) জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সটবুক বোর্ড কর্তৃক প্রচলিত প্রাথমিক শিক্ষাক্রম নবায়ন ও পরিমার্জনের একটি বিস্তৃত কার্যক্রম গ্রহণ করে। এই কার্যক্রমের আওতায় শিক্ষক প্রশিক্ষক, বিষয় বিশেষজ্ঞ ও গবেষকদের

সমন্বয়ে গঠিত কমিটির মাধ্যমে সংশোধন ও পরিমার্জনের ভিত্তিতে প্রাথমিক স্তরে যোগ্যতাভিত্তিক শিখনক্রম প্রণয়ন ও প্রয়োগ করা হয়। সেখানে ১৯ টি উদ্দেশ্য ও ৫৩ টি প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারণ করার পাশাপাশি প্রান্তিক যোগ্যতাগুলো সুনির্দিষ্ট করা, শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতাসমূহ চিহ্নিত করা হয়। পরবর্তীতে ২০০০ সালে প্রান্তিক যোগ্যতাগুলো পরিমার্জন করে ৫০ টি করা হয়।

দুঃখের বিষয় এই যে, তারপর এতগুলো বছর পেরিয়ে গেলেও প্রাথমিক স্তর শেষে শিক্ষার্থীদের যতটুকু প্রান্তিক দক্ষতা অর্জন করা উচিত, তার বেশকিছু তারা এখনো অর্জন করতে পারছে না।

এডুকেশন ওয়াচ (২০০০) এর গবেষণা রিপোর্টে দেখা গিয়েছে, কাগজে-কলমে পরিমাপযোগ্য ২৭ টি যোগ্যতার(যদিও মোট যোগ্যতা ৫৩ টি) মধ্যে মাত্র ২ শতাংশ শিশু সবকয়টি দক্ষতা অর্জন করতে পেরেছে। এর আরো ১৫ বছর পর এডুকেশন ওয়াচ (২০১৫) এ দেখা যায়, মাত্র ১.৬ (এক দশমিক ছয়) শতাংশ শিক্ষার্থী সবকয়টি দক্ষতা অর্জন করতে পারছে। যা দেখে বোঝা যায়, এই ১৫ বছরে অবস্থার খুব একটা উন্নতি হয়নি। এছাড়া দেখা যাচ্ছে প্রায় এক-চতুর্থাংশ শিক্ষার্থীর দক্ষতা ১৮ এর নিচে; যা নিশ্চিতভাবে চিন্তার উদ্রেক করে। এ পরিস্থিতিতে গৃহীত পদক্ষেপগুলোকে সঠিকভাবে ও যুক্তিসহকারে পর্যালোচনা করাটা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর কারণ খুঁজতে গিয়ে যে দিকগুলো পাওয়া যায় তার মধ্যে আছে: শিক্ষকদের উদাসীনতা, পিতামাতার শিক্ষার অভাব, পর্যাপ্ত খাদ্য নিরাপত্তা না থাকা, শ্রেণিকক্ষে ধারণক্ষমতার বেশি শিক্ষার্থী, আবাস থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যাপক দূরত্ব, শিক্ষাক্রমে পর্যাপ্ত আনন্দের অভাব ইত্যাদি যেগুলোকে প্রয়োজনীয় নিরীক্ষণ ও তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে কিছুটা হলেও কমিয়ে আনা সম্ভব।

এমতাবস্থায় সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে প্রত্যাশা, তারা জাতীর উন্নতির সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত এই দিকটির উন্নয়নে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং বাংলাদেশকে একটি সক্ষম, সামর্থ্যবান রাষ্ট্রে পরিণত করার ভিত্তিটিকে মজবুত করবেন।

আল ফয়সাল বিন কাশেম কানন
শিক্ষা ও গবেষণা ইন্সটিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মধ্য দিয়ে নিরক্ষরতামুক্ত বাংলাদেশ বিনির্মাণ

নওরীন সুলতানা*

মুখ্য শব্দগুচ্ছ: আনুষ্ঠানিক, উপানুষ্ঠানিক, সমন্বিত, কারিগরি, সাক্ষর, স্বাক্ষর।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সমগ্র পৃথিবীজুড়ে শিক্ষার একটি দ্বিতীয় ধারা। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আনুষ্ঠানিক শিক্ষা থেকে ঝরে পড়া বিশেষ লক্ষ্যদলকে কেন্দ্র করে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার কার্যক্রম পরিচালিত হয়। আনুষ্ঠানিক শিক্ষার দ্বারা যখন শিখন-শেখান কার্যক্রমের সকল ক্ষেত্রগুলো পরিপূরণ করা সম্ভব হয় না, তখনই উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সহায়ক ভূমিকা পালন করে এবং স্বভাবতই মানুষ তখন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার দ্বারস্থ হয়। এছাড়া জ্ঞানের রাজ্যে প্রতিনিয়তই যখন নতুন নতুন বিষয় সংযুক্ত হচ্ছে, তখন আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পুরোনো কারিকুলাম বা সিলেবাস সে জ্ঞানের চাহিদা বা তৃষ্ণা মেটাতে পুরোপুরি সক্ষম নাও হতে পারে। যেমন; সিলেবাস বহির্ভূত গ্রাফিক্স এর কাজ শিখন। সময়োপযোগী বিভিন্ন বিষয় জীবনে সম্পৃক্ত হচ্ছে এবং হবেই। সেক্ষেত্রেও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার সুদূরপ্রসারী প্রভাব অনস্বীকার্য। মানুষের জীবনের চাহিদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন পরিমণ্ডলে এর সরব উপস্থিতি ও প্রক্রিয়া চিরকাল অব্যাহত থাকবে।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার সংজ্ঞা হিসেবে উল্লেখ করা যায় যে, আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যদলের বিশেষ শিখন চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে আলাদাভাবে বা সমন্বিত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে পরিচালিত শিক্ষামূলক কার্যক্রমকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বলা হয়। কিন্তু যেকোনো দেশের শিক্ষাব্যবস্থাতেই উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সমান্তরাল শিক্ষা ব্যবস্থা হতে পারে না। এর মূল লক্ষ্য আনুষ্ঠানিক শিক্ষার ন্যায় সার্টিফিকেট অর্জন নাও হতে পারে। এমনকি শুধু কারিগরি বা ভোকেশনাল শিক্ষা মানেই উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা এ ধারণাটি পুরোপুরি ভ্রান্ত।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নিরক্ষরতামুক্ত দেশ ও সমাজ গড়ার একটি অন্যতম চাবিকাঠি হতে পারে শিক্ষা। সাক্ষর (Literacy) ও স্বাক্ষর (Signature) এ দুটো বিষয়ের মধ্যে যে যোজন যোজন পার্থক্য রয়েছে সেটি বাংলাদেশের শিক্ষিত সমাজের অনেকেই অবগত নয়। আর তাই আক্ষরিক জ্ঞান লাভ বাংলাদেশের সকল জনগণের শুধু মৌলিক অধিকার নয়, আবশ্যিক দায়িত্ব বলে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। কারণ বাংলাদেশের ন্যায় উন্নয়নশীল ও মধ্যম আয়ের দেশে লেখাপড়া শেখা শুধু জ্ঞানার্জন বা অর্থ উপার্জনের মাধ্যম নয়। একই সঙ্গে এটি জীবন পরিচালনা ও জীবন দক্ষতার হাতিয়ার। আমরা নিরক্ষরতামুক্ত স্বপ্নের বাংলাদেশ বিনির্মাণের জন্য কেন এতটা জোর দিয়ে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি, তা তুলে ধরছি-

১. শুরুর দিকে একটা কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা শতভাগ সনদমুখী নয়। এর লক্ষ্য অনেকাংশেই পেশাভিত্তিক। আর বাংলাদেশে এখনও

দারিদ্র্য একটি রাহুর করাল গ্রাসের ন্যায় বিরাজ করছে। সুতরাং অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান-ই এদেশের মানুষের মুখ্য চাহিদা হিসেবে দাঁড়িয়েছে। সেক্ষেত্রে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মধ্য দিয়ে একই সঙ্গে নিরক্ষরতামুক্তি ও পেশাগত শিক্ষা গ্রহণের আর সহজ সমাধান বা বিকল্প হতে পারে না।

২. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা স্বল্পমেয়াদী ও কম ব্যয়বহুল। এটি শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করে এবং সেভাবেই এর সময়সীমা নির্ধারণ করে।

৩. এটি নৈপুণ্য, অভিজ্ঞতা ও কর্মদক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা নিয়ে চিন্তা করে। এটি কোনো কঠোর বা বাঁধাধরা নিয়ম শৃঙ্খলাবদ্ধ নয়। যেমন; যুব উন্নয়নের লক্ষ্যে খামার প্রকল্প, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, কৃষিশিক্ষা। এটি দেশের জনগণকে জনশক্তি, মানবপুঁজি ও মানবসম্পদে পরিণত করে।

৪. বাংলাদেশে আজও অনেক মানুষ আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয় বা ঝরে পড়ে। সেসব মানুষের জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা শিক্ষার দ্বিতীয় সুযোগ হিসেবে কাজ করে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বাস্তবায়ন খুব সহজসাধ্য কাজ, এ কথা খুব হাসিমাখা মুখ নিয়ে এক নিমেষে বলার অবকাশ নেই। যথেষ্ট কাঠখড় পুড়িয়ে তবেই এর সুখকর স্বাদ পরিতৃপ্তি নিয়ে অনুভব করা যাবে। তবে এ কথাটি জোর দিয়েই বলতে চাই যে, কাজটি মোটেও দুঃসাধ্য কিছু নয়। এক্ষেত্রে যেসব পদ্ধতি-সমূহ অনুসরণীয় হতে পারে, সেগুলো হলো-

১. GO-NGO Collaboration. বর্তমানে BNFE, BRAC, ASA, Dhaka Ahsania Mission, CAMPE, JAAGO Foundation সহ বিভিন্ন এনজিওসমূহ শিক্ষার আলো বাংলাদেশের সকল প্রান্তে ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে অনলাইন স্কুলসহ আরও অনেক উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। তবে শুধু এনজিও নয়, সরকারিভাবে এক্ষেত্রে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিভিন্ন সহযোগিতা, বরাদ্দ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

২. বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা পথশিশু ও শ্রমজীবী মানুষদের লেখাপড়ার জন্য স্বেচ্ছায় বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারেন। বর্তমানে যদিও তারা অনেক ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করছেন। এটি সচল রাখার দায়িত্বও তাদেরই। কারণ আজকের শিক্ষার্থীদের হাত ধরেই নতুন দিগন্তের সূচনা হতে পারে।

৩. স্থানীয় প্রশাসনিক উদ্যোগ ও সহযোগিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এবার বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার কিছু লক্ষ্যদল উল্লেখ করছি-

=> গর্ভবতী মা, কিশোর কিশোরী, ও তরুণ তরুণী। কারণ এরা অনেক ক্ষেত্রেই নিজেদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন নয়। এছাড়া গর্ভবতী মায়েরা স্বাস্থ্য সম্পর্কে যথেষ্ট শিক্ষা গ্রহণের মধ্য দিয়ে শিশু মৃত্যুহার অনেক কমিয়ে আনা যায়। দেশকে অশিক্ষা বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্ত করার জন্য কিশোর কিশোরী ও তরুণ-তরুণী

শ্রেণির জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।
=> এখনও অনেক গ্রামীণ জনসাধারণ ভ্রান্ত বা অন্ধ বিশ্বাস, ধর্মের ভুল ব্যখ্যা ও কুসংস্কারাচ্ছন্নতায় আচ্ছন্ন। এ ধরনের পরিবেশ থেকে উত্তরণের জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সাহায্যকারী ভূমিকা পালন করবে।
=>পথশিশু ও শ্রমজীবী শিশুদের অনিশ্চিত জীবনকে আলোকোজ্জ্বল করার ক্ষেত্রে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আশীর্বাদ স্বরূপ।
অতএব, বাংলাদেশের সমাজ বিনির্মাণে ও জীবনের গুনগত মান অর্জনে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা নির্দ্বিধায় অনন্য ভূমিকা পালন করতে পারে।

সহায়ক গ্রন্থ

আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বাংলাদেশ, হোসনে আরা বেগম, ডঃ মোঃ আবদুস সালাম।

নওরীন সুলতানা
শিক্ষা ও গবেষণা ইন্সটিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
সদস্য, এডুকেশন টিম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা সংসদ।

বাংলা ভাষানীতি পরিকল্পনা: একটি সমন্বিত প্রস্তাবনা

মো. দিদারুল ইসলাম*

মুখ্য শব্দগুচ্ছ: বাংলা ভাষা, ভাষাবিজ্ঞান, ভাষা পরিকল্পনা, বাংলা ভাষাবিজ্ঞান, ভাষানীতি

সূচনা

বাংলা ভাষার উৎপত্তি আজ থেকে প্রায় ১ হাজার বছর আগে দশম শতকে (সুনীতিকুমার ১৯২৬)। ঐতিহাসিকভাবে প্রাচীন এবং সাহিত্যিক দিক থেকে সমৃদ্ধ এ ভাষাটিকে ইতিহাসের নানা পর্যায়ে অনেক রকমের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হয়েছে। পাকিস্তানের অধিকাংশ মানুষের মাতৃভাষা হওয়ার পরেও এ ভাষার স্বীকৃতি আদায়ের জন্য বাংলাভাষী জনগোষ্ঠীকে ১৯৫২ সালে রক্তক্ষয়ী আন্দোলন করতে হয়েছে। বিশ্বায়নের যুগেও নানা রকম চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করেই বাংলা ভাষা এগিয়ে যাচ্ছে। অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপুর্ণ অন্যান্য ভাষার সাথে বাংলাকে আজ প্রতিযোগিতা করতে হচ্ছে। যে কারণে ব্যাবহারকারীর দিক থেকে পৃথিবীর ৭ম ভাষা হলেও (ওয়ার্ল্ড ফ্যাক্ট বুক ২০১৮) বাংলা এখনো জাতিসংঘসহ অনেক আন্তর্জাতিক সংস্থার দাপ্তরিক ভাষার স্বীকৃতি পায়নি।

ইন্টারনেটেও বাংলা ভাষার প্রসারকল্পে নানান বাধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। যেমন: ইচ্ছে করলেই ইংরেজি ভাষাকে বিভিন্ন সফটওয়্যারে ব্যবহার করা যাবে, কিন্তু একই কাজ বাংলা ভাষা দিয়ে করতে গেলে পড়তে হবে ফন্ট সমস্যাসহ নানান কারিগরি জটিলতায়। আবার, বাংলা ভাষার প্রমিতকরণ, সুনির্দিষ্ট পঠন-পাঠন নীতিমালা প্রণয়ন, বাংলা ভাষার প্রয়োগক্ষেত্র নির্ধারণও আবশ্যক।

যা হোক, বাংলা ভাষার প্রসার ও উন্নয়নের পথে প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের ক্ষেত্রে তাই প্রথমে প্রয়োজন সঠিকভাবে সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও তদানুযায়ী সমাধানে অগ্রসর হওয়া। এই প্রবন্ধে বাংলা ভাষাকে একটি সমৃদ্ধিশালী আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠাকল্পে কিছু পদ্ধতিগত প্রস্তাবনা পেশ করা হয়েছে। বাংলা ভাষা ব্যাবহারকারীরা কিভাবে বর্তমান পৃথিবীর প্রেক্ষাপটে বাংলা ভাষাকে ভাষাবিজ্ঞানের দিক থেকে একটি সুগঠিত ও কাঠামোবদ্ধ এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে উপযোগী ভাষা হিসেবে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করতে পারেন সে বিষয়ে এখানে আলোকপাত করা হয়েছে। প্রবন্ধটিতে অন্যান্য গবেষকদের মতামত এবং লেখকের মৌলিক কিছু প্রস্তাবনার সমন্বয় রয়েছে।

বাংলাভাষা পঠন-পাঠন নীতিমালা

বাংলাদেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে বাংলা ভাষার পঠন, পাঠন এবং পরীক্ষণের মাঝে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা এবং সমন্বয়ের অভাব রয়েছে। ফলশ্রুতিতে, কাঙ্ক্ষিত মানের ভাষাদক্ষতা অর্জিত হচ্ছে না। উদাহরণস্বরূপ, ভাষার চারটি দক্ষতার (পঠন, লিখন, কথন এবং শ্রবণ) মধ্যে বাংলাদেশে প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে শুধু লিখন (writing) ও পঠন (Reading) দক্ষতা যাচাই করা হয় যেখানে শ্রবণ (listening) এবং কথন (speaking) দক্ষতায় কোনো নম্বর বরাদ্দ নেই

(NCTB 2018)। একজন বাংলাদেশি শিক্ষার্থী উচ্চমাধ্যমিক স্তরে বাংলা ভাষায় প্রমিতরূপে লেখা এবং পড়ার দক্ষতা অর্জন করে, কিন্তু প্রমিত বাংলায় কথা বলার দক্ষতা অনেক ক্ষেত্রেই অর্জন করতে পারে না। যার ফলে, শিক্ষার্থীদের উচ্চারণ (Pronunciation) এবং কথার (accent) মধ্যে আঞ্চলিকতার রেশ থেকে যায়। সুতরাং উচ্চমাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত বাংলাভাষা পাঠ্যক্রমে কথন (Speaking) অন্তর্ভুক্ত করলে শিক্ষার্থীরা প্রকৃত ভাষাদক্ষতা অর্জন করতে পারবে।

বাংলা ভাষার বিদেশি শিক্ষার্থীদের জন্যে বিজ্ঞানসম্মত কোর্সবুক প্রণয়ন

পেশাগত নানান প্রয়োজনে অনেক বিদেশি ভাষাভাষী বাংলা শিখে থাকেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইন্সটিটিউট, ড্যাফোডিল ইন্সটিটিউট অব ল্যাঙ্গুয়েজেস-সহ আরো অনেক প্রতিষ্ঠানে বিদেশিদের জন্য বাংলা শেখার ব্যবস্থা আছে। বিদেশিদের ভাষা শেখানোর পদ্ধতি আর একজন বাংলাভাষীকে বাংলা শেখানোর পদ্ধতি ভিন্ন। মনসুর মুসাসহ কয়েকজন গবেষক বাংলা ভাষা শেখার উপকরণ তৈরীর প্রয়াস পেলেও তা অপর্যাপ্ত। বিদেশিদের ভাষা শেখাতে প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের অভাবে শিক্ষকদের অনেক বেগ পেতে হয়। ইংরেজি শেখার জন্য যেমন ধাপ অনুযায়ী Cambridge Series, Headway Series ইত্যাদি সরঞ্জাম আছে তেমনি করে বাংলা ভাষার কোর্সবুক ও অন্যান্য উপকরণ তৈরি করা জরুরি।

আন্তর্জাতিকমানের দক্ষতা যাচাই পরীক্ষা প্রণয়ন

একজন শিক্ষার্থী বাংলা ভাষায় ঠিক কতটুকু দক্ষ তা পরিমাপের কোনো আদর্শ পরীক্ষার ব্যবস্থা এদেশে নেই। জাতীয় শিক্ষাক্রমের একজন শিক্ষার্থী হয়তো বলবে- আমি বাংলায় এ প্লাস পেয়েছি, আবার ইংরেজি মাধ্যমের একজন শিক্ষার্থী অন্য কোনো মানদণ্ড দিয়ে তার ভাষাদক্ষতা বিচার করবে। অন্যান্য ভাষার ক্ষেত্রে একজন শিক্ষার্থীর ভাষাদক্ষতা যাচাই করার জন্যে নানা ধরনের মানদণ্ড প্রচলিত আছে, যেমন: ইংরেজির জন্য IELTS বা TOEFL; ফ্রেঞ্চের জন্যে DELF, স্পেনিশের জন্যে DELE, জাপানিজের জন্যে JLPT ইত্যাদি। একজন ভাষা শিক্ষার্থী তার অর্জিত IELTS স্কোর উল্লেখ করলে সহজেই বোঝা যাবে সে ইংরেজি ভাষায় কতটুকু দক্ষ। বাংলা ভাষাদক্ষতা পরিমাপের জন্যে এমন আন্তর্জাতিক মানের পরীক্ষা প্রণয়ন করা হলে সহজেই কারো ভাষাদক্ষতা পরিমাপ করা যাবে।

ইন্টারনেটে ও ইলেকট্রনিক ডিভাইসে বাংলা ব্যবহার

ব্যাবহারকারীর দিক থেকে পৃথিবীর ৭ম ভাষা হলেও ইন্টারনেটে বাংলা ভাষায় কন্টেট রয়েছে ০.১ শতাংশেরও কম (Web Technology Survey 2018)। অনলাইনে বাংলাভাষায় লেখালেখি করতে বা কম্পিউটারে বিভিন্ন কাজে বাংলা ব্যবহার করতে ব্যবহারকারীদের পোহাতে হয় নানান ঝামেলা। অনলাইনে বাংলা ভাষা ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার এবং টুলসের অপর্যাপ্ততাই এর প্রধান কারণ। বাংলা বানান ও ব্যাকরণ শুদ্ধিকারক (spelling and grammar checker), কুম্ভিলকবৃত্তি নির্ণায়ক (Plagiarism checker), বই বা টেক্সট স্ক্যান করার জন্য ওসিআর (OCR) সফটওয়্যার, কর্পাস ভাষাবিজ্ঞান (Corpus

Linguistics) এর সাহায্যে গুগল ট্রান্সলেটর বা বাংলা অন্য কোনো অনুবাদক প্রোগ্রাম (Translator program) ইত্যাদি এখনো পর্যাপ্ত নয়। ইন্টারনেটে ও ইলেকট্রনিক ডিভাইসে বাংলা প্রচলনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছে 'বিজয়' এবং 'অভ্র' নামের দুটি সফটওয়্যার। 'বিজয়' সফটওয়্যারটি বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে তৈরি হলেও 'অভ্র' সফটওয়্যারটি উন্মুক্ত এবং বিনামূল্যে পাওয়া যায়। এসব সফটওয়্যারকে আরো উন্নত করলে বাংলা ভাষাও লেখালেখি এবং গবেষণার জন্য একটি যুগোপযোগী ভাষা বলে বিবেচিত হবে।

প্রমিতকরণ

ইংরেজিসহ পৃথিবীর অনেক ভাষার প্রতিষ্ঠিত এক বা একাধিক প্রমিত রূপ আছে যেমন; আমেরিকান ইংরেজি, ব্রিটিশ ইংরেজি, মিশরীয় আরবি, ম্যাক্সিকান স্প্যানিশ ইত্যাদি। দুঃখজনকভাবে, বাংলা ভাষা প্রমিতকরণে প্রতিষ্ঠানগুলোর নীতিমালা এখনো সুস্পষ্ট নয়। যেমন, রেডিও টেলিভিশনসহ প্রচার মাধ্যমের ভাষার অনুসরণীয় মানদণ্ড কী হবে তা নির্ধারিত নয়। ইংরেজির ক্ষেত্রে যেমন বিবিসি এ্যাক্সেন্ট (BBC accent) বহুল প্রচলিত তেমনিভাবে বাংলার জন্য বিটিভি এ্যাক্সেন্ট (Bangladesh Television Accent) একটি আদর্শ মানদণ্ড হতে পারে।

ভাষাজরিপ করা

ভাষা প্রবাহিত নদীর মতোই বহমান, সর্বদা পরিবর্তনীয়। একটি দেশে থাকতে পারে অনেক ভাষা, আবার একই ভাষার থাকতে পারে অনেক রূপ বা উপভাষা। তাই একটি ভাষা সম্পর্কে এমন বিস্তারিত তথ্যের জন্য প্রয়োজন হয় ভাষাজরিপের। ১৮৮৬ সালে জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ার্সন নামের এক ব্রিটিশ রাজকর্মচারী বাংলাসহ ভারতীয় ভাষাগুলোর ভাষাজরিপ শুরু করেন যা ১৯২৮ সালে Linguistic Survey of India নামে প্রকাশিত হয়। গ্রিয়ার্সনের গবেষণার পরে এ পর্যন্ত বাংলাদেশে তথা বাংলা ভাষার কোনো পূর্ণাঙ্গ ভাষাজরিপ হয়নি। তাই অনতিবিলম্বে বাংলাদেশের একটি ভাষাজরিপ প্রয়োজন, যা বাংলাকে প্রমিতকরণে ও ভাষাগত নীতিমালা প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে সহায়তা করবে।

প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়সাধন

বাংলাদেশে এবং ভারতে বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও ভাষাবিজ্ঞান নিয়ে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান কাজ করে থাকে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো বাংলা একাডেমি, বাংলা আকাদেমি (কলকাতা), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্সটিটিউট, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইন্সটিটিউট, বাংলা বিভাগ, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ ইত্যাদি। এছাড়াও অনেক ব্যক্তি ও গবেষক প্রতিনিয়ত বাংলা নিয়ে গবেষণা করে যাচ্ছেন। এসব প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির কাজের সমন্বয়ের যথেষ্ট অভাব রয়েছে, যার ফলে এক প্রতিষ্ঠান অন্য প্রতিষ্ঠানের কাজ সম্পর্কে জানতে পারছে না এবং সহযোগী প্রকল্পও (Collaborative projects) বাস্তবায়ন করতে পারছে না। বাংলা ভাষাসংক্রান্ত সকল কাজের জন্য একটি সমন্বিত

প্ল্যাটফর্ম যদি থাকে তাহলে সবাই একে অপরের কাজ সম্পর্কে জানতে পারবে এবং তদানুযায়ী অগ্রসর হতে পারবে। তাই এসব প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে একটি জার্নাল এবং অনলাইন ডিরেকটরি (Online Directory) প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

ব্যবহারকারী জরিপ

বাংলা ভাষার কয়েক স্তরের ব্যবহারকারী রয়েছে। কেউ হয়তোবা বাংলা ভাষায় বই লিখছেন বা প্রকাশ করছেন, কেউ হয়তো বিভিন্ন সফটওয়্যারে বাংলা ভাষা ব্যবহার করছেন। কারো হয়তোবা প্রতিদিন ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ করতে গুগল ট্রান্সলেটরের সাহায্য নিতে হচ্ছে। বাংলা ভাষার কোনো অধ্যাপক হয়তো একটি বাক্যের গঠন নিয়ে বিতর্ক করছেন। বাংলা ভাষা নিয়ে কাজ করতে গিয়ে ব্যবহারকারীরা তাদের বাস্তব জীবনে নানান অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন। সরকার বা বাংলা ভাষা নিয়ে নীতিমালা প্রণয়ন করেন এমন প্রতিষ্ঠান যদি ব্যাবহারকারীদের এসব সমস্যা অনুধাবন করতে ব্যর্থ হন তাহলে বাংলা ভাষার উন্নয়ন দিবাস্বপ্নই থেকে যাবে। সুতরাং ব্যাবহ-ারকারী জরিপের মাধ্যমে ব্যবহারকারীদের মুল্যায়ন, পর্যালোচনা এবং সুপারিশ আমলে নিয়ে নীতিমালা প্রণয়ন করলে তা বাংলা ভাষা ও এর ব্যবহারকারীদের জন্য সুফল বয়ে আনবে।

উপসংহার

এই প্রবন্ধে মূলত বাংলা ভাষা পরিকল্পনার একটি সারসংক্ষেপ বা রূপরেখা প্রদান করা হয়েছে। উল্লিখিত প্রস্তাবনাগুলো নীতিনির্ধারকেরা বিবেচনা করে পদক্ষেপ গ্রহণ করলে বাংলা ভাষার শিক্ষক, শিক্ষার্থী, গবেষক, অন্যান্য ব্যাবহারকারী তথা বাংলাভাষী জনগোষ্ঠী বিশেষভাবে উপকৃত হবে। বাংলা ভাষার আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিষ্ঠালাভই হোক প্রত্যাশা।

তথ্যসূত্র

01. Chatterji, SK 1926, The origin and development of the Bengali language, Calcutta.

02. CIA 2018, The World Factbook Í Central Intelligence Agency. www.-cia.gov. Retrieved 2018-02-21.

03. Glassie, H & Mahmud, F 2008, Living Traditions. Cultural Survey of Bangladesh Series-II, Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka.

04. Grierson, GA 1928, Linguistic Survey of India 1898-1928.

05. http://www.nctb.gov.bd/ viewed 3 July 2018

06. Web Technology Survey 2018, https://w3techs.com/technolo-gies/overview/content_language/all Viewed 4 November 2018

মো. দিদারুল ইসলাম
শিক্ষার্থী, ইংলিশ ফর স্পিকারস অব আদার ল্যাঙ্গুয়েজেস
ইংরেজি ভাষা বিভাগ, আধুনিক ভাষা ইন্সটিটিউট

ছোট দেশের বড় স্বপ্ন

রউফুল আলম*

বাংলাদেশের সবচেয়ে ছোট জেলার নাম মেহেরপুর। এই মেহেরপুর জেলার আয়তনসম পৃথিবীর একটি দেশ আছে। দেশটির নাম সিঙ্গাপুর। সিঙ্গাপুর হল দুনিয়ার এক বিস্ময়কর দেশ। ধনে, জ্ঞানে, বৈচিত্র্যতায় এত ক্ষুদ্র একটা দেশ, এত সমৃদ্ধ হতে পারে সিঙ্গাপুরকে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। এ এক বিরল দেশ! সম্প্রতি এই দেশটি এশিয়ার সবচেয়ে ইনোভেটিভ (উদ্ভাবনক্ষমতাসম্পন্ন) দেশ হিসেবে নাম করেছে। যে দেশের জনসংখ্যা মাত্র আধাকোটি, সে দেশটি কী করে উদ্ভাবনে দুনিয়াখ্যাত হয় ভাবতেই বিস্মিত হই!

সিঙ্গাপুরের এক নম্বর ইউনিভার্সিটির নাম এনইউএস (ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব সিঙ্গাপুর)। এই এক ইউনিভার্সিটি সিঙ্গাপুরকে বহুদূর নিয়ে গেছে। এই প্রতিষ্ঠানটি এখন এশিয়ার স্ট্যানফোর্ড! ওয়ার্ল্ড র‍্যাঙ্কিংয়ে প্রথম কুড়িটির একটি। এই প্রতিষ্ঠানটি বয়সে আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে পনের বছর বড়। কিন্তু অপ্রিয় হলেও সত্য- এটি গবেষণা, উদ্ভাবন আর শিক্ষার মানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পনেরশ ক্রোশ এগিয়ে গেছে যেন।

সিঙ্গাপুর তাদের জিডিপির ২.২% খরচ করে গবেষণায়। সে হিসেবে প্রায় দশ বিলিয়ন ইউএস ডলার। অর্থাৎ আমাদের জাতীয় বাজেটের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ তারা শুধু গবেষণাতেই ব্যায় করে। তাদের দেশে প্রায় চল্লিশ হাজার গবেষক। অর্থাৎ আধাকোটি মানুষের দেশে আধা-লাখ গবেষক! ভাবা যায়! এই দেশটির লক্ষ্য, দুনিয়ার বুকে উদ্ভাবনে অনন্য হওয়া। ষাটের দশকে স্বাধীন হওয়া সিঙ্গাপুরের এই বিস্ময়কর এগিয়ে যাওয়ার জাদুরকাঠির নাম 'শিক্ষা এবং গবেষণা'। যেমন তেমন গবেষণা নয়। কিংবা মানুষকে ভাওতাবাজি দেয়া গবেষণাও নয়। হালের সর্বাধুনিক গবেষণায় দিন-রাত খাটছে ওদের গবেষকরা।

সিঙ্গাপুর তার তরুণ ছেলেমেয়েদের পাঠিয়ে দিয়েছে জাপান, জার্মানি, যুক্তরাষ্ট্র এইসব দেশগুলোতে। সেসব তরুণদের বয়স বাইশ-চব্বিশ বছর। তাদের কেউ হয়তো ন্যানো-সাইন্স পড়ছে, কেউ এরোস্পেস কিংবা কেউ আর্টিফিসিয়াল ইন্টিলিজেন্স নিয়ে গবেষণা করছে। এই তরুণদের জন্য দেশে যেমন শিক্ষা ও গবেষণার পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে, তেমনি সারা দুনিয়ার সেরা সেরা প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। এইসব তরুণদেরকে আবার সরকার অনেক টাকার প্রকল্প দিয়ে দেশে নিয়ে যাচ্ছে। সরকার দেবে টাকা, তরুণরা দেবে মেধা। থাকবে সবোর্চ্চ জবাবদিহিতা। এই ধারাবাহিকতায়, সে দেশ এখন 'ইনোভেশন হাব' হয়ে উঠেছে।

পৃথিবীর অন্যতম ছোট একটি দেশ সরা দুনিয়াকে তাক লাগানোর জন্য উদ্ভাবনের পেছনে ছুটছে। যে পরিমাণ অর্থ তারা ব্যয় করছে, সেটা বহু ধনী দেশও করার সাহস করছে না। কিন্তু সিঙ্গাপুর জানে, উদ্ভাবনে সেরা হওয়ার মানেই হলো দুনিয়ার সেরা হওয়া। তাই ওদের দেশটা ছোট হলেও, স্বপ্নটা অনেক বড়। সেই স্বপ্নের পথে বহুদূর এগিয়েছে সিঙ্গাপুর!

* রউফুল আলম
বিজ্ঞানী, ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি, নিউজার্সি, যুক্তরাষ্ট্র

সত্যের অন্বেষণ: অনুসন্ধান ও গবেষণা

মোঃ ইউনুছ*

মুখ্য শব্দগুচ্ছ: সত্য, অন্বেষণ, অনুসন্ধান, গবেষণা

ধরা যাক, আমার মনে একটা প্রশ্নের উদয় হল। আমি জানতে চাই, শীতকালে কেন শীত অনুভূত হয়? আমার প্রশ্নটা শুনে অনেকেই হেসে ফেলেছেন হয়তো। কী বোকার মত প্রশ্ন! তাই না? শীতকালেই তো শীত অনুভূত হবে। গরমকালে গরম লাগবে। এটাই তো স্বাভাবিক। হ্যাঁ, তাহলে আমার প্রশ্নের গ্রাউন্ড আপনার মর্মে প্রবেশ করেনি। এটা ঠিক যে, সাধারণ মানুষ এই উত্তরটাই দেবে, শীতকালেই শীত লাগবে- এটাই স্বাভাবিক। এটা নতুন করে প্রশ্ন করার কী আছে? কিন্তু একজন গবেষকের কাছে এটি মোটেই কোনো সাধারণ বা হাস্যকর প্রশ্ন নয়। একজন সাধারণ মানুষ এবং গবেষকের মাঝে পার্থক্য এখানেই।

তাহলে বিভিন্ন ব্যাপারে যারা বিশেষজ্ঞ, অর্থাৎ সাধারণ মানুষের চেয়ে যারা একটু বেশি জ্ঞান রাখেন, তাত্ত্বিকভাবে কোনো বিষয় ব্যাখ্যা করতে পারেন, তাদের কাছে জিজ্ঞেস করে দেখা যাক তারা কী বলেন।

ধরা যাক, একজন আবহাওয়াবিদকে জিজ্ঞেস করলাম, শীতকালে শীত কেন লাগে? আবহাওয়া বিজ্ঞানী হয়তো বলবেন, বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা ঋতুভেদে পরিবর্তিত হয়। পৃথিবীর আহ্নিক গতি অনুযায়ী বায়ুপ্রবাহের দিক এবং সমুদ্রস্রোতেরও দিক পরিবর্তিত হয়। এছাড়াও আমাদের ভূভাগ যখন সূর্য থেকে একটু দূরে সরে যায়, তখন সূর্যালোক তীর্যকভাবে পতিত হয়। তখন সূর্যের তাপ কম থাকে, বায়ুপ্রবাহ ও সমুদ্রস্রোতের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণে বায়ুমণ্ডলও ঠাণ্ডা থাকে। এই ঠাণ্ডা আবহাওয়াগত অবস্থাকেই আমরা শীতকাল বলি।

এবার আমরা চললাম একজন নিউরোলজিস্টের কাছে। দেখি তিনি কী বলেন। নিউরোলজিস্ট হয়তো বলবেন, শীত বা গরম যাই আমরা অনুভব করি, সেই অনুভব করার কাজ করে আমাদের ত্বকের স্নায়ুতন্ত্র। আমাদের চারপাশে যে বায়ু আছে, তার নিজস্ব তাপমাত্রা রয়েছে। এই তাপমাত্রা আমরা অনুভব করি যখন আমাদের ত্বকসংলগ্ন বায়ুস্তর আমাদের ত্বকের স্পর্শে আসে। তখন সংলগ্ন বায়ুস্তরের তাপ আর আমাদের দেহের তাপ একসাথে স্পর্শিত হয়। তখন বায়ুর তাপ যদি আমাদের দেহের তাপের চেয়ে কম হয়, তখন স্বল্প তাপের বায়ু আমাদের ত্বকের তুলনায় ঠাণ্ডা অনুভূত হয়। আবার বায়ুস্তরেরর তাপ যদি আমাদের দেহের তাপের চেয়ে বেশি হয়, তখন সংলগ্ন বায়ুস্তর আমাদের কাছে তুলনামূলকভাবে গরম মনে হবে। নিউরোলজিস্ট হয়তো একটা উদাহরণও দেবেন যে, আমরা যখন এসি গাড়িতে থাকি, তখন এসির ঠাণ্ডা বাতাসে আমাদের দেহ অভ্যস্ত হয়। গাড়ির ভেতরের এসি বাতাসের চেয়ে বাইরের

বাতাস বেশি গরম। তারপর গাড়ি থেকে যখন বের হই, তখন আমাদের গাড়ির ভেতরের ঠাণ্ডা বাতাসে অভ্যস্ত দেহ হঠাৎ করেই অপেক্ষাকৃত বেশি গরম বাতাসের সংস্পর্শে আসে। তখন এসি গাড়ি থেকে বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিছুক্ষণ পর্যন্ত আমাদের একটু বেশি গরম লাগে। তারপর আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যায়।

চমৎকার ব্যাখ্যা দিলেন নিউরোসায়েন্স বিশেষজ্ঞ। এই ব্যাখ্যাটা আবহাওয়াবিদের ব্যাখ্যা থেকে পৃথক।

এবার আমরা চললাম একজন ভূগোলবিদের কাছে। তাকেও একই প্রশ্ন করলাম।

ভূগোলবিদ টেবিলের ওপর থেকে তার গ্লোবটি নিলেন। ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে গ্লোবটি টেবিলের ওপর এক পাশে রাখলেন। তারপর তার পাশে একটি মোমবাতি জ্বালিয়ে দিলেন। এবার রুমের লাইট অফ করে দিলেন। দেখতে পাচ্ছো? ভূগোলবিজ্ঞানী মজার সঙ্গে আমাদেরকে শীত গরম শেখাতে লাগলেন। এবার হয়তো তিনি বলবেন, দেখো দেখো, মোমবাতির আলো কেথায় এসে পড়ল? ফুটবলের মতো গোলাকার গ্লোবের মাঝামাঝি জায়গায়। মনে করো, মোমবাতিটা সূর্য আর গ্লোবটা পৃথিবী। তাহলে গ্লোবটা গোলাকার হওয়ার কারণে গ্লোবের পুরো পৃষ্ঠে সূর্যের আলো সমানভাবে পড়ছে না। মোমবাতি থেকে গ্লোবের মাঝামাঝি জায়গায় লম্বভাবে আলো পড়ছে আর গ্লোবের উপরে এবং নিচে একটু বাঁকা হয়ে আলো পড়ছে। বাঁকা হয়ে পড়ার কারণে এখানে আলো ও তাপ কম। ঠিক এমনই, পৃথিবীও গোল হওয়ায় পৃথিবীর যেসব জায়গায় আলো খাড়াভাবে পড়ে, সেসব জায়গার নাম নিরক্ষীয় অঞ্চল। আর নিরক্ষীয় জায়গায় তাপও বেশি হয়। পৃথিবীর বার্ষিক গতির ফলে, বছরে দুইবার পৃথিবী হেলে যায়। একবার উত্তর দিক সূর্যের দিকে এগিয়ে আসে এবং দক্ষিণ দিক সূর্য থেকে দূরে চলে যায়, আরেকবার দক্ষিণ দিক সূর্যের দিকে হেলে যায় এবং উত্তর দিক একটু দূরে সরে যায়। তখন নিরক্ষীয় অঞ্চলে সূর্যের খাড়াভাবে পতিত হওয়া আলোও একবার উত্তর দিকে ২৩.৫ ডিগ্রি এবং দক্ষিণ দিকেও ২৩.৫ ডিগ্রি পর্যন্ত ওঠানামা করে। সূর্য যখন যে জায়গার ওপর থাকে, তখন সে জায়গায় তাপ বেশি হয়, অপর জায়গায় তাপ কম হয়। শীতকালে বা নভেম্বরের পর থেকে আমাদের ভূভাগ সূর্য থেকে দূরে চলে যায়, তাই আমরা কম তাপ অনুভব করি এবং শীত লাগে। ভূগোলবিদের empirical ব্যাখ্যাটাও সঠিক মনে হল, যদিও আগের দুটি ব্যাখ্যার সঙ্গে এই ব্যাখ্যারও মিল ছিল না। ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা অথচ সবগুলো বর্ণনাই সঠিক মনে হচ্ছে!

আচ্ছা এবার আমরা আরেকজন বিশেষজ্ঞের কাছে যাব। মনে করি একজন নৃবিজ্ঞানী বা একজন সমাজবিজ্ঞানীর কাছে গেলাম। জিজ্ঞেস করলাম একই প্রশ্ন।

সমাজবিজ্ঞানী এক যুগান্তকারী বাক্য বলে আমাদেরকে মোহাবিষ্ট (stunning) করে ফেললেন। তিনি বললেন, আসলে শীত বা গরম বলতে কিছু নাই। আমরা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলেন তো স্যার?

উনি এবার ব্যাখ্যা শুরু করলেন। শোনো, আমরা যেটাকে শীতকালের শীত বলি, সেটা শুধু আমাদের ক্ষুদ্র অনুভূতি মাত্র। তুমি এপ্রিল মাসে দেখো, আমাদের দেশের তাপমাত্রাকে তুমি গরম মনে করবে। কিন্তু এপ্রিল মাসেই তুমি কানাডায় যাও, যুক্তরাষ্ট্রে যাও, দেখবে সেখানে তোমার শীত লাগবে। তাহলে গরমকাল কোথায় গেল? বিমানে করে ১০ ঘণ্টা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তোমার গরমকাল শীতকালে পরিণত হয়ে গেল! সুইডেনে বা স্ক্যান্ডিনেভীয় দেশগুলোতে তুমি যে সময়ই যাও, তোমার কাছে সেই দেশে শীত মনে হবে। তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়ালো? শীত বা গরম কোনো কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। আমাদের দেশে হয়ত শীতকাল বা গরমকাল আছে, কিন্তু আমাদের কাছে যেটা গরমকাল, ঠিক সেই সময়ে সুইডেনে তোমার জন্য শীতকাল।

সমাজবিজ্ঞানী স্যার এবার G.H. Mead বা C. H. Cooley এর থিওরি বোঝানো শুরু করলেন। দেখো, আমরা আমাদের সামাজিক সাংস্কৃতিক জীবনে যা কিছু করি, দেখি, অনুভব করি, সবই হলো আমাদের সামাজিকীকরণ বা Socialization এর ফল। তুমি ছোটবেলা থেকে সাদা রং কে 'সাদা' হিসেবে শিখেছ, কালো রংকে 'কালো' হিসেবে শিখেছ। তাই তুমি বড় হয়েও ওই রকম রং দেখলে সাদা বা কালো বলছ। কিন্তু কালো তো আসলে কোনো রং না, কালো হলো কোনোরকম রংয়ের অনুপস্থিতি। তাহলে, তুমি যেভাবে শিখে এসেছ, সেভাবেই তুমি সারাজীবন ওই বিষয়গুলোকে ব্যাখ্যা করো। শীত বা গরমও ঠিক এমনই। তোমাকে ছোটবেলায় পৌষমাস এলে অনেকগুলো কাপড়ে জড়িয়ে রাখা হতো। ফলে তুমিও শিখতে শুরু করেছ যে, পৌষমাস এলে অনেকগুলো কাপড় গায়ে দিতে হয়। যদি তোমাকে সারাবছর একই রকম কাপড় দিয়ে রাখা হতো, তুমি সেটাই শিখে ফেলতে; অভ্যস্ত হয়ে যেতে এক রকম কাপড়েই সারাবছর যেকোনো আবহাওয়ায় কাটাতে। সমাজবিজ্ঞানী এখন ইতিহাস থেকে বোঝানো শুরু করলেন। মনে করো, পঞ্চাশ হাজার বছর আগে মানবসমাজ যখন বিবর্তনের এক পর্যায়ে অস্ট্রালোপেথিকাস থেকে উন্নত হয়ে Homosepiens বা অনেকটা আমাদের মতো আকৃতির আধুনিক মানুষে রূপান্তরিত হলো, তখন এই পৃথিবীতে বরফযুগ চলছিল। পঞ্চাশ হাজার বছর থেকে দশ হাজার বছর পূর্ব পর্যন্ত সময়ে পৃথিবী ঠাণ্ডা হয়ে সমুদ্রের পানি সব বরফ হয়ে গিয়েছিল। তখন ভারত মহাসাগর, আটলান্টিক মহাসাগরের পানিও বরফ হয়ে গিয়েছিল। ঠিক সেই সময়ে, চল্লিশ হাজার বছর পর্যন্ত বরফের মাঝেও হোমোসেপিয়েন্সরা পৃথিবীতে বেঁচে ছিল। তারা প্রথমে মধ্য এশিয়াতে ছিল। বরফ জমে সমুদ্রের পানি শক্ত হয়ে যাওয়ার পর তারা হাঁটতে হাঁটতে এশিয়া থেকে উত্তরের দিকে গেল। বর্তমান রাশিয়ার পশ্চিম দিক থেকে তারা আরও পশ্চিমে যাত্রা করল। আটলান্টিকের বরফের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তারা উত্তর আমেরিকায় চলে গেল। এর আগে সেখানে কোনো মানুষ ছিল না। তারপর যখন বরফ যুগ চলে গেল, তখন আটলান্টিক মহাসাগরে পানি চলে এল।

এবার উত্তর আমেরিকার হোমোসেপিয়েন্সরা আমাদের এশিয়া এবং ইউরোপ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। তাদের সঙ্গে আমাদের আর কোনো যোগাযোগ ছিল না ১৪৯৮ সাল পর্যন্ত। যখন ক্রিস্টোফার কলম্বাস আমেরিকাতে গিয়ে আমাদের পূর্বপুরুষ বংশধরদের আবিষ্কার করেছিলেন, তাঁরা সেই সময়েই অনেক ঠাণ্ডার মাঝেই বেঁচে থাকতে পারত। তাই উত্তরের মেরু অঞ্চলের মানুষেরা এখনও ঠাণ্ডায় অনায়াসে বেঁচে থাকতে পারে।

একজন ধর্মীয় বিশেষজ্ঞ বা ধর্মযাজক বা আলেম/পাদ্রি/ ঠাকুর/গুরু কে জিজ্ঞেস করা হোক। তিনিও হয়ত একটা মতামত দেবেন।

ধর্মবিশেষজ্ঞ ব্যাখ্যা দিলেন, মানবজাতির জন্য যা যা কল্যালণকর-প্রয়োজন, তার সবই স্রষ্টা আমাদেরকে পৃথিবীতে দিয়েছেন। তা না হলে মানুষ বেঁচে থাকতে পারত না। শীত গরম কেউ বানাতে পারে না। এটা বিধাতার সৃষ্টি। তাহলে, শীত বা গরম-এসবই আমাদের জন্য প্রয়োজন। এগুলো বিধাতার নিকট হতে প্রাপ্ত নেয়ামত (অনুগ্রহ)। শুধু গরম থাকলে সব মরুভূমি হয়ে যেত বা শুধু শীত থাকলেও বসবাসের অনুপযোগী হয়ে যেত এই পৃথিবী। তাছাড়াও, মৃত্যুর পরের জীবনে হিসাবের পর আমাদের জন্য রয়েছে শাস্তি। শাস্তি দেওয়া হবে এই ঠাণ্ডা এবং গরম দিয়েই। তাই পার্থিব জগতের এই গরম বা ঠাণ্ডা তো আমাদের জন্য নিদর্শন এবং সতর্কবাণী। আমাদেরকে স্রষ্টা প্রচণ্ড গরম দিয়ে পরীক্ষা করেন, আবার প্রচণ্ড শীত দিয়েও পরীক্ষা করেন, আমরা তার ওপর কতটুকু বিশ্বাস রাখি, ভয় করি। আর আমাদের বেঁচে থাকার জন্যও প্রয়োজন তাপমাত্রার বৈচিত্র্য। তা না হলে সব একঘেয়ে হয়ে যাবে। তাই আমাদের জন্য অনুগ্রহ হিসেবেই তিনি এগুলো দিয়েছেন। তিনি দেখতে চান মানবজাতি তাঁর শুকরিয়া আদায় করে কিনা। তিনি মাঝেমাঝে প্রচণ্ড শীত বা গরম দিয়ে তার বান্দা বা ভৃত্যদের ধৈর্য পরীক্ষা করতে চান। এটা বিশ্বাস বা ঈমানের পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হবে, তারাই সফলকাম।

ছোট একটা প্রশ্নই ছিল, 'শীতকালে কেন শীত লাগবে?'

কত বৈচিত্রময় ব্যাখ্যা আমরা পেয়েছি! বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে, ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে, ভিন্ন বিষয়ভিত্তিক ব্যাখ্যা আমরা পেলাম। এখন যদি সবগুলো উত্তরকে একসঙ্গে প্রশ্ন করি, কোন উত্তরটি আসলে সঠিক? আপনি কী বলবেন? সবগুলো ব্যাখ্যা থেকেই কতগুলো সাধারণ ব্যাপার পরিলক্ষিত হয়। সেটা হল, প্রত্যেক বিশেষজ্ঞের ব্যাখ্যাই তার নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে সে সত্য মনে করেন (এটা সত্য হতে পারে, আবার নাও হতে পারে)। দ্বিতীয়ত, প্রত্যেক ব্যাখ্যাকারীই শুধু তার নিজস্ব ক্ষেত্র (area of discipline) থেকে উত্তর দিয়েছেন।

ব্যাখ্যাগুলো ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু আমরা কোনোটাকেই একেবারে অগ্রহণযোগ্য বা একেবারেই গ্রহণযোগ্য বলতে পারছি না। সত্য যদি হয়, একটিই হওয়ার কথা। তাহলে এত ভিন্ন ভিন্ন মত কেন? সাধারণ মানুষের মাঝে কোনো মতামত নেই।

কারণ, তারা হয়তো ব্যাখ্যা জানেন না বা তত্ত্ব নির্মাণ করতে পারেন না অথবা গভীরে যেতে পারেন না। তাদের গবেষণামূলক পদ্ধতিও জানা নেই, তাই তাদের সবার উত্তর একইরকম হয়, 'শীতকালেই তো শীত লাগবে, গরমকালে তো আর শীত লাগবে না'। অর্থাৎ ব্যাপারটি কি 'অতি সন্যাসীতে গাজন নষ্ট'- এর মতো হয়ে গেল? মোটেই না।

এর ব্যাখ্যা আসে Determinism থেকে। একজন মানুষ যা আচরণ করে, যা চিন্তা করে বা কাজ করে, সবকিছুই determined হয় কিছু factors দ্বারা।

থেলিস (Thales) কে গ্রীসের প্রাচীনতম বিজ্ঞানী বলে মনে করা হয়। থেলিসের বসবাসের চারপাশে ছিল পানি, জলভাগ। তাই থেলিস মনে করতেন, সবকিছুই হয়ত পানি থেকে সৃষ্টি হয়েছে। কার্ল মার্ক্স (Karl Marx) যে সময়ে জন্মেছিলেন এবং বড় হয়েছিলেন, তখন অষ্টাদশ শতকে ইউরোপে সামন্তবাদী সমাজ (Feudal society) ভেঙ্গে পুঁজিবাদী সমাজে পরিণত হওয়া শুরু করল। পুঁজিবাদের ইতিহাস ছিল শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস। তখন মার্ক্সের চোখে সব জায়গায়ই দেখা যেত শুধু সামাজিক শ্রেণীবিভেদ বা class struggle, economy, conflict ইত্যাদি। তিনি তার বিখ্যাত Communist Manifesto বইয়ের প্রথম লাইনেও তাই লিখেছিলেন, "The history all of hitherto existing society is the history of class struggle".

তাহলে এই দাঁড়াল, মানুষের মন মানসিকতা (cognition), চিন্তা (philosophy), আচরণ (Behavior) সবকিছুই নির্ধারিত হবে আমি যা শিখেছি, যেভাবে ছোট থেকে বড় হয়েছি তার ওপর। তাহলে, আমি যদি কোনো কিছুর সমাধান জানতে চাই, তাহলে আমি কাকে প্রশ্ন করব? সবাই তো নিজস্ব অর্জিত জ্ঞান থেকেই উত্তর দেবেন। সব জ্ঞানের সমন্বয়ে উত্তর খুঁজব? আর, একজন মানুষ সবকিছু কখনোই জানতে পারে না। তাহলে প্রকৃত সত্য বা reality আমরা নির্ধারণ করব কীভাবে?

অন্তত যে যেই ব্যাখ্যাই দিক না কেন, সবগুলোই গবেষণামূলক অনুসন্ধানের ফল। জ্ঞানের সৃষ্টি, অর্জন আর প্রসারে গবেষণা না থাকলে মূলত অন্ধ হয়েই থাকতে হয়।

মো. ইউনুস আলী
রিসার্চ ম্যানেজার, জেন্ডার এন্ড ডেভেলপমেন্ট টিম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা সংসদ

হতাশায় নয়, প্রত্যাশায় বাঁচুন

শান্তা তাওহিদা*

অসীম চাহিদা আর সসীম সম্পদের দ্বন্দ্বটা আমাদের বাস্তবতার খুব পরিচিত এক চিত্র। এ কারণেই আমাদের প্রত্যাশা আর প্রাপ্তির মাঝে এত ব্যবধান, যে ব্যবধান আমাদের টেনে নামাতে পারে হতাশার কালো গহ্বরে। জীবনে ক্ষণিকের অপ্রাপ্তি মেনে না নিতে পেরে কেউ কেউ বেছে নেন আত্মহননের পথ। যে পথ কোনো সমাধানের পথ নয়। তাই হতাশার কালো গহ্বর থেকে বেরিয়ে আসতে হবে আমাদের নিজেদেরকেই। মনে রাখতে হবে, অপ্রাপ্তি কেবল ক্ষণিকের।
জীবনের নানান অনিশ্চয়তার মাঝে হতাশা কাটিয়ে কীভাবে বেছে নেব সঠিক পথটি?

চাওয়া-পাওয়ার ব্যবধান

চাওয়া-পাওয়ার ব্যবধান আমাদের জীবনের এক আমোঘ সত্য। ছোটবেলা থেকেই সবার একটা স্বপ্ন থাকে। স্কুল ও কলেজ শেষ করে ভর্তি পরীক্ষায় এসে অনেকেই প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারে না। প্রথম ধাক্কাটা খায় এখানেই। স্কুল-কলেজে সব সময় প্রথম হয়ে আসা ছেলে বা মেয়েটি যখন ভালো কোনো প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়, তখন হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এ ক্ষেত্রে পরিবার থেকে চাপ দেওয়ার ফল খুব খারাপ হয়। এরপর আসে পছন্দের বিষয় না পাওয়াটা। কেউ হয়তো পড়তে চেয়েছে কম্পিউটার সায়েন্সে কিন্তু পেল অন্য বিষয়, তখন একটা খারাপ লাগা কাজ করে। সে সময় সমাজ এবং পরিবার থেকে যদি খারাপ ব্যবহারের স্বীকার হয়, তখন তার মধ্যে জন্ম নেয় হতাশা। আবার কেউ তার পছন্দের বিষয় পেলেও কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে আর ভালো ফলাফল করতে পারে না। তখনও মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে সে। পড়ার চাপ কুলিয়ে উঠতে না পেরে অনেকের ভেতর হতাশার সৃষ্টি হয়।

আমাদের সামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় হতাশার পেছনের মানসিক কারণগুলোর ক্ষেত্রে প্রাথমিক দায় পরিবারের। পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠদের মধ্যে সব সময় একটি প্রবণতা লক্ষ করা যায়। তুমি রেজাল্ট খারাপ করেছ, তোমার তো সবই খারাপ। এ ধরনের মন মানসিকতার কারণে পরিবারের কনিষ্ঠ সদস্যটির ভেতরে হতাশার বীজ বুনতে পারে। আত্মীয়স্বজনের মধ্যে প্রতিযোগিতা এর জন্য দায়ী। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যে সেশনজটের সৃষ্টি হয়, তা শিক্ষার্থীদের মনে হতাশা তৈরি করে। চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রেও প্রবল প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হয়। এই দৌড়ে যারা পিছিয়ে পড়ে, তারাও হয়ে পড়ে হতাশাগ্রস্ত। আবার অনেকের ক্ষেত্রেই দেখা যায়, প্রিয় মানুষের থেকে পাওয়া কষ্ট বা বেদনা থেকেও হতাশার সূত্রপাত ঘটে।

ভুলে ভরা পথের শুরু

হতাশাগ্রস্ত হয়ে অনেকেই করে বসেন জীবনের সবচেয়ে বড় ভুলটা। নিজেকে একেবারে হেরে যাওয়া মানুষ ভেবে নেন প্রত্যাশিত জায়গায় ভর্তির সুযোগ না পেয়ে। অনেকেই আর ভালো কোথাও ভর্তির চেষ্টা ছেড়ে দেন। অথবা প্রত্যাশিত বিষয় না পেয়ে পাওয়া বিষয়টিকেও অবহেলা করে বসেন। অনেক ক্ষেত্রে ভালো ফলাফল করতে না পেরে ছেড়ে দেন পড়ালেখা। ভালো চাকরির সুযোগ না পেয়ে অনেকেই মনোবল হারিয়ে আর কোনো চেষ্টাই করেন না। প্রিয় কারও কাছে কষ্ট পেয়ে তার সঙ্গে জীবনের ছোট ছোট অপ্রাপ্তি যোগ করে হয়তো কেউ বেছে নেন আত্মহননের পথও।

জীবনের সঠিক পরিকল্পনা

মানুষের চাওয়া-পাওয়ার ব্যবধানটা সারা জীবনই মানুষকে তাড়া করে ফিরতে পারে, তবে সঠিক পরিকল্পনা আর উপযুক্ত পথটি বাছাই করে অনেকটাই কমিয়ে ফেলা যায় এর মাঝের দূরত্বটা। মানুষ পারে না এমন কিছু নেই। হতাশা নিয়ন্ত্রণ করে সফল হতে মানুষ ইচ্ছে করলেই পারে। জীবন নিয়ে হতাশ না হয়ে বরং কিছু পরিকল্পনামাফিক কাজ করে আমরা হারিয়ে দিতে পারি মনের ভেতরের হতাশার কালো মেঘ।

- ক্যারিয়ারের জন্য পড়াশোনা নয় বরং জানার জন্য পড়তে হবে। পড়ার বইয়ের পাশাপাশি সাহিত্য, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান সব বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করতে হবে।
- মুখস্থ করার অভ্যাস বদলে কোনো বিষয় আত্মস্থ করার অভ্যাসটা ছোটবেলা থেকেই আয়ত্ত করতে হবে।
- প্রত্যাশিত বিষয় না পাওয়া মানে সবকিছু শেষ হয়ে যাওয়া নয় বরং যে বিষয়টিতে সে ভালো, তার মাধ্যমেও জীবনে সফল হওয়া সম্ভব।
- পরিবারের সদস্যদের আরও বেশি আন্তরিক হতে হবে। নিজেদের মধ্যে বোঝা-পড়া ঠিক থাকলে, হতাশাগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে না।
- জীবনে মানবিক সম্পর্কের উত্থান পতন হতেই পারে। সে জন্য জীবন শেষ হয়ে গেছে, এমন ভাবা যাবে না।
- বন্ধু, বিশেষ প্রিয়জন কিংবা পরিবারের কারো সঙ্গে মান অভিমান হলে খোলাখুলি কথা বললে অনেক ক্ষেত্রেই ভুল বোঝাবোঝির অবসান করা সম্ভব হয়।
- যার যে বিষয় বা পেশা পছন্দ, সেটি মাথায় রেখে সে অনুযায়ী ছোটবেলা থেকে নিজেকে তৈরি করতে হবে।
- বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশনজটের সময় বসে না থেকে পরবর্তীকালে প্রয়োজন হবে, এমন কোনো কোর্স করা যেতে পারে।
- দেশে ও দেশের বাইরে কী হচ্ছে, কোন কাজের চাহিদা বেশি তার খোঁজ রাখতে হবে। ইন্টারনেট, সংবাদপত্র নিয়মিত দেখতে হবে। সময়ের সদ্ব্যবহার করতে হবে। সঠিক সময়ে সঠিক কাজটি করতে হবে।

◆ যে যেই পেশায় যেতে চায় ছাত্র অবস্থাতেই, সে সম্পর্কিত জায়গায় খণ্ডকালীন চাকরিও করতে পারে। এ অভিজ্ঞতা পরবর্তীকালে কাজে আসবে।

◆ সরকারি চাকুরি না পেলে জীবন বৃথা এই ধারণা থেকে বের হয়ে আসতে হবে।

◆ ছাত্রজীবন থেকে নিজেই হয়ে উঠতে পারেন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা। একসময় দেখবেন, আপনি নিজেই অন্য আরো দশজনকে চাকরি দিতে পারছেন।

দুঃখ-কষ্ট মিলিয়েই জীবন। তাই অপ্রত্যাশিত দুঃখ-কষ্ট মোকাবিলা করার মন মানসিকতা পোষণ করতে হবে। চলার পথে বাধা আসবেই। তাই বলে থেমে থাকলে চলবে না। হতাশায় আচ্ছন্ন হলেও না। মনে রাখতে হবে, থেমে যাওয়া বা জীবন থেকে পালিয়ে বাঁচা কোনো সমাধান নয়। বরং সফল হতে চালিয়ে যেতে হবে নিরন্তর চেষ্টা।

শান্তা তাওহিদা
সহকারী অধ্যাপক, যোগাযোগ বৈকল্য বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষণা ও পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে অনলাইন শিক্ষা

জাহিদুজ্জামান*

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা অর্জনের গতি প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু গত দশ বছরে এই পরিবর্তন অন্যান্য সময়ের তুলনায় অনেক বেশি ত্বরিত এবং দিনে দিনে অনেকটাই প্রযুক্তি নির্ভরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর প্রযুক্তির কল্যাণে শিক্ষা অর্জন অনেক সহজ থেকে সহজতর হচ্ছে। একজন শিক্ষার্থী চাইলেই তার পছন্দের যে কোনো বিষয়ে জানতে পারে, শিখতে পারে। আর সহজে শিখতে পারা, জানতে পারা একজন গবেষক এবং পেশাজীবীর জন্য খুবই দরকার। কেননা- দ্রুততম উপায়ে সহজে শিখতে পারলে স্বল্প সময়ে কোনো কিছুর সমাধান বের করা সম্ভব হয়। তাই অনলাইন শিক্ষার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা শিক্ষার্থী মাত্রই থাকা দরকার।

ধরা যাক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের একজন শিক্ষার্থী বা এমফিল/পিএইচ-ডির গবেষক ইসলামী অর্থনীতি নিয়ে গবেষণা করতে চান। ইসলামী অর্থনীতি বা ব্যাংকিং বিষয়ে গবেষণা করতে হলে কয়েকটি বিষয় শিক্ষার্থী/গবেষককে অবশ্যই জানতে হবে। যেমন;

- আরবি ভাষা জানা: কেননা- অর্থনীতি বা ব্যাংকিং সম্পর্কে ইসলামী শরিয়াহ কী বলছে সেটা আগে জানা দরকার। ইসলামী শরীয়াহ্‌র মোটামুটি সকল মূল ও মৌলিক গ্রন্থ আরবি ভাষায় রচিত। সুতরাং আরবি না জেনে, না বুঝে ইসলামী কোনো বিষয়ের গবেষণা কখনই কোনো ভালো মানের গবেষণা হতে পারে না।
- অর্থনীতি সম্পর্কে জানা: অর্থনীতির অতীত, বর্তমান, অর্থনীতির প্রকার, গতি-প্রকৃতি, বিভিন্ন মতবাদ বা থিওরি, বৈশ্বিক অর্থনীতির হাল-চাল জানা আবশ্যক।
- ব্যবসায় শিক্ষার বিভিন্ন শাখা সম্পর্কিত প্রাথমিক ধারণা অর্জন করা: ইসলামী ব্যাংকিং সম্পর্কে জানতে হলে, বুঝতে হলে অবশ্যই ব্যাংকব্যবস্থা সম্পর্কে ধারনা থাকতে হবে। বর্তমানে পরিচালিত ব্যাংকিং সম্পর্কে জানতে বা বুঝতে হলে একাউন্টিং, ফিন্যান্স, মার্কেটিং, ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কে অবশ্যই প্রাথমিক ধারণা থাকতে হবে।
- ডাটা এনালাইসিস শিখতে হবে: সাধারণভাবে একজন গবেষককে (বিশেষ করে সামাজিক বিজ্ঞানের শাখায়) গবেষণা করতে হলে ডাটা এনালাইসিস জানতে হবে এবং এর যথাযথ প্রয়োগ ভালোভাবে শিখতে হবে। শিখতে হবে সোর্স থেকে তথ্য নিয়ে কিভাবে গবেষণা উপযোগী মডেল তৈরি করতে হয় এবং সেখান থেকে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল বের করে আনতে হয়।

আবার ধরে নিই, একজন বায়োমেডিকেল ফিজিক্সের শিক্ষার্থী গবেষণা করতে চান

আল্ট্রাসাউন্ডের ইমেজ কোয়ালিটি কীভাবে ঝকঝকে করা যায়, একেবারে স্পষ্ট ছবি কিভাবে দেখা যায় সে বিষয়ে। তাহলে সাধারণভাবে এই গবেষককে যে সকল বিষয়ে জানতে হবে;

- ছবি সম্পর্কে ধারণা: ছবি তোলার ম্যাকানিজম, ছবির রেজ্যুলেশন কী এবং কেন এই রেজ্যুলেশন, ছবির ডাইমেনশন, ছবি তুলতে লাইটের ব্যবহার, কোন ধরনের লাইট কোন ধরনের ছবির জন্য প্রযোজ্য, ছবি কেমন হবে-ইত্যাদি।
- প্রাথমিক মেডিকেল জ্ঞান থাকতে হবে: মানুষের শরীরের চিকিৎসায় কোন কোন স্থানের আলট্রাসাউন্ড করা যায় এবং সে সকল স্থানের অবস্থান, স্তর, পুরুত্ব, অরগানের গঠন ইত্যাদি সম্পর্কে অবশ্যই ধারণা থাকতে হবে।
- বিশ্বে ব্যবহৃত আল্ট্রাসউন্ড মেশিন ও এর কার্যাবলি সম্পর্কে অবশ্যই ধারণা থাকতে হবে।

শুধু বাংলাদেশ নয়, বরং বিশ্বের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগে সম্ভবত ব্যবসায় শিক্ষার মৌলিক বিষয়, ডাটা এনালাইসিস ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হয় না এবং সম্ভবও না। অনুরূপভাবে, ছবি সম্পর্কিত বিদ্যা সম্পর্কে বায়োমেডিকেল ফিজিক্স বিভাগে নিশ্চয়ই কোনো ব্যবস্থা থাকার কথা নয়। কেননা- যে কোনো বিভাগের শিক্ষার্থীরা চাইলে অনেক বিষয়েই গবেষণা করতে পারেন এবং অসংখ্য বিষয় সম্পর্কে শিক্ষাদান করা সম্ভবও না। আর এ কারণেই গবেষককে তার নিজ উদ্যোগে তার আগ্রহের বিষয়ে জানতে হয়। অনলাইন শিক্ষা আগ্রহের যে কোনো বিষয়ে শেখার এবং জানার পথকে সহজ করে দিয়েছে।

এমন কোনো বিষয় নেই যে সম্পর্কে অনলাইনে বর্তমানে শেখা যায় না, জানা যায় না। অনলাইনে শেখার কতগুলো সাইট সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো।

https://alison.com

২০০৭ সালে প্রতিষ্ঠিত এই সাইটের মাধ্যমে বর্তমানে বিশ্বের ১৯৫ টি দেশের প্রায় ১২ মিলিয়ন শিক্ষার্থী বিভিন্ন বিষয়ের ১০০০টির বেশি কোর্সের মাধ্যমে শিখছে। এই সাইটের মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ সম্পূর্ণ ফ্রি, মোবাইল থেকেও একসেস করা যায়। তবে সার্টিফিকেট এর জন্য পে করতে হয়। ডিজিটাল সার্টিফিকেট এর জন্য মাত্র ৪ পাউন্ড খরচ করতে হবে এবং হার্ডকপি পেতে ২২ পাউন্ড খরচ করতে হবে।

https://www.edx.org/

বিশ্বখ্যাত হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয় এবং এমএইটি কর্তৃক ২০১২ সালে প্রতিষ্ঠিত এই মুকস (Massive Open Online Courses) সাইটে বর্তমানে বিশ্বের প্রায় ১৩০টি নামিদামি বিশ্ববিদ্যালয় এবং এর শিক্ষকদের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ের উপর শিক্ষাদান অব্যাহত। এই সাইটের মাধ্যমে বেসিক বা ফান্ডামেন্টাল, ইন্টারমিটিয়েট এবং লেভেলের ওপর বিভিন্ন বিষয়ের ওপর বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় প্রায় ২২৭২টি কোর্স করার পাশাপাশি স্পেশালাইলেশন কোর্স, অনলাইন এসোসিয়েট ডিগ্রি অর্জনের

সুযোগ রয়েছে। এখানের সেলফ পেইসড কোর্সগুলো বছরের যে কোনো সময় করা যায়, কিন্তু অধিকাংশ কোর্সেরই সময় নির্ধারিত এবং এই নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই শেষ করতে হয়। কোর্সগুলো সাপ্তাহিক ভিত্তিতে লেসন, টেস্ট, এসাইনমেন্ট ইত্যাদির মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হয়। সকল কোর্সই ফ্রিতে শুরু করা যায়, তবে সার্টিফিকেট পেতে হলে ডলারে পে করতে হয়। অধিকাংশ কোর্স ফি মওকুফের জন্য আর্থিক সহায়তা বা ৯০% স্কলারশিপের ব্যবস্থা আছে। কিছু কিছু কোর্সকে বিশ্বের অনেক নামিদামী বিশ্ববিদ্যালয় ক্রেডিট দেয়।

https://www.coursera.org/

৩৫ মিলিয়ন শিক্ষার্থী, প্রায় ১৮০টির অধিক বিশ্ববিদ্যালয় ও ইনস্টিটিউট পার্টনার, ৩১৯৯টি কোর্স, ২৫০+ স্পেশালাইজেশন এবং ৪+ ডিগ্রির প্রদানকারী অনলাইন শিক্ষা প্রদানকারী এই সাইটটি আমেরিকায় বহুল পরিচিত। এদের আছে নিজস্ব ট্রান্সেলটর কমিউনিটি যার মাধ্যমে ইংরেজিতে প্রদান করা লেসনের বিভিন্ন ভাষায় সাবটাইটেলসহ ভিডিও লেকচার মডিউল। এদর সকল কোর্সেই ফি প্রদান করতে হয়, তবে আশার কথা হলো অধিকাংশ কোর্সেই ১০০% কোর্স ফি ওয়েভার বা স্কলারশিপ পাওয়া যায়।

https://www.openlearning.com/

মালয়েশিয়াভিত্তিক এই সাইটটির মাধ্যমে প্রায় ৬৮৩টি কোর্স করা যায়। এখানের কোর্সগুলো বিভিন্ন ধরনের। কিছু কিছু কোর্সে ফি প্রদান করতে হয় আবার কিছু আছে ফ্রি। কোনোটায় সার্টিফিকেট পাওয়া যায় আবার কোনো কোনোটায় সনদের ব্যবস্থা নেই। অধিকাংশ কোর্সের ভাষা ইংরেজি হলেও কিছু কিছু কোর্সের ভাষা মালয়। এদের কোর্সগুলো খুবই ইন্টারেকটিভ, প্রত্যেকটা কোর্স ওয়ার্ক সম্পন্ন না করলে কোর্স কমপ্লিট করা যায় না।

https://www.datacamp.com/

Data Analysis with Spreadsheets, Spreadsheet Basics, Introduction to Data, Intro to Financial Concepts using Python, Intro to SQL for Data Science, R, Python, SQL, Git, Shell, Spreadsheets ইত্যাদি শেখার এক অনন্য ওয়েব সাইট। বর্তমান সময়ের বহুল আলোচিত এবং চাহিদাপূর্ণ ডাটা সাইন্স শেখার বিশেষায়িত এই সাইটে প্রায় ২৬৭ টি কোর্স, প্রোজেক্ট এবং প্রাকটিসিং মডিউলসহ ১৫৪ জন প্রশিক্ষক আছেন। কিছু কিছু বেসিক কোর্স ফ্রিতে শেখা গেলেও অধিকাংশ এডভান্স কোর্সের জন্য ফি প্রদান করতে হয়।

https://www.open2studz.com

Open Universities Australia (OUA) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই সাইটের মাধ্যমে ৫০টির বেশি ফ্রিতে কোর্স শেখা যায়, যার অধিকাংশই আবার Open Universities Australia (OUA) থেকে এক্রিডেশন নেয়া যায়।

এছাড়াও কতিপয় সাইটের লিঙ্ক:

https://academy.microsoft.com আইটি বিষয়ক কিছু ভালো মানের কোর্স এখান থেকে শেখা যেতে পারে।

https://www.life-global.org/ আইটি ও বিজনেস বিষয়ক ফ্রি শর্ট কোর্স।

https://learn.saylor.org/ ১০০টি ফুল লেনথ একাডেমিক এবং প্রোফেশনাল ফ্রি কোর্স ।

https://marifaacademy.com/en/index বেসিক ইসলামী ফাইন্যান্স শেখার একটি ভালো মানের সাইট।

https://open.embanet.com/home/index.php কোর্সের নাম Business Essentials ৩টি (Quantitative, Leadership, and Communication) ক্যাটাগরি মডিউলের অধিনে ১৬টি বেসিক বিজনেস কোর্স ফ্রি। এই কোর্সটি প্রত্যেকের করা উচিত বলে আমার মনে হয়।

http://www.bbc.co.uk/learning/onlinecourses/ বেসিক কিছু স্কিল বেসড কোর্স ফ্রিতে শেখা যায়।

http://elearn.translatorswb.org/ এখান থেকে Introduction to Humanitarian Translation কোর্সটি শেখা যেতে পারে।

https://www.futurelearn.com ১৪৯ পার্টনার নিয়ে The Open University ইউকে এর এই সাইটিতে বিভিন্ন শর্ট কোর্স শেখা যায় ফ্রিতে।

জাহিদুজ্জামান
পিএইচডি গবেষক (ইসলামী ব্যাংকিং), আরবি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

উচ্চশিক্ষায় উৎসাহীদের অনলাইনে আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ

জুনাইদ আল মামুন*

বাংলাদেশের ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশে যাওয়ার প্রবণতা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেড়েছে যা সত্যিই আনন্দদায়ক ও উৎসাহব্যাঞ্জক। এই প্রবণতা শুধু নির্দিষ্ট একটি দেশের কিংবা কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে সীমাবদ্ধ নয় বরং বিভিন্ন পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীরা বিভিন্ন বিষয়ে উন্নত শিক্ষা অর্জনে বিভিন্ন দেশে যাচ্ছে। প্রায় প্রতিবছর এই সংখ্যাটা বেড়েই চলেছে। নীচের ছকে দেওয়া ইউনেস্কোর তথ্য অনুযায়ী ২০১২ সাল পরবর্তী সময়ে উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশগামী ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা অভূতপূর্বভাবে বেড়েছে।

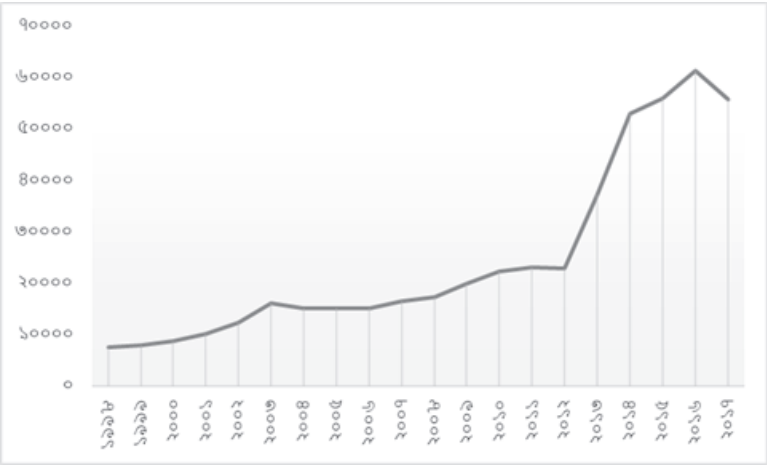

সংবাদপত্রের তথ্যানুযায়ী, এদের কাছে আকাঙ্ক্ষিত দেশের তালিকায় সর্বাগ্রে রয়েছে মালয়েশিয়া। দ্বিতীয় স্থানে যুক্তরাষ্ট্র ও তারপর ক্রমান্বয়ে যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, জার্মানি, কানাডা ও অন্যান্য বেশ কিছু দেশ রয়েছে। গুণগত উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের গুরুত্ব ও এদেশে যাওয়ার চাহিদা সব সময়ই বেশ উপরের দিকে থাকে। বাংলাদেশে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের তথ্য মোতাবেক, বাংলাদেশ থেকে যাওয়া ৬০ শতাংশেরও বেশি ছাত্র-ছাত্রী স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পড়ার জন্য সেখানে যায়। এই সমস্ত উপাত্ত ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে, প্রতি বছর দেশের বাইরে পড়তে যাওয়ার উৎসাহী ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বেড়েই চলেছে। আজকের এই নিবন্ধটি মূলত এই সকল উৎসাহী ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্য করেই লেখা। আমি জানি, শিক্ষার্থীদের মনে উচ্চশিক্ষা বিষয়ে হাজারো প্রশ্ন থাকে যার খুব কিয়দাংশকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান কাঠামো গুরুত্ব দেয় এবং আন্তরিকভাবে এগুলোর উত্তর দিয়ে

থাকে। যার ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে উচ্চশিক্ষার ব্যাপারে জানার জন্য সাধারণত দুটি পথ খোলা থাকে। একটি হল- নিজে নিজে খুঁজে বের করা আর অন্যটি হল- অভিজ্ঞ কারো কাছ থেকে জেনে নেওয়া। তবে সঠিকভাবে জানতে হলে দুটি পদ্ধতিই একসঙ্গে কাজে লাগানো প্রয়োজন। এখানে একটি বিষয় জেনে রাখা দরকার যে, দেশ কিংবা বিদেশ যে কোনো জায়গায়ই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে গেলে ইংরেজি ভাষা, কম্পিউটার চালনা ও ইন্টারনেট সম্পর্কে ব্যবহারিক পর্যায়ের মোটামুটি ধরনের দক্ষতা থাকা প্রয়োজন। বাইরে উচ্চশিক্ষা অর্জন করতে গেলে এই দক্ষতাগুলো থাকা জরুরি এবং এর কোনো বিকল্প নেই। সেইসঙ্গে এটিও গুরুত্বপূর্ণ যে, এই দক্ষতাকে কীভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে সে ব্যাপারে যথাযথ ধারণা রাখা। গত বেশ কয়েক বছর ধরে অনেকেই আমার কাছে অনলাইনে, ফেসবুকে বা ইনবক্সে উচ্চশিক্ষা-র বিভিন্ন পর্যায় সম্পর্কে জানতে চান। সেটি সংক্ষিপ্ত এবং বিস্তারিত দুইভাবেই। আমিও যথাসাধ্য চেষ্টা করি তাদের সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে কিংবা কীভাবে তাদের প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে সে ব্যাপারে ধারণা দিতে। এই আন্তঃব্যক্তিক প্রশ্নোত্তরের অভিজ্ঞতার জায়গা থেকেই নিচের কিছু পরামর্শ উচ্চশিক্ষায় উৎসাহীদের জন্য দেওয়া হল। প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে 'কি/কী', 'কেন', 'কীভাবে', 'কাকে', 'কখন' এই পাঁচটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি। আমি ধরে নিচ্ছি উৎসাহী পাঠকদের ইংরেজি ভাষা ও কম্পিউটার-ইন্টারনেট সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবহারিক জ্ঞান আছে।

১. কি/ কী- কী প্রশ্ন করতে হবে, করা যাবে, বা করা উচিত তা বুঝতে পারা অত্যন্ত জরুরি। যেহেতু আপনারা ইংরেজি ভাষা এবং ইন্টারনেট ব্যবহারে দক্ষ সেহেতু অনেক প্রশ্নের উত্তর আপনারা নিজেরাই খুঁজে বের করতে পারেন। যেসব উত্তর খুব সহজেই খুঁজে বের করা যায় সেসব প্রশ্ন অভিজ্ঞদের করলে প্রশ্নকর্তার ব্যাপারে একটা নেতিবাচক ধারণার জন্ম নেয়াটা অমূলক কিছু নয়। যেমন:

'ক' বিষয়টি কি 'খ' দেশে আছে?

'গ' দেশের কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ক' বিষয়টি আছে?

'ক' বিষয়ে কোথায় কোথায় বৃত্তি (স্কলারশিপ) পেতে পারি?

'ঘ' বিশ্ববিদ্যালয় কি 'ক' বিষয়ে স্কলারশিপ দেয়?

এই ধরণের সাধারণ প্রশ্ন আপনি গুগল করলে উত্তর খুব সহজেই পেয়ে যাবেন। প্রয়োজন শুধু খানিকটা অধ্যবসায়, সময় ও আগ্রহ নিয়ে খোঁজা। বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত যে কোনো প্রশ্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে থাকে এবং প্রতিটি বিশ্ববিদ্যা-লয়ের নিয়ম কানুন আলাদা হওয়ায় সাধারণ কোনো উত্তর দেওয়া সহজ নয় এমনকি উচিতও নয়। সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট ডিরেক্টর/ এডমিশন অফিস/ ডিপার্টমেন্ট গ্রাজুয়েট ডিরেক্টরকে ইমেইল করে প্রশ্ন করা যেতে পারে। তাদের ইমেইল এড্রেস ওয়েবসাইটেই দেওয়া থাকে। তবে এমন কোনো প্রশ্ন যদি করা হয় যার উত্তর ওয়েবসাইটে দেওয়া আছে সেক্ষেত্রে তারা আপনাকে ওয়েবস-

াইটের লিংক ধরিয়ে দিতে পারে ভালো করে আবার পড়ার জন্য। সাধারণত একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন কোন বিষয় আছে, সেগুলোতে কী পড়ানো হয় এবং তারা বৃত্তি দেয় কি না তা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটের একাডেমিক সেকশনে পাওয়া যায়। আর সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির যোগ্যতা কী, সময়সীমা কতদিন, কী কী কাগজপত্র লাগে তা সাধারণত বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটের এডমিশন অংশে থাকে। সুতরাং যাকে প্রশ্ন করছেন তার কাছে এমন কিছু জানতে চান যা ওয়েবসাইটে খুঁজে পাচ্ছেন না বা যে বিষয়টি আপনার কাছে আরেকটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

২. কেন- কেন প্রশ্ন করছেন সেই ব্যাপারটি সম্পর্কে প্রশ্নকর্তা এবং উত্তরদাতা দুজনেরই বোঝাপড়া থাকা জরুরি। অর্থাৎ আপনি যে প্রশ্ন করছেন তার উত্তর আদৌ আপনার কোনো কাজে আসবে নাকি সেটি কেবল কৌতূহলবশত করা তার বোঝা-পড়া দরকার। আপনার প্রশ্ন হওয়া উচিত সেগুলো যেসব বিষয় আক্ষরিক অর্থেই উচ্চশিক্ষায় আপনার প্রস্তুতি এবং আপনার ধারণাকে কার্যকরভাবে সাহায্য করবে। এর বাইরে আপনার প্রস্তুতির সঙ্গে অসঙ্গতিমূলক প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকা উচিত। যেমন:

আপনার টোফেল/আইইএলটিএস স্কোর কত?
আপনার জি আর ই স্কোর কত?
আপনার প্রকাশনা কতগুলো?
আপনার সিজিপিএ কত?
আপনার কাজের অভিজ্ঞতা কত দিনের?
আপনি কত দিন প্রস্তুতি নিয়েছেন?
দৈনিক কত ঘন্টা পড়েছেন?
আপনার স্কলারশিপে মাসে কত টাকা দেয়?
স্কলারশিপ থেকে কি টাকা সঞ্চয় করতে পারেন?
আপনার ভর্তি রচনাটা আমাকে দেওয়া যাবে?

বিভিন্ন কারণে এ ধরণের প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকা উচিত সম্পূর্ণভাবে। প্রথমত, অন্যের অর্জনের পরিসংখ্যান একমাত্র উৎসাহ প্রদান ছাড়া আর তেমন কোনো কাজে লাগে না। আর এগুলো ছাড়াও উৎসাহ পাওয়ার অনেক উপায় আছে। সুতরাং অন্যজন কী করল সেসব বিষয়ে প্রশ্ন না করে আপনি আপনার প্রস্তুতিকে কীভাবে আরো ভালো করতে পারেন সে ব্যাপারে জানতে চাওয়া সত্যিকারের আগ্রহীদের লক্ষণ। দ্বিতীয়ত, অনেকের ক্ষেত্রে এসব প্রশ্নের উত্তর যেহেতু অনেকটাই একান্ত ব্যক্তিগত সেহেতু প্রশ্নকর্তা ও উত্তরদাতার সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতার উপর নিভর করে এ ধরনের প্রশ্ন করা উচিত কি না। অন্যথায় আপনার ব্যাপারে তার ধারণা খুব বেশি ইতিবাচক নাও হতে পারে। তৃতীয়ত, অনেককেই পাবেন যারা তাদের বিভিন্ন তথ্য তাদের লিংকডিন, গুগল স্কলার, রিসার্চগেট, একাডেমিয়া, এমনকি ফেসবুক প্রোফ-

াইল বা ফেসবুকে বিভিন্ন উচ্চশিক্ষার গ্রুপে শেয়ার করে রেখেছেন যাতে অনেকেই তাদের স্কোর, অভিজ্ঞতা, প্রকাশনা ইত্যাদির ব্যাপারে পূর্ব ধারণা পেতে পারে এবং যদি প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে উৎসাহও নিতে পারে। সুতরাং যাকে তার স্কোর, প্রকাশ-না ইত্যাদি বিষয়ে প্রশ্ন করছেন তাকে প্রশ্ন করার আগে তার ব্যাপারেও তার প্রোফ-াইল ও বিভিন্ন গ্রুপে তার ব্যাপারে খোঁজাখুঁজি করলেই অনেক উত্তর পেয়ে যাবেন। এর কারণ হচ্ছে আপনার মতো আরও অনেকেই হয়তো তাকে একই বিষয়ে প্রশ্ন করছে যার উত্তর তিনি ইতিমধ্যেই বিভিন্ন জায়গায় দিয়ে রেখেছেন। সুতরাং যোগাযোগের ক্ষেত্রে এই ধরণের প্রশ্ন খানিকটা বিরক্তির উদ্রেক করতে পারে। আর যদি তার ব্যাপারে এই ধরণের তথ্য খুঁজে না পান সেক্ষেত্রে মনে করে নেওয়া যেতে পারে যে তিনি তার এসব ব্যক্তিগত তথ্য শেয়ারে আগ্রহী নন। সেক্ষেত্রে আপনার সঙ্গে তার সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতার উপর নির্ভর করে সিদ্ধান্ত নিন যে এই ধরনের প্রশ্ন তাকে করা উচিত হবে কিনা। প্রয়োজনে এরকম প্রশ্ন করার পূর্বে তার কাছে অনুমতি নিয়ে নিন। তবে একেকজনের প্রস্তুতি একেকরকম। প্রত্যেকের মেধার গভীরতা ভিন্ন। প্রতি বছর উচ্চশিক্ষার সুযোগ, ভর্তির প্রপঞ্চ ও আবশ্যকতায় ভিন্নতা থাকে। একই যোগ্যতায় আগের বছর সুযোগ পেলেও পরের বছর সুযোগ নাও পেতে পারে। সুতরাং অন্যজন কী যোগ্যতা নিয়ে সুযোগ পেল সেটা নিয়ে খুব বেশি ঘাটাঘাটি করার চেয়ে নিজের যোগ্যতা যথাসম্ভব বাড়ানোর চেষ্টা করা উচিত। কোনো না কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনি সুযোগ পেয়ে যাবেন আগ্রহের সাথে অধ্যবসায় চালিয়ে গেলে।

৩. কীভাবে- কীভাবে প্রশ্ন করছেন- এই আচরণ/ ব্যবহারটা জানা থাকা খুবই জরুরি। অনেক কথা সামনাসামনি বললে খুব সাধারণ শোনায় যা লিখে জিজ্ঞেস করলে মুখাবয়বের প্রকাশ্য অভিব্যক্তির অভাবে খুব রূঢ় শোনায়। এটা সাধারণ অর্থে প্রশ্নকর্তার কোনো দোষ না। কিন্তু আপনার প্রশ্নকে কীভাবে স্বাচ্ছন্দ্যদায়ক করতে হবে এবং কীভাবে করলে তা আন্তরিক শোনাবে এই বোধটা প্রশ্ন করার পুর্বে আপনার আত্মস্থ করা আবশ্যক। অন্যথায় আপনার প্রশ্ন রূঢ় হিসেবে দেখবে অনেকেই। কিংবা উত্তর দিলেও আপনার ব্যাপারে একটা নেতিবাচক ধারণা তার মনে রয়ে যেতে পারে। যদি কারো সঙ্গে আপনার প্রথম আলাপই পেশা বা উচ্চশিক্ষা সংক্রান্ত হয় সেক্ষেত্রে সম্ভাষণ সম্বোধন, কুশল বিনিময় এই ধরনের আলোচনাপূর্বক মূল বিষয় নিয়ে আলাপ করার ইচ্ছা না রেখে সরাসরি তাকে শুভেচ্ছাসহ সম্বোধন করে আপনার পরিচয় জানিয়ে মনে থাকা প্রশ্নগুলো করে দিন। কারণ প্রাথমিক সম্বোধন ও কুশল বিনিময়ের পর আপনি কী বিষয় নিয়ে আলাপ করবেন সেটি উনি জানেন না। ফলে অপরিচিত (যেহেতু আপনার প্রথম আলাপ) কারো সঙ্গে শুধু কুশল বিনিময়ের সময় এবং ইচ্ছা তার নাও থাকতে পারে। এমনকি পরিচয় থাকলেও ঘনিষ্ঠতা না থাকলে শুভেচ্ছা সম্বোধন করে মূল বিষয়টা শুরুতেই লিখে দেওয়া উচিত। তাতে আপনাদের মাঝে আলাপ সামনে এগিয়ে নেওয়ার একটা সুন্দর ক্ষেত্র তৈরি হবে।

৪. কাকে- কাকে প্রশ্ন করছেন সেই সম্পর্কে সম্যক ও যৌক্তিক ধারণা রাখা খুবই জরুরি বিষয়। অন্যথায় দুজনেরই শুধু সময় নষ্ট হবে। উপরে আমরা দেখলাম যে, বাংলাদেশ থেকে হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী বিভিন্ন দেশে পড়তে আসছে। বলাই বাহুল্য যে প্রতিটি দেশের শিক্ষার পদ্ধতি আলাদা, আবেদনের সময়, পদ্ধতি, দরকারী কাগজ, যোগ্যতা ইত্যাদি আলাদা। সুতরাং যিনি যুক্তরাষ্ট্রে পড়তে এসেছেন তাকে রাশিয়ার উচ্চশিক্ষা নিয়ে প্রশ্ন করা কিংবা যিনি চীনে পড়তে গিয়েছেন তাকে জার্মানি নিয়ে প্রশ্ন করা অযৌক্তিক। একইভাবে বিজ্ঞানের ছাত্রকে সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ে প্রশ্ন করা কিংবা মানবিকের ছাত্রকে বিজ্ঞান বিষয়ে প্রশ্ন করলে প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়ার সম্ভাবনা বেশ কম। সুতরাং যিনি যে বিষয়ে পড়তে এসেছেন তাকে সে বিষয়ে প্রশ্ন করাই বাঞ্ছনীয়। তাতে তথ্যের সুনির্দিষ্টতা এবং বস্তুনিষ্ঠতা আক্ষরিক অর্থেই গভীর হবে।

৫. কখন- প্রশ্ন করার পর উত্তর কখন আশা করা উচিত এই সম্পর্কে ধারণা থাকা এ ধরণের যোগাযোগে একটি প্রয়োজনীয় বিষয়। বাইরে যারা পড়তে আসেন তাদের জীবন-যাপনের ধরণ দেশে থাকা মানুষদের তুলনায় অনেক ভিন্ন।

প্রতিদিন ক্লাস, অফিস, ল্যাব, পড়াশোনা, রান্না, ব্যক্তিগত কাজ শেষ করার পর আপনার প্রশ্নের উত্তর তাৎক্ষণিকভাবে দেওয়া সম্ভব না হওয়াটা একেবারেই অস্বাভাবিক কিছু না। আর প্রায় সব জায়গায় ওয়াইফাই থাকার কারণে এবং কানেকশন অন রাখার কারণে ইমেইল, মেসেঞ্জার, হ্যাং আউট, হোয়াটসএপ, ভাইবার ইত্যাদি জায়গায় তাকে ২৪ ঘন্টাই অনলাইন দেখাতে পারে। তার মানে এটা নাও হতে পারে যে তিনি এখন ফ্রি আছেন। এমনকি তিনি ম্যাসেজ দেখেও উত্তর না দিয়ে রেখে দিতে পারেন যদি তিনি মনে করেন যে এই মুহূর্তে উত্তর দেওয়াটা তার পক্ষে সম্ভব নয়। এমনকি ব্যস্ততা বেশি হলে বা সেমিস্টারের শেষের দিকে কয়েকদিনও লেগে যেতে পারে উত্তর পেতে (যদি সঠিক প্রশ্ন সঠিকভাবে সঠিক মানুষকে করা হয়)। সুতরাং প্রশ্ন করার পর তাৎক্ষণিক উত্তর আশা করাটা উচিৎ নয়। তাই প্রশ্ন করা হলেই বা তিনি প্রশ্ন দেখলেই যে উত্তর তাৎক্ষণিক পেয়ে যাবেন সেটি নাও হতে পারে।

উচ্চশিক্ষার প্রথম শর্ত হচ্ছে নিজে চেষ্টা করে সমাধান বের করার অভ্যাস তৈরি করা। উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্য এটিই যে, যেকোনো সমস্যা আপনি আগ্রহ নিয়ে নিজে নিজে সমাধান করতে শিখবেন। যেহেতু আপনি ইংরেজি জানেন, ইন্টারনেটের ব্যবহার জানেন সেহেতু অনেক কিছু নিজেই খুঁজে খুঁজে বের করে ফেলতে পারবেন। কোথায় কীভাবে খুঁজতে হবে এই ব্যাপারটিতে পারদর্শী হওয়া উচ্চশিক্ষার পথে প্রথম যোগ্যতা। এটি বই পড়েও শেখা যায় না বা কেউ হাতে ধরেও শিখিয়ে শেষ করতে পারবে না। এর জন্য প্রয়োজন আপনার আগ্রহ, মেধার যথাযথ ব্যবহার এবং নিয়মিত চর্চা। যারা উচ্চশিক্ষা অর্জন করতে চান তাদের এই যোগ্যতাটি অর্জন করে তারপর

সামনের পথে পা বাড়ানো সত্যিকারের আগ্রহীর লক্ষণ। প্রশ্ন করতে পারেন যে, যারা এ বিষয়ে অভিজ্ঞ বা বাইরে পড়ছেন তাদের কাছে তাহলে আপনি কী জানতে চাইবেন? এর সরল উত্তর হলো নিজে চেষ্টা করে যখন ব্যর্থ হবেন তখন আপনাকে সঠিক রাস্তা দেখানোর জন্য তারা আছেন। বাস্তবতা হচ্ছে, তারা আপনাকে কোনো কিছু করে দেবেন না বরং আপনি চেষ্টা করে ব্যর্থ হলে কীভাবে সেটি করা যায় সে ব্যাপারে তারা আপনাকে যথাসাধ্য পরামর্শ দেবেন। লেখাটি শেষ করব চীনের একটি বিখ্যাত প্রবাদ দিয়ে। "আপনি কাউকে মাছ ধরে দিলে তাকে একদিন খাওয়ালেন। আপনি তাকে মাছ ধরা শিখিয়ে দিন, তবে আপনি তাকে সারাজীবনই খাওয়ালেন"। আশা করি এই নিবন্ধটি আপনাদের সামনের পথ চলাকে আরো গতিশীল ও কার্যকরী করবে। উচ্চশিক্ষায় উৎসাহী সকলের জন্য শুভ কামনা রইল।

*
জুনাইদ আল মামুন
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে অধ্যয়নরত
ইলিনয় স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাষ্ট্র

আমরা একটা দ্যোদুল্যমানতার মধ্যে আছিঃ ড. আনিসুজ্জামান

*অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান। বাংলাভাষী মানুষের স্বপ্নযাত্রার অগ্রপথিক, কিংবদন্তী শিক্ষাবিদ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমিরেটাস অধ্যাপক ও জাতীয় অধ্যাপক। তাঁর সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা সংসদের জ্যেষ্ঠ সহ-সভাপতি **নাসরীন জেবিন**।*

বিনির্মাণঃ স্যার, প্রথমেই বাংলা ভাষা-গবেষণার খাত নিয়ে জানতে চাই। বাংলা নিয়ে গবেষণার খাত কী কী? নতুন কোনো খাত সৃষ্টি হচ্ছে কি?

আনিসুজ্জামানঃ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের নানা খাতেই গবেষণা হচ্ছে। ভাষা নিয়ে কম হচ্ছে, সাহিত্য নিয়ে বেশি হচ্ছে। এই গবেষণার মধ্যে নতুন খাত হয়তো সৃষ্টি হচ্ছে না কিন্তু নতুন বা পুরনো লেখক সম্পর্কে নতুন কথা আমরা শুনতে পাচ্ছি, সেটাই এই গবেষণার মূল সাফল্য। তবে এ নিয়ে সব সময়ই মতভেদ থাকবে যে বিদ্যায়তনিক গবেষণা যা প্রায় ডিগ্রীর জন্যই করা হয় সেটা কতটা কাজে লাগে। আমরা আশা করব, যে ধরনের গবেষণা হচ্ছে সেগুলো জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে কাজে লাগবে।

বিনির্মাণঃ গবেষণার ফলাফল প্রায়োগিক হতে হয়, সেক্ষেত্রে বাংলাভাষার গবেষণা কতটা প্রায়োগিক?

আনিসুজ্জামানঃ গবেষণার ফলাফল সাধারণত অনেক ক্ষেত্রে প্রায়োগিক হয় না, যেমন-বিজ্ঞানে, সামাজিক বিজ্ঞানে। কিন্তু মানবিক বিজ্ঞানে তেমন একটা ফলাফল পাওয়া যায় না, তবে এর একটা ব্যবহারিক দিক আছে। সেটা হচ্ছে, ভাষা ও এর প্রয়োগ সম্পর্কে নানা রকম সূত্র ধরা হয়, তখন এগুলোকে প্রায়োগিক বলা যাবে না কিন্তু ব্যবহারিক বলতে পারব। তবে নিশ্চয়ই এর প্রয়োজন আছে। আর যে গবেষণা আমরা ভাষার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারব সে রকম গবেষণা কম কিন্তু এর নিশ্চয়ই আবশ্যকতা আছে।

বিনির্মাণঃ 'বাংলার জন্য সংগ্রাম, রাষ্ট্রভাষা বাংলা, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়াশোনার ভাষা হিসেবে বাংলা করার চেষ্টা- কিন্তু এখন কেন আবার ইংরেজি করা হচ্ছে? ব্যাপারটাকে আপনি কীভাবে দেখেন? এর কি কোনো পরিবর্তন দরকার?

আনিসুজ্জামানঃ এটা ঠিক যে আমরা বাংলা ভাষার জন্য সংগ্রাম করেছি এবং রাষ্ট্রভাষা বাংলা লাভ করেছি। স্বাধীনতার পর এটা আশা ছিল যে প্রথম থেকেই বাংলা ভাষাতেই পঠন-পাঠন চলবে। কিন্তু এটা এক পর্যায়ের পর আর নেওয়া গেল না। তার কারণ হচ্ছে, উচ্চশিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় বইপত্র বাংলায় আর অনুবাদ করা গেল না। এই কাজটা হচ্ছে উচ্চশিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে সমস্ত পণ্ডিত অধ্যাপনা করেন, শিক্ষকতা করেন- তাদের। কিন্তু তারা সেভাবে এগিয়ে এলেন না। বরঞ্চ পাকিস্তান আমলে আমরা দেখেছি, বইপত্র লিখতে ড. মুহম্মদ কুদরত ই খুদার মতো অনেক নাম করা পণ্ডিতগণ এগিয়ে এসেছেন। কিন্তু বাংলাদেশ হওয়ার পর প্রথমে একটু উৎসাহ থাকলেও পরবর্তীতে এই উৎসাহে ভাটা পড়ে গেল।

এখন যে অবস্থাটা হয়েছে সেটা হচ্ছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ইংরেজি পড়ানো হয়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইংরেজি বাংলা মিশিয়ে পড়ানো হয়, আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাংলায়, এটা আদর্শ অবস্থা নয়। তবে সত্যি করে বলতে গেলে, যেহেতু উচ্চশিক্ষার বইপত্র বাংলায় নেই সেজন্য বাংলায় পঠন-পাঠন দুরুহ হয়ে উঠছে। কেননা বাংলা বই পড়ে পড়ানোর ক্ষমতা থাকা উচিত শিক্ষকদের কিন্তু ছাত্ররা সব সময় ইংরেজি বই পড়ে বাংলায় উত্তর লিখতে পারবে এরকমটা আশা করা যায় না। বিশেষ করে আমরা অর্ধ-শতাব্দীতে দেখেছি যে বাংলা এবং ইংরেজি ভাষার জ্ঞান বা দক্ষতা ক্রমশ নেমে যাচ্ছে। কাজেই আমরা একটা দ্যোদুল্যমানতার মধ্যে আছি যে কী করব। আদর্শ হচ্ছে মাতৃভাষায় শিক্ষা কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, মাতৃভাষায় শিক্ষা আমরা দিতে পারছি না- কাজেই ইংরেজি রয়ে যাচ্ছে। এর প্রতিকার হওয়া দরকার। যদি অধিক সংখ্যক পণ্ডিত নানা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই বাংলায় লেখেন উচ্চশিক্ষার উপযোগী করে, তাহলে এক্ষেত্রে পরিবর্তন আসতে পারে।

বিনির্মাণঃ বাংলা মাধ্যম বনাম ইংরেজি মাধ্যম বৈষম্য বিষয়টা আপনি কীভাবে দেখেন? এক্ষেত্রে সরকারি এবং বেসরকারি উদ্যোগ কী কী হতে পারে?

আনিসুজ্জামানঃ আদর্শ অবস্থান হচ্ছে- একই মাধ্যমে, একই পাঠ্যশৈলীতে পড়াশোনা হওয়া। কিন্তু আমাদের এখানে বেসরকারি উদ্যোগে ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষা চালু হয়ে গেছে এবং সেটা ব্যাপকভাবে অনুসৃত হচ্ছে। বাংলা মাধ্যমের তুলনায় কম, কিন্তু তাও ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের যে সংখ্যা সেটা কিন্তু খুবই উল্লেখযোগ্য। এবং এটা বোঝা যায় যে, বাংলাদেশের নাগরিক- বিশেষ করে যারা মধ্যবিত্ত, তারা তাদের ছেলেমেয়েদেরকে ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে পাঠাতে চান। তারা মনে করেন ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে তাদের ছেলেমেয়ে পড়লে এদের চাকরি-বাকরির সুবিধা হবে, বিদেশে যাওয়ার পক্ষে সুবিধা হবে এবং হয়তো বিদেশে থেকে যাওয়ারও সুবিধা হবে। এটা এখন আমাদের পক্ষে রোধ করা খুবই মুশকিল। যদি গোটা রাষ্ট্র একই মাধ্যমে শিক্ষা চালু করে, তাহলে হতে পারে। কিন্তু ৪৭ বছর পার হয়ে গেছে আমরা স্বাধীন হয়েছি, এর মধ্যে এ ব্যাপারে রাষ্ট্র কিছুই করেনি। এখন যে অবস্থা তাতে করে ইংরেজি মাধ্যম স্কুল বন্ধ করা যাবে না। আবার দেখা যাচ্ছে যে, এই চাহিদা লক্ষ্য করে আমাদের জাতীয় যে পাঠ্যক্রম তারও একটা ইংরেজি ভার্সন তৈরি হয়েছে। সরকারও স্বীকার করে নিচ্ছেন যে, বাংলা মাধ্যমের পাশাপাশি ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষার দরকার। এখন কোনো রাষ্ট্রই আসলে এরকম একাধিক মাধ্যমের শিক্ষা পৃষ্ঠপোষকতা করে না। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এই নিয়ম চলে না। এখানে আমরা ইংরাজি মাধ্যম দিচ্ছি দুরকম- বেসরকারি এবং সরকারি, বাংলা মাধ্যম এক রকম, মাদ্রাসার শিক্ষার ধরন আরেক রকম, মাদ্রাসা শিক্ষা আবার দুভাগে বিভক্ত। এই এত বিচিত্র ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা আর কোনো দেশে আছে বলে মনে হয় না। অন্তত রাষ্ট্রীয়ভাবে তারা পৃষ্ঠপোষকতা পায় না। আমরা রাষ্ট্র থেকে তাদেরকে পৃষ্ঠপোষকতা করছি, এর ফল

যেটা হবে, নাগরিক সমাজের মধ্যে আমরা বিভেদ দেখব। নানা ধারায় যারা লেখাপড়া করছে তাদের চিন্তাধারায় অনেক পার্থক্য হবে এবং এটা ঐক্যবদ্ধ জাতি গঠনের অনুকূল হবে না।

এখানে সরকারি উদ্যোগ নেয়ার কী সুযোগ আছে আমি জানি না, তবে সরকার যদি বদ্ধপরিকর হয় তবে বাংলা মাধ্যমকে স্বীকার করে বাকিগুলোর স্বীকৃতি না দিতে পারে, তবে সে ব্যাপারটা ঘটবে বলে আমার মনে হয় না।

বিনির্মাণ: ক্যারিয়ারভিত্তিক নতুন অনেক বিষয় আসছে; যেমন- পাবলিক রিলেশনস, কমিউনিকেশন ফর ডেভেলপমেন্ট, কালচারাল স্টাডিজ। এক্ষেত্রে ভালো চাকরির জন্য এসব বিষয়গুলোতে ছাত্রদের মাঝে বেশ আগ্রহ দেখা যায় অর্থাৎ এই বিষয়গুলোতে পড়াশোনা করলে ভালো চাকরি পাওয়া যাবে- এরকম একটি প্রবণতা। এক্ষেত্রে 'বাংলা' বিষয় হিসেবে এখন কোন অবস্থানে বলে মনে করেন।

আনিসুজ্জামান: হ্যাঁ, এটা ঠিক যে, এখন পেশাভিত্তিক অনেক শিক্ষা উচ্চপর্যায়ে শুরু হয়েছে, কিন্তু এটা আরও নিচের দিকে হওয়া উচিত ছিল। অর্থাৎ মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক এর পরে যদি আমরা নানা বৃত্তিমুখি শিক্ষা লাভ করতে পারতাম তাহলে সাধারণ উচ্চশিক্ষার ওপর এখনকার মতো এত চাপ থাকত না এবং অনেকেই স্ব-নিয়োজিত হতে পারত। এখন উচ্চতর পর্যায়ে, তুমি যে সব বিষয়ের কথা বলছো, এগুলো পড়া হচ্ছে কিন্তু এগুলো আমি জানি না কতখানি চাকরির বাজারে গৃহীত হবে, যেমন- 'পাবলিক রিলেশনস' হবে নিশ্চয়ই কিন্তু 'কালচারাল স্টাডিজ' হবে কি? এটা বলা খুব মুশকিল। শিক্ষার্থীরা ভালো চাকরির জন্য নতুন পথে পড়াশুনা করছে কিন্তু এটার জন্য চাকরির বাজার কতটা তৈরি হয়েছে, এটা বলা খুব মুশকিল। আমার মনে হয় যে, 'চাকরি পাওয়ার আগ্রহ থেকে কিছু পড়তে আসা' এটা দোষের কিছু নয় যদিও শুদ্ধ জ্ঞানচর্চার আবশ্যকতা আছে। তবে অনেকেই বলবেন যে, শুধু শুদ্ধ জ্ঞানচর্চা দিয়ে একজন ছাত্র তার জীবন কীভাবে নির্বাহ করতে পারবে। 'বাংলা' এটা বিষয় হিসেবে শিক্ষকতার জন্য বেশি লাগছে, আগে সাংবাদিকতায় লাগত, কিন্তু এখন সাংবাদিকতায় গণযোগাযোগের ছাত্ররা যাচ্ছে আর বাংলার ছাত্রদের জন্য দুয়ার অনেকখানি বন্ধ হয়ে গেছে। কাজেই বাংলার ছাত্রদের এখন অবলম্বন হচ্ছে শিক্ষকতা এবং সংবাদ ক্ষেত্রে কাজ করা- রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্র। তবে এক্ষেত্রেও তাদের যথেষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে গণযোগাযোগে ডিগ্রি পাওয়া ব্যক্তিদের সঙ্গে।

এখন আমার অভিজ্ঞতায় দেখা যাচ্ছে যে, বাংলা সাহিত্য পড়ার আগ্রহ থেকে বাংলা পড়তে আসে এমন ছাত্রের সংখ্যা খুব কম। বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা বাংলা পড়ে তাদের অধিকাংশই অন্য বিষয় পড়তে না পেরে বাংলা পড়ে। সুতরাং এরকম ছাত্রদের নিয়ে সামনে এগোনো খুব মুশকিল। অর্থাৎ, তারা যে বিষয়ে উৎসাহী নয় সে বিষয়ে তাদেরকে পড়তে বাধ্য করা, এই ব্যবস্থাটা ঠিক নয়। যারা বাংলা ভালোবাসে, ভাষাকে, সাহিত্যকে, তাদেরই বাংলা পড়া উচিত।

ভাষাটা গবেষণা নয়, ভাষা হলো প্রকাশমাধ্যমঃ ড. সৌমিত্র শেখর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা সংসদ (ডিইউআরএস) থেকে গবেষণার নানা বিষয়ে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন অধ্যাপক ড. সৌমিত্র শেখর। সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন গবেষণা সংসদের রিসার্চ ম্যানেজার ***মোঃ ইউনুছ।***

বিনির্মাণঃ স্যার শুভ অপরাহ্ণ, কেমন আছেন স্যার?

সৌমিত্র শেখরঃ খুব ভাল আছি, তোমরা কেমন আছ?

বিনির্মাণঃ জ্বি, অনেক ভাল আছি, স্যার আমরা এসেছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা সংসদ থেকে আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাচ্ছি।

সৌমিত্র শেখরঃ আমিও মনে করি গবেষণা সংসদের মত একটি সংসদ থাকা উচিত, তোমাদের সাথে কথা বলে আমারও আনন্দ হবে আশা করি।

বিনির্মাণঃ স্যার আপনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক এবং আমরা জানি আপনি নজরুল গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক ও গবেষক হিসেবে আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্তিত্বের সঙ্গে গবেষণাকে কিভাবে সম্পর্কিত করতে চান?

সৌমিত্র শেখরঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নানা রকমের রয়েছে। এর মধ্যে অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা যেমন রয়েছে, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাও রয়েছে। অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বাইরে যখন আমরা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নিয়ে কথা বলি, তখন তার কয়েকটি স্তর থাকে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার কয়েকটি স্তরের মধ্যে প্রাথমিক পর্যায় থাকে, মাধ্যমিক পর্যায় থাকে, উচ্চশিক্ষা থাকে। উচ্চশিক্ষার সাথে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের পার্থক্যটাই হচ্ছে গবেষণা। এই গবেষণাটাই মূলত উচ্চশিক্ষাকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায় থেকে আলাদা করে। যদি গবেষণামনস্ক ছাত্রছাত্রী তৈরি করা না যায়, যদি অধ্যাপক অধ্যাপিকা যারা আছেন, তারা নিজেরা গবেষণায় যুক্ত না থাকেন, তাহলে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান তার লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হবে। এজন্য আমার মনে হয় যে উচ্চশিক্ষার সাথে গবেষণা ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

বিনির্মাণঃ আপনি উচ্চশিক্ষার সঙ্গে গবেষণার সম্পর্কের কথা বললেন। বর্তমানে শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, প্রযুক্তির এই বিশ্বায়নের যুগে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের বাইরে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গবেষণার তাৎপর্য কতটুকু বলে আপনি মনে করেন?

সৌমিত্র শেখরঃ গবেষণা মূলত দু'রকমের। একটা হচ্ছে, ইনোভেটিভ, যেটা নূতন নূতন জিনিস, যেটি নেই, এরকম একটি জিনিস তৈরীর ক্ষেত্র তৈরি করবে এবং সভ্যতায় নতুন করে একটা অবদান রাখবে। আরেকটি হচ্ছে বর্ণনাত্মক। অর্থাৎ অতীতে কি হয়েছে, কতটুকু হয়েছে, কোথায় কী ছিল, সেগুলিকে তুলে নিয়ে এসে উপস্থাপন করা। এখন, মূলত গবেষণার জন্য ইনোভেশনের দিকে আমাদের লক্ষ্য

রাখা দরকার। এবং সেটিকে যদি আমরা নূতন শতাব্দিতে লক্ষ রাখতে না পারি, অবদান রাখতে না পারি, তাহলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শতবর্ষ পূর্তির পূর্বে তার প্রতিষ্ঠার যে লক্ষ, তা সম্যকভাবে সফল হবে না।

বিনির্মাণ: আমরা তরুণ গবেষকদেরকে নিয়ে কাজ করে যাচ্ছি। তরুণরা কি গবেষণাবিমুখ হয়ে যাচ্ছে? আপনার কী মনে হয়? হয়ে থাকলে এর কারণ কী বলে আপনি মনে করেন?

সৌমিত্র শেখর: নিশ্চয়ই। আমাদের বড় ব্যাপার হলো, আমাদের গবেষণার অতীত নেই, যতটুকুই আছে, আমরা সঠিকভাবে উপস্থাপন করে তরুণদের আকৃষ্ট করতে পারি না। এই ব্যর্থতা সমন্বিত ব্যর্থতা। এই ব্যর্থতা অতীত থেকে চলমান, বর্তমানেও এটি আছে। একারণে তরুণরা খানিকটা দ্বিধাগ্রস্ত, দিকভ্রান্ত। এই ক্ষেত্রে কারণটা হচ্ছে আমাদের বড় ব্যাপার হলো, গবেষণার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে হবে। সারা পৃথিবীতেই গবেষণার জন্য এগিয়ে যাওয়ার উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এবং যত নোবেল পুরস্কার দেয়া হয়, এই নোবেল পুরস্কার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকেরা প্রাপ্ত হন। নতুন নতুন আবিষ্কারের জন্য। এবং এই অধ্যাপকদের সঙ্গে গ্রুপ ধরে কাজ করেন কিন্তু তরুণ শিক্ষার্থীরা। এই যে তারা ডেটাবেইজ তৈরি করেন, গবেষণার ক্ষেত্রে তারা হেল্পিং হ্যান্ড হিসেবে কাজ করেন, এই সমন্বিত চেষ্টার পরিপ্রেক্ষিতেই কিন্তু একটা নতুন জিনিস আবিষ্কৃত হয়। রসায়ন, পদার্থ, মনোবিজ্ঞান বা জ্ঞান বিজ্ঞানের নানা ক্ষেত্র অথবা কৃষি ক্ষেত্র ধরি; এই যে নতুন কিছু আবিষ্কৃত হলো, একজন বা দুজনকে আমরা নোবেল পুরস্কারের জন্য নাম ঘোষিত হতে দেখি। কিন্তু এর পেছনে একটা গবেষক দল কাজ করে। এই ধারণাটি আমাদের দেশে এখনও তৈরি হয়নি। আমাদের দেশে একজন বা দুজন গবেষণা করে থাকেন। এবং অতীতে যে গবেষণা হয়েছে, অধিকাংশই মানবিক বা কলায় গবেষণা হয়েছে। অর্থাৎ বিজ্ঞান বা প্রযুক্তির যে গবেষণা, এরকম গবেষণার ক্ষেত্রে অতীতে খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু হয়নি। বাংরাদেশের প্রেক্ষাপটে তরুণদেরকে এইদিকে আকৃষ্ট করতে হলে যেটা সবচাইতে বড় দরকার সেটি হল গবেষণাবান্ধব একটা পরিবেশ তৈরি করা, এবং এখানে প্রচুর অর্থ বরাদ্দ রাখা। সরকার যদি অর্থ বরাদ্দ না রাখেন, তাহলে সেখান থেকে আমরা ভালো ফল পাব না।

বিনির্মাণ: স্যার আপনি জানেন যে ২০১৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল শিক্ষার্থী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা সংসদ নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে এবং তরুণদেরকে নিয়ে গবেষণার কাজ করে আসছে। এই ব্যাপারটিকে আপনি কীভাবে মূল্যায়ন করবেন?

সৌমিত্র শেখর: আমি মনে করি এটা খুব ভালো কাজ। কিন্তু একই সঙ্গে এটাও বলি যে, আমাদের বাঙ্গালিদের একটা চরিত্র হল আমরা শুরু করি কিন্তু শেষ করি না। তরুণদের এই প্রতিষ্ঠানটি যেন বাঙ্গালির ঐ কথাটির সঙ্গে আটকে না থাকে যে, তারা

শুরু করেছে কিন্তু আর শেষ করেনি। তরুণদের মধ্যে গবেষণামনস্কতা তৈরি করা খুব জরুরি এবং তাদেরকে নানা জায়গায় ছড়িয়ে দেওয়া খুব জরুরি। গবেষণার যে বহুমাত্রিকতা রয়েছে, গবেষণার যে বহু ক্ষেত্র রয়েছে এবং গবেষণার যে পদ্ধতি রয়েছে, এগুলো জানতে হবে। আমাদের দেশে যে গবেষণা হয়, অধিকাংশই গবেষণার সঠিক পদ্ধতি জানে না। কোন ক্ষেত্রে গবেষণা করবে, তার ক্ষেত্র নির্বাচন করতে পারে না। চিন্তা করে এক, গবেষণা শুরু করে আরেক জায়গা থেকে। অর্থাৎ ক্ষেত্র নির্বাচন খুব গুরুত্বপূর্ণ। এ কারণে আমি মনে করি গবেষণা সংসদ ভালো অবদান রাখতে পারবে যাতে তরুণরা গবেষণার জন্য আকৃষ্ট হয়।

বিনির্মাণঃ তরুণদের এই উদ্যোগকে সফল করতে বিশ্ববিদ্যালয়, প্রশাসন, গবেষক-পরামর্শকদের পক্ষ থেকে কী ভূমিকা থাকতে পারে?

সৌমিত্র শেখরঃ আমি মনে করি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তো প্রাচ্যের অক্সফোর্ড, বাংলাদেশের প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়। বাংলাদেশের চেতনার বাতিঘর হিসেবে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে মনে করি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ই পারে গবেষণার জন্য দৃষ্টান্তযোগ্য কিছু কাজ করতে। এক্ষেত্রে তরুণদের মধ্যে গবেষণাপ্রিয়তা বাড়ানো, তাদের বিষয় ধরে দেওয়া এবং এক্ষেত্রে যদি কেন্দ্রীয়ভাবে কিছু বরাদ্দ রাখা যায়, সেটিও ভালো হয়। শতবর্ষকে সামনে রেখে এই সূচনাটা করা যেতে পারে। এজন্য বিভিন্ন সংগঠনের যারা গবেষণামনস্ক শিক্ষার্থী রয়েছে, তাদেরকেও এর সঙ্গে সম্পৃক্ত করা জরুরি।

বিনির্মাণঃ আমরা আরেকটি বিষয় লক্ষ্য করছি, দেশের ভিতরে এবং বাইরে অধিকাংশ উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে গবেষণাগুলো ইংরেজি মাধ্যমে হয়। এখানে বাংলা ভাষায় গবেষণার জায়গাটা একটু সীমিত রয়েছে কি? বাংলা ভাষাকে পৃথিবীতে আরও বেশি প্রসারিত করতে বাংলা ভাষায় গবেষণা করাটা কতটুকু তাৎপর্যপূর্ণ বলে আপনি মনে করেন?

সৌমিত্র শেখরঃ আমাদের দেশে একটা কূপমণ্ডুকতা রয়েছে। ভাষাটা তো গবেষণা নয়, ভাষাটা হল প্রকাশ। সারা বিশ্বে যত উন্নত দেশ রয়েছে, যারা বিজ্ঞানে অবদান রেখেছেন, তাদের কাছে ভাষাটা বড় ছিল না। যেমন আইনস্টাইন ভালো ইংরেজি জানতেন না। কিন্তু আইনস্টাইন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম বিজ্ঞানীদের একজন। তিনি জার্মান ভাষায় কাজ করেছেন, তার নিজের ভাষা এটা। একইভাবে অন্যান্য বিজ্ঞানী, মেডিক্যাল সায়েনটিস্ট তারা স্বদেশের ভাষায়ই কাজগুলো করে এসেছেন। অর্থাৎ, গবেষণাটাই আসল, আবিষ্কার করাটাই মুখ্য, এখন প্রকাশ বাংলায় করবে নাকি ইংরেজিতে করবে এটা তাদের ব্যাপার। কিন্তু আমাদের দেশে গবেষকদের হীনম্মন্যতা রয়েছে। তারা নানা জায়গা থেকে কুম্ভীলকবৃত্তির কিছু সুবিধা পায়। অর্থাৎ প্লেগিয়ারিজমের কিছু সুবিধা পায়। এ কারণেই আমার মনে হয় তাদের এই অতি ইংরেজিপ্রীতি। এতে দুটি জিনিস ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রথমত, তাদের গবেষণা, দ্বিতীয়ত স্বদেশের মান সম্মান এবং মাতৃভাষার মর্যাদা।

বিনির্মাণ: আমাদের মতো তরুণ গবেষকদের জন্য আপনার কী পরামর্শ থাকতে পারে?

সৌমিত্র শেখর: তরুণদের উদ্দেশ্যে একটাই কথা, সেটি হচ্ছে যে, প্রাইমারি স্কুল বা মাধ্যমিক স্কুল কিংবা কলেজ, তাদের সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল পার্থক্যই যেহেতু গবেষণা, তাই তাদের সার্টিফিকেট পাওয়ার পাশাপাশি গবেষণামনস্ক হওয়া উচিত। এবং এমন গবেষণা প্রয়োজন যেটি অতীতে ছিল না, যেটি সে নিজে তৈরি করবে। ইংরেজিতে invention এবং discover দুটি শব্দ রয়েছে। দুটির আলাদা অর্থও রয়েছে। তারা যেন invention এর দিকে মনোযোগী হয়। Discover এর দিকে তুলনামূলক মনোযোগ কম হলেও চলবে। আমাদের অধিকাংশ গবেষক, বিশেষ করে কলা ও সামাজিক বিজ্ঞানে, তারা Discover নিয়ে ব্যস্ত থাকে। আমাদের এখন প্রয়োজন নূতন নূতন জিনিস তৈরি করা। এক্ষেত্রে যদি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে অবদান রাখা না যায়, তাহলে বিশ্বে আমাদের মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার জায়গাটা কমে যাবে। আমি মনে করি, তরুণেরা এই কাজটি করতে পারবে। তাদের ওপর আমার সে আস্থা রয়েছে।

বিনির্মাণ: স্যার অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেয়ার জন্য।

সৌমিত্র শেখর: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা সংসদকেও ধন্যবাদ।

গবেষণার সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে: অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মনজুরুল করিম

অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মনজুরুল করিম- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের শিক্ষক ও গবেষক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা সংসদের অন্যতম সম্মানিত মডারেটর। তাঁর সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন গবেষণা সংসদের গবেষণা ও উন্নয়ন বিষয়ক সম্পাদক ***শবনুর এ জান্নাত****।*

বিনির্মাণ: স্যার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা সংসদ দুই বছর অতিক্রম করে তৃতীয় বর্ষ পার করছে। শুরু থেকেই গবেষণা সংসদের সঙ্গে আপনি আন্তরিকভাবে ছিলেন এবং আছেন। দুই বছরের এই যাত্রাকে কীভাবে মূল্যায়ন করবেন?

মনজুরুল করিম: দুই বছরেই একটি সংগঠনকে যাচাই বাছাই করা আসলে ঠিক না। কিন্তু এই দুই বছরে গবেষণা সংসদের অর্জন নেহায়েতই মন্দ নয়। অতি সম্প্রতি গবেষণা সংসদ একটি সেমিনারের আয়োজন করে সেখানে আমি বক্তা হিসেবে ছিলাম। ওপেন সায়েন্স সম্পর্কিত একটি সেমিনার ছিল সেটি। এটি অত্যন্ত যুগোপযোগী একটি উদ্যোগ এবং অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং গবেষণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সেই দিক থেকে বলতেই হবে তারা সময়োপযোগী বিষয়গুলো তুলে আনছে। ছাত্র ছাত্রীদেরকে সচেতন করছে এবং তাদের এই কার্যক্রম শিক্ষার্থীদের গণ্ডি পেরিয়ে অন্যান্য গবেষকদেরও ছুঁয়ে যাচ্ছে। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

বিনির্মাণ: স্যার, গবেষণা সংসদের কার্যক্রম দেখে কি মনে হচ্ছে সংসদটি যথাযথভাবে লক্ষ্যপানে এগিয়ে যাচ্ছে?

মনজুরুল করিম: আমার মনে হয়, এখন পর্যন্ত যথাযথ পথেই আছে। আমি যতদূর জানি, একটি বিদেশী সংগঠন তাদেরকে গবেষণা করার জন্য অনুদান দিয়েছে। সব মিলিয়ে ২ বছরের শিশু তো, এখনোও স্কুলে ভর্তি হয়নি, আর Morning Shows the Day. সে হিসেবে সঠিক নেতৃত্ব গুণ এবং সঠিক পরিচালনা ও দিক নির্দেশনা থাকলে তাদের যাত্রা আশা করি সুপথেই থাকবে। আমাদের দেশে প্রচুর গবেষণা হয় কিন্তু বেশিরভাগ গবেষণা দেখা যায় আঁতুড়ঘরেই থেকে যায়। একটি দেশ তার গবেষণার ফলেই ধীরে ধীরে সমৃদ্ধ হয়।

বিনির্মাণ: আঁতুড়ঘরে থেকে যাওয়ার কারণ কী স্যার?

মনজুরুল করিম: প্রথমেই বলা যেতে পারে, নেতৃত্বের অভাব। দেখা যায় সঠিক নেতৃত্ব না থাকার ফলে গবেষক এবং সরকারের মাঝে সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় না এবং গবেষণায় বরাদ্ধ না থাকার ফলে গবেষণাগুলো প্রাণ পায় না। তবে বাংলাদেশ সরকার এখন প্রায়োগিক গবেষণাকে প্রাধান্য দিচ্ছে। আমাদের দেশে যে রিসার্চ কালচারটা থাকা উচিত সেটা হয়তো এতদিন ছিল না। এখন আমাদের উচিত এই রিসার্চ কালচারটা কে নার্চার করা এবং সেই জায়গা থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা সংসদের একটি বিরাট ভূমিকা আশা করি থাকবে।

বিনির্মাণ: রিসার্চ কালচার বা এই গবেষণার সংস্কৃতি গড়ে তোলার জন্য গবেষণা সংসদের কী ভূমিকা হতে পারে? কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিৎ?

মনজুরুল করিম: আসলে গবেষণার সংস্কৃতি তো একদিনের গড়ে ওঠার বিষয় না। আমরা আমাদের মন স্থির করেছি মাত্র। এর ফলাফল স্তরে স্তরে ধীরে ধীরে আসবে। আর আমি

মনে করি, গবেষণা সংসদ সেই দিক থেকে আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে। এখন আমাদের দেশ গবেষণামুখী হচ্ছে দিন দিন। সেই দিক থেকে গবেষণা সংসদ একটি বীজ বপন করল মাত্র। এখন এটাকে নার্চার করতে হবে। এই বিষয়টিকে উৎসাহ দিতে হবে। আমি দারুণভাবে আশাবাদী। গবেষণা সংসদ প্রচুর দক্ষ ছেলেমেয়ে গড়ে তুলছে। তারা দক্ষ হয়ে আবার পরবর্তীতে নতুন দক্ষ জনগোষ্ঠী গড়ে তুলতে পারবে। আর রিসার্চকে কালচার হিসেবে গড়ে তুলতে হলে রিসার্চকে ভালোবাসতে হবে। এটার জন্য ধৈর্য দরকার। I would like to say it's a mission more than a profession. এটা অবশ্যই আমার পেশা হিসেবে আসবে। কিন্তু পেশার থেকে এটা যদি নেশা হিসেবে আমাদের মননে মগজে আত্মস্থ করা যায় তবে বিষয়টিতে অনেক বেশি প্রায়োগিক সাফল্য আশা করা যেতেই পারে। এটা তো আর ৮-৫ টা অফিস না। এটা যদি কেউ মনে করে তাহলে আমি মনে করি তার জন্য গবেষণা নয়। গবেষণার একটি ব্যাপ্তি আছে। এটাকে সময়ের মাঝে আবদ্ধ করা যায় না। আমি যখন ঘুমাচ্ছি তখনও আমার গবেষণা চলে। একটা ব্যাক্টেরিয়ার যখন বৃদ্ধি হয় তখন তার অনেক সময় লাগে। দেখা যায় পুরো রাত লেগে যায় তার বৃদ্ধি হতে। তখন তো আমার কিছু করার থাকে না শুধু সময়টা দেওয়া ছাড়া। তাই আমি এমনভাবে এটার যাত্রাটা শুরু করি যখন আমি ঘুমুতে যাই। তাই দেখা যায় যখন আমি ঘুমুচ্ছি তখন ব্যাক্টেরিয়ার বৃদ্ধি হচ্ছে। ঘুম থেকে উঠে আমি যখন সকালে আসি তখন আবার সেই ব্যাক্টেরিয়াকে নিয়ে কাজ করি। সুতরাং একজন গবেষক ঘুমিয়ে থেকেও গবেষণায় যুক্ত থাকতে পারে। আমরা গবেষণাকে ভালোবাসি বলেই আমরা গবেষণার মাঝে ঘুমুচ্ছি, খাচ্ছি। সুতরাং গবেষণাকে ভালোবাসতে হবে প্রথমে। আর তাছাড়া এখন বিশ্ব অনেক গতিশীল। হাতের মুঠোয় সবকিছু। আগে গবেষণার তথ্যভাণ্ডার এতটা হাতের মুঠোয় ছিল না। বিজ্ঞানের যে অবদান এখন আছে তাতে করে দেখা যায় গবেষণার সাফল্যের দুয়ার এখন অনেক ব্যাপক। সুতরাং এই ব্যাপকতাকে কাজে লাগিয়ে যে কেউ যদি সেই ধৈর্য নিয়ে সেই ভালোবাসা নিয়ে গবেষণা করতে পারে, সেটা যে বিষয়েই হোক, হোক না সেটা ইতিহাস বা বায়োলজিক্যাল সাইন্স, সে গবেষণায় সাফল্য পাবেই।

বিনির্মাণ: গবেষণায় বিভিন্ন ডিসিপ্লিনের মধ্যে আন্তঃযোগাযোগ থাকা কতটা জরুরি?

মনজুরুল করিম: দেখো, বর্তমানে একটা রিসার্চকে কেন্দ্র করে কেউ গবেষণায় এগিয়ে যেতে পারে না। এটাকে আমরা বলি মাল্টিনেটওয়ার্কিং। এই মাল্টিনেটওয়ার্কিংয়ের মাধ্যমেই আমাদের বিভিন্ন ডিসিপ্লিনকে সংযুক্ত করতে হবে। এবং এই সংযুক্তিকরণের মাধ্যমেই এই বিষয়টিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। একজন আইনের ছাত্র বলো, একজন সোসাল সাইন্সের ছাত্র বলো বা একজন স্ট্যাটিস্টিশিয়ান বলো, যখন আমাদের এখানে অনেক ডেটা জেনারেট হয় তখন আমাদের একজন স্ট্যাটিস্টিশিয়ানের প্রয়োজন হয়, আমাদের একজন লিগ্যাল এডভাইজারের প্রয়োজন হয়, একজন সোসাল সাইন্টিস্টের প্রয়োজন হয়। তো এই শাখাগুলোর মাঝে যদি সেরকম ইন্টারকানেকশন না থাকে তাহলে কোনো একটা উদ্দেশ্য সফলভাবে পূরণ করা সম্ভব হবে না। সেটা হয়তো অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সুতরাং এই সাইকেলটাকে পুরোপুরি সচল করার জন্য আমার মনে হয় তোমাদের নিজেদের মাঝে ভালো কানেকশন রাখা জরুরি। তোমরা সবাই মিলে বসে একটা আইডিয়া জেনারেট করতে পারো। An Idea can change the life, even

an idea can change a nation. সুতরাং আমার মনে হয় সোসাল সাইন্সের সাথে বিজ্ঞানের, কলার একটা সংযোগ স্থাপন করতে পারলে এবং তোমরা যদি সেভাবে কাজ চালিয়ে যেতে পারো তাহলে মাল্টিডিসিপ্লিনারি ওয়েতে কাজ করে সেই কাজের গতি আরো বেশি বৃদ্ধি পাবে। এই কালচারটা গড়ে উঠলে আমার মনে হয় ভালো হবে। আমি নিজেও সোসাল সাইন্সের কোনো লেকচারে যদি থাকতে পারি তাহলে সোসাল সাইন্স সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারব। এমনও হতে পারে তোমরা বিভিন্ন ডিসিপ্লিন থেকে গবেষকদের আমন্ত্রণ জানাতে পারো। হতে পারে সেটা রকেট সাইন্স থেকেও। এর ফলে কী হবে? সবার মধ্যে একটি যোগাযোগ তৈরি হবে এবং গবেষণা সম্পর্কে সবার মাঝে একটি উৎসাহ এবং জানার আগ্রহ তৈরি হবে। This is how you can build a research culture as a whole.

বিনির্মাণ: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তার গৌরবময় যাত্রার ১০০ বছর পুরণ করতে চলেছে এবং এই ১০০ বছর পূর্তিতে গবেষণা সংসদের লক্ষ্য কী হতে পারে?

মনজুরুল করিম: ১০০ বছরের একটি বিশ্ববিদ্যালয়, এটি অনেক বড় একটা ব্যাপার। যখন ১০০ বছর পূর্ণ করবে, আমাদের জাতির বয়স তখন মাত্র ৫০ হবে। সে হিসেবে যেমন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের জাতি গঠনে সবসময় একটি গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে সে দিক থেকে গবেষণা সংসদের এই প্রকাশনা 'বিনির্মাণ'ও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হাতে নিতে পারে। যেহেতু আমাদের দেশ এখন গবেষণামুখী হচ্ছে এবং আমাদের এই জ্যেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের জাতিকে বিনির্মাণ করছে। এভাবেও দেখা যায় যে, কোনো সংসদ বা কোনো সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা এখন সব থেকে বেশি। এছাড়াও আমরা এখন জাতিসংঘের এসডিজির দিকে লক্ষ্য করলে দেখব যে, ১৭ টি সেক্টরের প্রত্যেকটি বিষয়ই আমাদের গবেষণার বিষয় হতে পারে। এর প্রত্যেকটি বিষয়েই যদি তোমাদের মতো তরুণ গবেষকদের ব্রেইন স্টর্মিং হয় তবে এটা একটা দারুণ ফিডব্যাক নিয়ে আসতে পারবে বলে আমি মনে করি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে জাতি প্রত্যাশা করে। They are the safegaurde of the nation. এই গবেষণা আমাদের দেশের উন্নতিতেও দারুণভাবে কাজে লাগবে বলে আমি মনে করি।

বিনির্মাণ: স্যার, গবেষণা সংসদের তরুণ সদস্যদের প্রতি আপনার কী বার্তা আছে?

মনজুরুল করিম: দেখো, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়েও আমাদের গবেষণা সংসদের মতো একটি সংগঠনের গোড়াপত্তন ঘটেছিল। গোড়াপত্তনের পর থেকে সেই সংঠনের এখন যে বাজেট সেই বাজেট দিয়ে বাংলাদেশের মানুষকে ২ বছর খাওয়ানো-পরানো যাবে। সুতরাং আমি মনে করি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা সংসদও একদিন এরকম অবস্থায় যাবে। কালের বিবর্তনে হয়তো আমাদের এই অবস্থা দেখে যাওয়ার সৌভাগ্য হবে না। কিন্তু এই যে বীজ রোপিত হলো, এটা থেকে অনেক বড় গাছ হবেই। সে জন্য দক্ষ নেতৃত্ব দরকার এবং সেরকম দক্ষ নেতৃত্ব গড়েও তুলতে হবে যে এই সংগঠনকে আলোর মুখ দেখাতে পারবে।

আমরা বাঙালিরা কিছু করি না, করলে তা বিশ্বে উদাহরণ হয়ে যায়: ইলিয়াস কাঞ্চন

একজন সফল এবং জনপ্রিয় অভিনেতা হিসেবে তাঁকে যেমন আমরা জানি, তেমনি 'নিরাপদ সড়ক চাই' দাবিতে সামাজিক আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিত্ব হিসেবেও দেখে এসেছি গত কয়েক দশক ধরে। তিনি ইলিয়াস কাঞ্চন। তাঁর সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা সংসদের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক ***মুহাম্মদ তানবীরুল ইসলাম****।*

বিনির্মাণ: অভিনয় জীবনের শুরুটা কীভাবে হয়েছিল?

ইলিয়াস কাঞ্চন: অভিনয় জীবনের শুরুটা ছিল মূলত আকাঙ্ক্ষা থেকেই। নিজেকে বিকশিত করার আকাঙ্ক্ষা। আমি মনে করি, প্রবল ইচ্ছে থাকলে সৃষ্টিকর্তা তাকে সাহায্য করেন। একবার নাটকীয়ভাবে এক মঞ্চাভিনয়ের সময় সুভাষ দত্ত আমার অভিনয় পছন্দ করেন এবং আমাকে নিয়ে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। তিনিই মূলত শিল্পী ইলিয়াস কাঞ্চনের আবিষ্কারক।

বিনির্মাণ: 'পরিণীতা' ও 'শাস্তি' এ দুইটি চলচিত্রের জন্য আপনি জাতীয় পুরষ্কার পেয়েছিলেন। চরিত্র দুটি সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন কী?

ইলিয়াস কাঞ্চন: আমাদের চলচিত্রের দর্শকদের মধ্যে দু ধরনের মানুষ আছে। যারা সাধারণ মানুষ তারা সংখ্যায় বেশি এবং যেকোনো চলচ্চিত্র তাদের কারণেই ব্যবসাসফল হয়। আবার কিছু মানুষ আছে যাদের সংখ্যা কম, তারা সাধারণত চিন্তাশীল ছবিগুলো পছন্দ করেন। 'শাস্তি' হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা গল্প অবলম্বনে আর 'পরিণীতা' শরৎ চন্দ্রের লেখা উপন্যাস অবলম্বনে। দুইটি ছবিই কিন্তু সুধীজনদের ভালো লেগেছে, তবে তা আবার ব্যবসাসফল হয়নি। সাধারণ মানুষ মূলত বাংলা ছবিতে কিছু গতানুগতিক বিষয় প্রত্যাশা করে। যেমন প্রেম থাকতে হবে, মারামারি, গান, পরিবারের দ্বন্দ্ব-কলহ এবং সর্বশেষ মিটমাট হতে হবে। এগুলোই ব্যবসাসফল হয়।

বিনির্মাণ: 'বেদের মেয়ে জোৎস্না' চলচ্চিত্রটি এখনো পর্যন্ত বাংলাদেশের চলচ্চিত্র জগতের সর্বাধিক ব্যবসাসফল একটি চলচ্চিত্র, এটি সম্পর্কে বলুন।

ইলিয়াস কাঞ্চন: আমাদের কিছু নাড়ির টানের বিষয় আছে। যেমন; শহরে আমরা বাস করলেও কিন্তু ঈদ এলেই দেখা যায় সবার ভেতর গ্রামে ফেরার তাড়া থাকে। পুরো ঢাকা শহর খালি হয়ে যায়। আবার দেখবেন কিছু কিছু গল্প আছে যেগুলি আমাদের বাবা, দাদাদের কাছ থেকে যুগ যুগ ধরে শুনে এসেছি। সে গল্পগুলি যে আসলে আমাদের মধ্য থেকেও যে হারিয়ে গেছে তা কিন্তু না। যে গল্পগুলো মাটির কথা বলে, নাড়ির কথা বলে, যেগুলো আমাদের সমাজের মানুষের মনে অবচেতনভাবে আছে, যা অচেতন থেকে মাঝে মাঝে আবার সুস্পষ্ট হয়ে আসে। আমরা সাধারণত অবচেতন মনে সেই পুরনোয় ফিরে যেতে চাই। আমরা শহরে থাকলেও তা আমাদের

নাড়া দেয়। বেদের মেয়ে জোৎস্না আসলে সেরকমই একটা গল্প। এখানে লৌকিকতার মাঝে প্রেমের গল্প। আরেকটা বিষয় হলো, ধনী গরীবের দ্বন্দ্ব। মূলত এই বিষয়গুলি আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে আর যা মানুষকে আকৃষ্ট করেছে।

বিনির্মাণ: চলচ্চিত্রের জন্য আপনি জাতীয় পর্যায়ে পুরষ্কৃত হয়েছেন। আবার সামাজিক কাজের জন্যও সর্বোচ্চ পুরষ্কার একুশে পদক পেয়েছেন। এক্ষেত্রে কোনটিতে আপনার আত্মতৃপ্তি বেশি মনে হয়েছে।

ইলিয়াস কাঞ্চন: পুরস্কার পাওয়ার জন্য আসলে কাজ করিনি। বিশেষ করে সামাজিক কাজের জন্য কখনোই আশা করিনি। তবে চলচ্চিত্রে কাজের সময় কখনো কখনো পুরষ্কৃত বা স্বীকৃত হওয়ার একটা আকাঙ্ক্ষা ছিল। কিন্তু সামাজিক কাজের যেটুকু করেছি সেটি আমার দায়িত্ববোধ থেকে। এক্ষেত্রে বলা যায় যখন আমার স্ত্রী মারা যায়, আমি চলচ্চিত্র থেকে বিদায় নিতে চেয়েছিলাম। একজন পরম শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি তখন আমার উপলব্ধির জায়গায় ধাক্কা দিয়েছিলেন। তিনি আমাকে বললেন, আপনি কি শুধু আপনার কথাই ভাববেন। আপনাকে যারা আজকের ইলিয়াস কাঞ্চন বানিয়েছেন তাদের কথা কি ভাববেন না। দেশে অনেক দুর্ঘটনা ঘটছে। হয়তো আপনি একজন ভালোবাসার মানুষকে বাঁচাতে পারেননি, কিন্তু যারা আপনাকে এত ভালোবাসে তাদের জন্য কি কিছু করবেন না। এরপর আমি অনেক ভাবলাম। অনেক গবেষণার পর সিদ্ধান্ত নিলাম, সমাজ নিয়ে কাজ করতে হবে। 'নিরাপদ সড়ক চাই' আন্দোলন করতে হলে আমি ভেবে নিয়েছি আমাকে কী কী ছাড়তে হবে। অনেক মানুষের স্বপ্নের নায়ক হয়তো বাস্তবে সবার কাছে ভালো হয়ে উঠতে পারবে না। আমার অবস্থান সেই নাম্বার ওয়ান থাকবে না। আমি নিজেকে প্রশ্ন করলাম, তুমি কি তোমার অর্থ বিত্ত হারাতে চাও! জনপ্রিয়তা হারাবে হয়তো যদি এই আন্দোলন করো! আবার নিজেই উত্তর দিয়ে বললাম, রাজি আছি। আমি যাদের ভালোবাসায় আজকের এই অবস্থানে এসেছি, তাদের জন্যই সব ত্যাগ করব। আমি এখন ভাবি, সৃষ্টিকর্তা হয়তো আমাকে দিয়ে এই সামাজিক আন্দোলন করার জন্যই আমার স্ত্রীকে নিয়ে গেছেন।

বিনির্মাণ: এটা কি ব্যক্তি স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে সমষ্টিগত উন্নয়নের দৃষ্টান্ত বলা যেতে পারে না!

ইলিয়াস কাঞ্চন: ব্যক্তি স্বার্থ আমাদের সবার মধ্যেই আছে। কিন্তু সমষ্টিগত স্বার্থের মধ্যেও যে ব্যক্তি স্বার্থ আছে সেটা আমাদের অনেকের মাথায়ই নেই। আমি একবার এনবিআরের একটা প্রোগ্রামে এই কথাটি বলেছিলাম। যেমন আমরা যদি ট্যাক্স দিই ঠিকমতো তাতে করে দেশের উন্নতি হবে। বহির্দেশে আমাদের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে। ব্যবসা-বাণিজ্য করার জন্য বিদেশে গেলে আমাদের প্রতি মূল্যায়ন ভালো হবে। সমষ্টিগত উন্নয়নের মানে হলো টেকসই উন্নয়ন। সমষ্টিগত উন্নয়নের ফলে সমাজে অপরাধ প্রবণতাও কমে আসবে। পরিবারের মধ্যে আমরা ভাই ভাইয়ের মধ্যেই দেখি, এক ভাই অনেক বিত্তবৈভবের মালিক, আরেক ভাইয়ের কিছুই নেই।

সুতরাং দেখা যায় অপর ভাই বিভিন্ন রকম অপরাধে লিপ্ত হচ্ছে যার দরুন যে ভাইটি অনেক সম্পদের মালিক সেও সমাজের চোখে ঘৃণ্য হয়ে আছে। তবে এ বিষয়টা আমার মনে হয় আমাদের সমাজ এবং রাজনীতির নেতৃত্বের উপলব্ধিতে আনা উচিত।

বিনির্মাণঃ সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে 'নিরাপদ সড়ক চাই' এর যে আন্দোলন আপনি শুরু করেছিলেন তা সমাজে এক অনন্য জাগরণ সৃষ্টি করেছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে 'সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮' তে আপনি প্রাপ্তি কতটকু খুজে পেলেন?

ইলিয়াস কাঞ্চনঃ আমাদের দাবিতে আমরা যেভাবে চেয়েছি সেভাবে পুরোপুরি আমরা পাইনি। তবে তুলনামূলকভাবে বলতে গেলে বলতে হবে আগের চেয়ে উন্নতি হয়েছে। ড্রাইভিং লাইসেন্স, অনিয়মে জরিমানা এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের ক্ষতিপূরণ-প্রাপ্তি বলতে এ বিষয়গুলিই উল্লেখযোগ্য। তবে শাস্তির কথায় আমাদের যে দাবি ছিলো সেটির জন্য যখন আলোচনা হচ্ছিল তখন পরিবহন চালক, শ্রমিকদের পক্ষ থেকে হরতাল দিয়ে চাপ সৃষ্টির চেষ্টা ছিল। তবুও বলব, এতকিছুর পর যেটুকু পেয়েছি, বলতে হবে কিছুটা উন্নতি হয়েছে। সম্প্রতি ট্রাফিক ব্যবস্থা একটা সুশৃঙ্খল নিয়মের মধ্যে আনার জন্য প্রশাসনের যে প্রচেষ্টা সেটা সত্যি প্রশংসনীয়। হেলমেটের ব্যবহারের ক্ষেত্রে বর্তমানে আশানুরূপ পরিবর্তন ঘটেছে। তবে বাকি দিকগুলির ক্ষেত্রে উদ্যেগের পাশাপাশি এখন দেখার বিষয় হলো সেটা আমরা কতটুকু বাস্তবায়ন এবং এই বাস্তবায়নের ধারা কতদূর অব্যাহত রাখতে পারি। তবে সরকারের কাছে আমাদের আরেকটা পরামর্শ ছিল, সড়কের আইন সচেতনতার দায়িত্ব প্রশাসনের পাশাপাশি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলির মাঝে- যেমন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, অফিস আদালতে সবার কাছে চিঠি দেয়া, যে তিন মাসের মধ্যে তারা যেন তাদের লোকগুলোকে সড়কের আইনের ব্যাপারে সচেতন করে তোলে। এবং এই ব্যাবস্থার আওতাধীন শাস্তির ব্যবস্থাও রাখা। যদি কেউ ট্রাফিক আইন ভঙ্গ করে সচেতন করার পরেও, তাকে তার স্ব স্ব প্রতিষ্ঠান শাস্তি প্রদান করবে। এভাবেই সমাজে একটা দায়বদ্ধতা তৈরি হবে। আমরা বাঙালিরা কিছু করি না, আবার করলে এমনভাবে করি সেটা বিশ্বে উদাহরণ হয়ে যায়।

বিনির্মাণঃ আপনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে কিছু কথা শুনতে চাই।

ইলিয়াস কাঞ্চনঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আসলে যে ঐতিহ্য ছিল তা আজকে ম্লান হয়ে গেছে। বর্তমানে ছাত্ররাজনীতির ক্ষেত্রে যারা নেতৃত্বে আছেন তাদের উচিত এ বিষয়ে দায়িত্ববান হওয়া। ছাত্রদের স্বার্থে কাজ করা। ছাত্রদের ক্ষেত্রে বলব সামাজিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করা জরুরি। সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকেও উচিত এ বিষয়গুলোতে গুরুত্ব দেয়া।

বিনির্মাণঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা সংসদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের গবেষণায়

অনুপ্রাণিত করে। তাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলুন।

ইলিয়াস কাঞ্চন: আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে এ রকম একটা সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে শুনে। আমাদের সময় এ রকম কিছু ছিল না। থাকলে আমিও এর সঙ্গে জড়িত হতাম। লক্ষস্থাপন, চিন্তা ভাবনা, গবেষণা না থাকলে সফল হওয়া যায় না। আমাকে আমার এই পর্যায়ে আসতে দীর্ঘ গবেষণা করতে হয়েছে। অনেকে ক্রিকেটকে খেলা হিসেবে দেখে। আমি সেই ক্রিকেটকে একটা জীবন হিসেবে দেখি। আপনি দেখবেন কখনো একজন ব্যাটসম্যান ফ্রন্টফুটে খেলে, কখনো ব্যাকফুটে, কখনো স্টপ করে, মারে না কিন্তু। আবার কখনো কখনো সময়মতো মারে, সেটা ছক্কা হয়। এজন্য আপনাকে বুঝতে হবে আপনি কী করবেন। জীবনকেও বুঝতে হবে। সময়গুলো কাজে লাগাতে হবে। জীবনের সিদ্ধান্তগুলো নিতে হবে। এজন্য আপনাকে জীবনকে জানতে হবে এবং গবেষণা করতে হবে। নিজের উন্নতি, সমাজের উন্নতি, দেশের উন্নতি করতে হলে আপনাকে অবশ্যই গবেষণা করতে হবে। কীভাবে কাজগুলো সহজে করা যায় আপনাকে ভাবতে হবে। আর সড়ক দুর্ঘটনা নিয়েও আমি মনে করি আরো গবেষণা হওয়া দরকার। কীভাবে দুর্ঘটনা আরো কমিয়ে আনা যায়, কীভাবে সড়কের নিয়ম শৃঙ্খলার আরো উন্নয়ন করা যায় সে বিষয়ে ভাবতে হবে। আমি তো সর্বদাই আমার নিজের মধ্যে এ বিষয়ে গবেষণা করছি, তবে দেশের গুণীজনরাও যদি গবেষণার মাধ্যমে আরো গ্রহণযোগ্য কোনো পদ্ধতি বের করতে পারেন সেটা আমাদের সমস্যা আরো দ্রুত কমিয়ে আনবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

বিনির্মাণ: আপনাকে ধন্যবাদ।

ইলিয়াস কাঞ্চন: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা সংসদকেও ধন্যবাদ।

নতুন কিছু সৃষ্টির জন্য একাগ্র সাধনা অপরিহার্য: দ্বিজেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী

'পতিংবরা'- বাংলা সাহিত্যের এক বিস্ময়কর সংযোজন। প্রায় ২২০০ শব্দের এই উপন্যাসের প্রতিটি শব্দ-ই শুরু হয়েছে 'প' বর্ণ দিয়ে। এই অনন্য অসাধ্যটি কীভাবে সাধন করলেন- তা জানতে উপন্যাসের লেখক দ্বিজেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর মুখোমুখি হয়েছিল 'বিনির্মাণ'। 'পতিংবরা'র পাশাপাশি উঠে এসেছে অন্যান্য প্রসঙ্গও। সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন গবেষণা সংসদের সদস্য ***তারিফুল ইসলাম।***

বিনির্মাণ: বর্ণ নিয়ে খেলা করে নতুন কিছু সৃষ্টি করার চিন্তা কীভাবে আপনার মাথায় এলো?

দ্বিজেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী: আজ থেকে ২৫ বছর আগে আমি যখন লেখালেখি শুরু করি তখন একটা মাসিক পত্রিকায় ৫-৬ লাইনের একটি লেখা পড়েছিলাম। ঐ লেখাটির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল, লেখাটির মধ্যে সবগুলো শব্দ-ই শুরু হয়েছিল 'আ' বর্ণ দিয়ে এবং ঐ লেখাটা আমাকে ভীষণভাবে আলোড়িত করেছিল। তখন থেকেই আমি বর্ণ নিয়ে গবেষণা শুরু করি এবং স্থির করি আমি এই ধরণের কাজ করব।

বিনির্মাণ: বাংলা বর্ণমালার মধ্য থেকে 'প' বর্ণটিকেই কেন আপনি উপন্যাস লেখার জন্য নির্বাচন করলেন?

দ্বিজেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী: আমি যখন বর্ণ নিয়ে গবেষণা শুরু করলাম তখন দেখতে পেলাম যে, বাংলা অভিধানে সব থেকে বেশি সমৃদ্ধ বর্ণ হচ্ছে 'প'। এই বর্ণটিকে ব্যবহার করে আমি প্রচুর শব্দ আমার লেখাতে অন্তর্ভুক্ত করতে পারব যা আমার লেখার জন্য সহায়ক হবে। মূলত, এই কারণেই আমি বাংলা বর্ণমালা থেকে 'প' বর্ণটিকে নির্বাচন করি উপন্যাস লেখার জন্য।

বিনির্মাণ: আপনার ২৫ বছরের গবেষণার ফল 'পতিংবরা' উপন্যাস। এই কষ্টকর কাজটি ২৫ বছর ধরে কিভাবে আপনি একাগ্রচিত্তে করে গেলেন?

দ্বিজেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী: কোনো কিছু তো আর একদিনে হয় না। নতুন কিছু সৃষ্টি করতে হলে একাগ্র সাধনা অপরিহার্য। আমি প্রথমে বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন গল্প লিখি যার প্রতিটি শব্দই শুরু হয়েছিল 'প' বর্ণ দিয়ে এবং যখন গল্পগুলো লেখা শেষ হয় তখন আমি সবগুলো গল্প একসাথে করে 'পতিংবরা' উপন্যাস লেখায় মনোনিবেশ করি। আর মানুষ যখন সৃষ্টি সুখের উল্লাসে পড়ে যায় তখন দিনের পর দিন একাগ্রচিত্তে কাজ করা খুব সহজ হয়ে যায়।

বিনির্মাণ: বাংলা সাহিত্যের বিস্ময়কর উপন্যাস 'পতিংবরা'। এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু নিয়ে যদি কিছু বলতেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী: 'পতিংবরা' উপন্যাসের মূল উপজীব্য বিষয় হল- প্রেম, প্রীতি, প্রণয় এবং পরিণয়। এটি একটি পারিবারিক প্রণয়োপন্যাস এবং লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন এর মূল চারটি উপজীব্য বিষয়ের প্রতিটি শব্দই 'প' বর্ণ দিয়ে শুরু হয়েছে। তাছাড়া উপন্যাসের প্রতিটি শব্দ-ই শুরু হয়েছে 'প' বর্ণ দিয়ে।

বিনির্মাণ: বর্তমানে আপনি কী নিয়ে কাজ করছেন?

দ্বিজেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী: আমি নিজেকে শুধু উপন্যাস এবং গল্প লেখার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিনি। আমি বেশকিছু নাটক লিখেছি এবং নাটক মঞ্চায়ন করে যাচ্ছি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনী নিয়ে গবেষণা করছি। আমার গবেষণা লাইব্রেরিতে রবীন্দ্রনাথের জীবনীর উপর একশোর বেশি বই রয়েছে। আমি বাংলা বর্ণমালা নিয়ে গবেষণা করে যাচ্ছি এবং আমার সংগ্রহে প্রায় একশটির মতো বাংলা অভিধান রয়েছে।

পতিংবরা প্রণয়োপন্যাসের পূর্বাভাষ

“পতিংবরা পুস্তকটি পারিবারিক প্রণয়োপন্যাস। প্রকৃষ্ট পদ্ধতিতে প্রথম প্রস্তুতকৃত পুস্তকটির প্রতি পৃষ্ঠার পদের প্রারম্ভে প-বর্ণটির প্রয়োগ পরিদৃশ্যমান। প্রচলিত পদ্ধতির পরিবর্তে পূর্বাপেক্ষা পৃথক পদ্ধতিতে প্রথম প্রস্তুতকৃত প্রণয়োপন্যাসটিতে প্রতীক্ষারত প্রেমিক-প্রেমিকাদের প্রতিনিধি প্রভাকর-পূর্ণিমার প্রকৃতিজাত পরিশুদ্ধ প্রেম-প্রীতি প্রাধান্য পেয়েছে।

প্রমত্ত পদ্মার পরিণতি, পাঠশালায় পড়াশোনা, পশু-পাখির প্রতি প্রীতি প্রদর্শন, পুণ্যবান-পাপাচারীদের পথের পার্থক্য, পুণ্যবতী পুরনারীর পতিসেবা, পঙ্কিল পথে পতিতাদের পথচলা, পরকীয়া প্রেমের পরিণতি, পাপময় পণপ্রথা প্রত্যাখ্যান, পথাশিশুদের পুষ্টিহীন পানাহার, প্রতিবন্ধীদের প্রতি প্রীতি প্রর্দশন, পারিবারিক পরিণয় পর্ব, পরে প্রীতিভোজ, পরিশেষে পুষ্পশয্যায় পাত্র-পাত্রীর প্রেমাভিনয় পতিংবরার প্রধান প্রেক্ষাপট।”

-দ্বিজেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী

জীবনে সহজ পন্থা নয়, বেছে নাও সঠিক পন্থা: আয়মান সাদিক

আয়মান সাদিক। ১০ মিনিটের স্বপ্ন-কারিগর তিনি। যিনি ভালবাসেন স্বপ্ন দেখতে, বই পড়তে কিংবা অজানাকে জেনে তা মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিতে। পড়াশোনার মতো একঘেয়েমি বিষয়টিকে আনন্দের ছলে একটি নতুন মাত্রায়, ভিন্ন আঙ্গিকে ও বিনামূল্যে দেশের আনাচে-কানাচে, সর্বস্তরে পৌঁছে দেয়াই তার জীবনের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য। বিনয়ী, প্রাণোচ্ছল, স্বপ্নবাজ এই তরুণ শিক্ষাবিদের সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা সংসদের সদস্য ***সুমাইয়া বিনতে আলী শৈলী*** *।*

বিনির্মাণ: শিক্ষাক্ষেত্র নিয়ে কাজ করার ভাবনাটি কীভাবে এলো?

আয়মান সাদিক: আইবিএ-তে ঢোকার পর আমি মেন্টরসে (কোচিং সেন্টার) পড়াতাম। মেন্টরসে পড়ানোর সময় আমি শিক্ষার্থীদের সঙ্গে অনেক বেশি ঘনিষ্ঠ ছিলাম। আস্তে আস্তে আমার পড়াতে ভালো লাগা শুরু করল খুব বেশি। যেহেতু শিক্ষার্থীদের সঙ্গে অনেক ঘনিষ্ঠ ছিলাম এবং সেখানে ৩ দিন পর ফুল পেমেন্ট শতভাগ দিয়ে দিতে হতো, তাই ২-৩ দিন পরই আমার কাছে অনেক শিক্ষার্থী আসত। তখন অনেকেই আমার কাছে এসে বলত, ভাইয়া, আমার বাবা আমাকে ৭০০০ টাকা দিয়ে ঢাকায় পাঠিয়েছে, কোচিং-এর ফি ১৩ হাজার টাকা, এখন আমি কী করব? যেহেতু তাদের সঙ্গে আমার হৃদ্যতা ছিল, আমি তাদেরকে সাহায্য করতে চাইতাম, কিন্তু উপায় তো নেই। আমি হয়তো ৭ হাজার টাকা দিয়ে তাকে মেন্টর্সে ভর্তি করিয়ে দিলাম কিন্তু ও থাকবে কোথায়, খাবে কী? এবং এরকম অভিজ্ঞতা আমার প্রায়ই হতে লাগল। তখন আমি খেয়াল করলাম, শুধু সামর্থ্যের অভাবে কিংবা আর্থিক সহায়তার অভাবে প্রচুর শিক্ষার্থী শিক্ষাব্যবস্থা থেকে একটা বিরতি নিয়ে ফেলছে বা তারা হয়তো বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত যেতে পারছে না। কেউ কেউ হয়তোবা ঢাকায় আসতে পেরেছে, অন্যদিকে কোনো শিক্ষার্থী কিংবা একটি মেয়ে হয়তো রংপুর, দিনাজপুরে বসে আছে। ঢাকায় কোনো প্রতিবেশি, পরিচিত আত্মীয়-স্বজন নেই বা কারো কাছে পাঠাতে পারবে এমন কোনো জানাশোনা মানুষও নেই। এ কারণে হয়তো ঢাকায় পাঠাতে পারছে না, কোচিংও করা হচ্ছে না, এভাবে তার স্বপ্ন পূরণ করাও হচ্ছে না। তখন মনে হলো শুধু সামর্থ্যের অভাবে বা ঢাকার বাইরে থাকার কারণে, এই ছেলেমেয়েগুলো কখনো তাদের স্বপ্ন ছুঁয়ে দেখতে পারছে না। তখনই প্ল্যান করলাম, এই ঝামেলা দুটো মেটানোর জন্য কী করতে হবে? এটাকে ফ্রি করতে হবে। তখনই মূলত ১০ মিনিট স্কুলের কাজ শুরু হলো। তারপর আরো ২ বছর লাগে পুরো জিনিসটা চালু করার জন্য।

বিনির্মাণ: কথার জাদু দিয়ে তরুণ সমাজকে মুগ্ধ করা- এর পেছনে আপনার রহস্যটা কী?

আয়মান সাদিক: এটা কখনো আমার প্ল্যান ছিল না যে, আমি সব স্কুল-কলেজে গিয়ে কথা-বার্তা বলব। আমার পড়াতে ভালো লাগত। আমার জীবনে মানুষকে পড়ানোর ধাপটি শুরু করি মূলত অঙ্ক পড়িয়ে। মেন্টরসে আমি গণিত ও মানসিক দক্ষতার ইন্সট্রাক্টর ছিলাম। এদিকে বাসায় শিক্ষার্থীদের ইংলিশ পড়াতাম, এভাবে পরে তাই ইংলিশও পড়াতে লাগলাম। তো এই জিনিসগুলোই আমি আস্তে আস্তে বিভিন্ন স্কুল-কলেজে শেখানো শুরু করলাম এবং দেখলাম যে, অনেক ছোট ছোট জিনিসে বাচ্চারা অনেক খুশি

হয়। এই বিষয়টা এভাবেও পড়ানো যায় কিনা ভেবে হয়তো একটা ভিন্নধর্মী কৌশল দেখালাম, এতে করে ওরা অনেক খুশি হয়ে যেত। তারপর ওদের পাওয়ারপয়েন্ট বানানো শেখাতাম, প্রেজেন্টেশন দেয়া শেখাতাম। আমি যে জিনিসগুলো পারতাম, শুধু ঐ জিনিসগুলোই বলতাম এবং দেখলাম যে, এই জিনিসগুলো তাদেরকে হয়তো কোনোদিন ঐভাবে শেখানো হয়নি। বাচ্চারা অনেক খুশি হতো। এভাবে আমিও অনেক উৎসাহ পেতাম এবং আস্তে আস্তে অনেক স্কুল-কলেজে যাওয়া শুরু করলাম। তো এটা কখনো কোনো প্ল্যান করে করা হয়নি। আস্তে আস্তে দেখা গেল প্রতিদিনই কোনো না কোনো স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে যাচ্ছি। তাই বলতে গেলে, এটা অনেকটা অপরিকল্পিত একটা কাজ হয়ে গেছে আমার জীবনে।

বিনির্মাণ: একজন সফল উদ্যোক্তা হওয়ার জন্য কী কী গুণাবলি থাকা প্রয়োজন?

আয়মান সাদিক: এই প্রশ্নের উত্তর তো আসলে দিতে পারব না আমি। কেননা, আমি এখনো সফল উদ্যোক্তা নই। আমার যাত্রা কেবল শুরু হয়েছে। বলতে গেলে আমাদের ১০ মিনিট স্কুল এখনো অনেক ছোট। আমাদের স্টুডিও এখনো বেশ ছোট, অগোছালো; সবকিছু একটা ছোট জায়গার মধ্যে সীমাবদ্ধ। আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি আস্তে আস্তে জিনিসটা আরো বড় করার জন্য। তাই সফল উদ্যোক্তা হওয়ার সমাধান হয়তো আমি দিতে পারব না। সেক্ষেত্রে আমার গত তিন বছরের ভ্রমণের একটা ছোট জিনিস বলতে চাই। আমার জীবনে একটা জিনিস আমাকে খুব সাহায্য করেছে, সেটা হলো ছাত্রাবস্থায় এই জিনিসটি শুরু করা। যেহেতু আমি আমার দ্বিতীয় বর্ষে পড়ার সময় থেকেই কাজটা শুরু করি, চতুর্থ বর্ষে গিয়ে জিনিসটা একটা জায়গায় চলে এসেছিল। এর ফলে পরবর্তী সময়ে আমি চাকরি-বাকরি না করে, এটা নিয়েই থাকতে পেরেছি। তাই আমার কাছে মনে হয়, তোমরা যারা শিক্ষার্থী আছো, যারা এই সাক্ষাৎকারটি পড়বে, তাদের জন্য আমার ছোট্ট একটি পরামর্শ, তাদের মাথায় যদি কোনো একটা আইডিয়া থাকে, একটা প্ল্যান থাকে বা একটা বিজনেস দাঁড় করানোর যদি কোনো ধরনের একটা অনুপ্রেরণা থাকে, শুরু করে দাও। ছাত্রাবস্থাতেই তো করছো, ফেইল করলে কীইবা এমন হবে! তোমার তো এখন বউ-বাচ্চা নেই, পরিবারও চালাতে হচ্ছে না, ফেইল করলে এখন ফেইল করবে, পরে না হয় চাকরি করলে, কোনো অসুবিধা তো নেই। সেক্ষেত্রে কোনো দুঃখ নেই, আফসোসটাও আর থাকছে না। ছোট্ট এই পরামর্শটা রইল, যদি কোনো আইডিয়া থাকে, এখনই শুরু করো, সেটাই উত্তম।

বিনির্মাণ: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য আছে একটি সমৃদ্ধ কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি এবং সেখানে আছে দেশ-বিদেশের প্রায় লাখ খানেক বই, প্রবন্ধ, জার্নাল ইত্যাদি। কিন্তু লাইব্রেরির ভেতরে প্রবেশ করলে দেখা যায় সবার হাতে খোলা বাজারে বিক্রি করা বিভিন্ন প্রকাশনীর বিসিএস গাইড, সল্যুশন ইত্যাদি। চার বছর শিক্ষার্থীরা বলতে গেলে এভাবেই পার করে। গ্র্যাজুয়েশন শেষ করার পর প্রত্যেকে একটি তাৎক্ষণিক সাফল্যের পেছনে ছুটছে। আপনি একজন তরুণ শিক্ষাবিদ হিসেবে কী মনে করেন, আমাদের শিক্ষার মানটা তাহলে কোথায় যাচ্ছে?

আয়মান সাদিক: মান কোথায় যাচ্ছে তা আশা করি আমরা সবাই দেখতে পারব। চার

বছর আমরা যে বিষয়ে পড়াশোনা করছি এবং অনার্স, মাস্টার্স করছি, সেটার পেছনে সময় না দিয়ে যদি অন্য জায়গায় দিই, অবশ্যই জিনিসটা ভালো দিকে যাচ্ছে না। এটা তো আসলে বলার দরকারই নেই কিন্তু কারণটা আমি একটু ছোট করে বলতে চাই। যার জন্য আসলে ঝামেলাটা হচ্ছে। তবে কাউকে দোষ দিয়ে কোনো লাভ নেই। আমরা ছোটবেলা থেকে যখন বই পড়ি, আমাদের বই পড়ার মূল কারণটা থাকে পরীক্ষায় ভালো করা, পরীক্ষায় যেন একটা ভালো নম্বর পাই। সেক্ষেত্রে ভালো নম্বর কেন পাওয়া দরকার? কারণ, আমি যেন এসএসসিতে ভালো করি ও ভালো একটা কলেজে ভর্তি হতে পারি। ভালো কলেজে ভর্তি হয়ে কী করব? যেন আমার এইচএসসি রেজাল্ট ভালো হয়। এইচএসসি রেজাল্ট ভালো কেন করব? যেন আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পেতে পারি। বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন চান্স পেতে পারি? কারণ ভালো একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পেলে একটা ভালো চাকরি করব। ঐ জায়গা থেকেই আসলে একটা ইচ্ছা আসে যে, আমি এখন বিসিএসের পড়াশোনা করব। আমাদের মাথায় সবসময় বই পড়ার কারণটা আসলে থাকে যে, বই পড়লে কিছু একটা হবে এবং সেটা হলো Short term-এ অর্থাৎ আমি এখন বই পড়ব এবং কালকে পরীক্ষায় ভালো করব। এই অভ্যাসটা আসলে আমাদের ছোটবেলা থেকেই গড়ে উঠেছে। ফলে আমরা আসলে চাইলেও পড়াশোনার ওপর নির্ভরশীল বা গ্রেডের উপর নির্ভরশীল এসব বই বাদে অন্য বই পড়তে চাই না। কারণ, অভ্যাস এবং এই জিনিসটা আমারও ছিল। আমিও আজ থেকে ২ বছর আগে পড়ালেখার বাইরে কোনো বই পড়তাম না। পরে যখন দেখলাম, প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনার বাইরের বইগুলো নিয়ে আসলে গবেষণা করলে বা পড়াশোনা করলে, জীবনের ওপর যে বড় একটা ইতিবাচক প্রভাব আসে- এই বিষয়টা যখন বুঝতে পারলাম, তখন থেকে বই পড়া শুরু করলাম। মানুষের বুঝতে আসলে সময় লাগে। যেমন- আমি বই পড়া শুরু করার পর আমার স্টুডিওতে ছোট একটা লাইব্রেরি তৈরি করেছি, যেখানে সবগুলো হলো self-help-এর বই। তোমার জীবনে চলার পথে এই বইগুলো যদি তুমি পড়ো, তাহলে জীবন সম্পর্কে তোমার একটা পরিষ্কার ধারণা আসবে। সেক্ষেত্রে একটা নির্দিষ্ট বিষয়ে হয়তো তুমি গবেষণা করছ, সেটার ব্যাপারে তোমার জ্ঞানের গভীরতা বাড়বে। জিনিসটা আসলে মানুষকে উপলব্ধি করতে হবে, উপলব্ধি ও হিট হওয়ার পর মানুষের মধ্যে হয়তোবা সেই পরিবর্তনটা আসে। তাই যে জিনিসটা বললাম, সেটা আজকে নিজের জীবনে একটু পরীক্ষা করে দেখতে পারো। এই জিনিসটা যদি আজকে তুমি বুঝতে পারো, তাহলে আমি মনে করি সামনের দিনগুলোতে বই পড়তে চাওয়ার ইচ্ছাটা হয়তো একটু হলেও বাড়বে। সে সাথে একটা ছোট্ট উদাহরণ দিয়ে রাখতে চাই, পৃথিবীতে যত সফল মানুষ আছেন যেমন- বিল গেটস বলো কিংবা ওয়ারেন বাফেট, তারা সবাই একটা কথাই বলেন যে- 'বই পড়ো'। আর আমি নিজেও আগে ভাবতাম যে, বই না পড়লেও তো হয়, ইউটিউবে ভিডিও দেখলেই হয়ে যায়! কিন্তু ইউটিউবের ভিডিও দেখলে তুমি কেবল একটা মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি পাবে। যেমন ধরো, আমার ভিডিও দেখলে কেবল আমার দৃষ্টিভঙ্গিটা তুমি পাচ্ছো। এদিকে আমি যদি বই পড়ি, তখন আমার ভেতরে একটা কল্পনাশক্তি চলতে থাকে। অর্থাৎ আমি যখন একটা বই পড়ছি, তখন আমি নিজের মতো করে কল্পনা করছি; যখন আমি একটা

গল্প পড়ছি, আমি নিজের মতো করে চিন্তা করছি। সুতরাং, আমার কাছে গল্প শোনার থেকে, বই থেকে একটা গল্প পড়া অনেক ভালো। তাই সবার কাছে এটা আমার একটা অনুরোধ- চেষ্টা করে দেখতে পারো, একদিনে পরিবর্তনটা আসবে না, শুরু করতে দোষ কী!

বিনির্মাণ: আমরা বড় হচ্ছি, শিক্ষিত হচ্ছি, বড় বড় জায়গায় নিজেদের অধিষ্ঠিত করছি। একটা পর্যায়ে দেখা যায়, সেই বড় বড় পর্যায়ে গিয়েও আমরা ছোট-বড় বিভিন্ন রকম স্বার্থে অনৈতিক কাজে নিজেদের লিপ্ত করছি, তাহলে আমাদের এই বড় হওয়ার মূল্যবোধটুকু কোথায় থাকলো?

আয়মান সাদিক: পড়ালেখা পারলেই যে মানুষ আসলে শিক্ষিত হয়ে যায়, তা কিন্তু না। রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময় আমরা অনেকেই হয়তোবা দেখতে পাবো এমন অনেক শিক্ষিত মানুষ আছেন যারা এমন অনেক কাজ করেন- যা হয়তো তাদের করার কথা না। এদিকে অনেকে হয়তো অতটা শিক্ষিত না, কিন্তু তাদের মধ্যে হয়তোবা ঐ বিচার বা বিবেকবোধটা আছে। যেমন- সেদিনে ফেসবুকে একটা পোস্ট দেখছিলাম যে, রিকশাওয়ালা মামাদের প্রায়ই আমরা বলে থাকি- এ্যাই খালি যাবি? আমরা কিন্তু অনেক ছোট, অথচ আমরা তুই-তুকারি করি। রিকশাওয়ালা মামারা কিন্তু বলেন- হ্যা মামা, কই যাবেন? সে কিন্তু ঐ সম্মানটা দেয়- 'যাবেন'। সে কিন্তু আমাদের মতো অতো শিক্ষিত না। কিন্তু সম্মানের মাপকাঠি কীভাবে বিচার করতে হয়? সম্মান যে সবাইকে দিতে হয়, সেটা সে জানে। অথচ আমরা এত শিক্ষিত হয়েও সে জিনিসটা জানি না। এক্ষেত্রে আমরা ভাবলাম যে- আমরা তো শিক্ষিত হয়ে গেছি, তাই আমাদের থেকে বড় কাউকে তুই-তুকারি করার অধিকারটা আমাদের আছে। সুতরাং প্রকৃত শিক্ষা কিন্তু ঐসব জায়গাতে। কোনো বিষয়বস্তুকে শুধু একটি সুনির্দিষ্ট কাঠামোতে ফেলে সাধারণ জ্ঞান মুখস্ত করলেই যে আমরা শিক্ষিত হয়ে যাই, তা কিন্তু না। একই ব্যাপার কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়াতেও চলে আসছে। কেননা, এখন সোশ্যাল মিডিয়াতে সবাই সব কিছু শেয়ার করতে পারে। আমার বন্ধু একদিন আমাকে বলছিল- আয়মান, আমরা আসলে শিক্ষিত হবার আগেই ডিজিটাল হয়ে গেছি। যে কারণে দেখা যায় আমাদের আসলে যে কাজ যেভাবে করা দরকার, অনেক সময় সেভাবে আমরা করি না। কিংবা কত কিছু বাদ দিই। এই যে আমরা কথা বলছি, কথা যে কিভাবে বলতে হয়, এই জিনিসটারও কিন্তু একটা আর্ট আছে, সে জিনিসটা আমরা অনেক সময় ভুলে যাই । এই কিছুদিন আগে একটা ভিডিও করেছিলাম 'The Burger Feedback' অর্থাৎ কাউকে কখনো কোনো খারাপ কথা বলতে হলে আগে ভালো কিছু বলে নাও, তারপরে ফিডব্যাকটা দাও অর্থাৎ গঠনমূলক সমালোচনা করো, তারপরে ভালো কিছু একটা বলো। আমার মনে হয় এই বেসিক জিনিসগুলো অর্থাৎ আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, আদর্শের মানদণ্ডগুলো হয়তো অনেক ক্ষেত্রে আমরা চর্চা করি না কিংবা আশেপাশের মানুষগুলোকে কখনো চর্চা করতে দেখিনি। এগুলো হয়তোবা আমাদের কখনো শেখানো হয়নি, যার কারণে আমরা এখনো অনেক পিছিয়ে আছি। তাই আমার কাছে মনে হয়, আমরা যে

যে জায়গাগুলো থেকে এ জিনিসগুলো যারা বুঝি, আমাদের উচিত নিজেদেরকে ঐ কাজগুলোর প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োজিত করা। তোমাকে দেখে যেন অন্তত আরেকজন ঐ কাজগুলো শিখতে পারে। এভাবে সব ভালো কাজের অনুশীলনগুলো যদি আমরা নিজেরাই চর্চা করতে শুরু করি, প্রকৃতপক্ষে আমরা শিক্ষিত হতে পারব ইনশাআল্লাহ ।

বিনির্মাণ: বর্তমান যুগে বাংলাদেশে ডিজিটাল মিডিয়া শিশুদের সৃজনশীলতা বিকাশের পথে কতটুকু সহায়ক বা ক্ষতিকারক মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে বলে আপনি মনে করেন?

আয়মান সাদিক: যেকোনো কিছুরই একটা ভালো দিক বা খারাপ দিক আছে। যেমন- মোবাইলকে অনেকে বলে ভালো, আবার অনেকে বলে খারাপ। এটা ভালো বা খারাপ না, আসলে এটা একটা প্রযুক্তি মাত্র। সোজা কথায় তুমি এটাকে কীভাবে ব্যবহার করছো, তার উপর নির্ভর করবে এই জিনিসটা ভালো নাকি খারাপ। তাই আমার কাছে মনে হয়, ডিজিটাল হচ্ছে দেশ, এটা অবশ্যই ভালো দিক। প্রযুক্তি আমাদেরকে অনেক কিছুর ব্যাপারে সক্ষম করছে। আগে আমাদের যে কাজটি করতে লাগতো ৫ মিনিট, এখন সে কাজ আমরা ১ মিনিটে করে ফেলি। আগে যে দূরত্বে আমাদের কথোপকথন করতে অনেক কষ্ট করতে হতো, এখন আমরা ১ সেকেন্ডেই তা করে ফেলতে পারি। প্রযুক্তির এই স্বয়ংক্রিয় ক্ষমতাটা অবশ্যই ভালো একটি দিক। আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহারের ওপর আসলে নির্ভর করছে এই জিনিসটাকে আমরা কতটুকু নিয়মানুগত করতে পারব। সুতরাং প্রযুক্তির অগ্রগতি ও প্রসারতা অবশ্যই ভালো একটা দিক। আমাদের আসলে শেখানো উচিত এই প্রসারতাকে আমরা কিভাবে ভালো কাজে নিযুক্ত করতে পারি।

বিনির্মাণ: আপনার চোখে শিক্ষাক্ষেত্রে গবেষণার গুরুত্ব এবং বর্তমান প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের প্রসারতা কতখানি প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন?

আয়মান সাদিক: অবশ্যই অনেক বেশি প্রয়োজন। যে কোনো একটা নতুন কাজ করতে গেলে আমাদের অবশ্যই গবেষণা করতে হবে, যার কারণে আমরা বাইরের দেশগুলো থেকে অনেক পিছিয়ে আছি। কোনো জিনিস কিন্তু আমাদের দেশে নতুন করে তৈরি হয় না। বাইরের দেশে গবেষণা করে আগে তারা বের করে, আমরা কেবল সেটাকে অনুসরণ করি। তাই এটার উল্টোটা যদি করতে হয়, সেক্ষেত্রে এটার শুরুটা তো হয় গবেষণা থেকেই। সুতরাং R&D (Research and Development)-টা এক্ষেত্রে অনেক প্রয়োজন। বাংলাদেশে এখনও আমাদের R&D অনেক কম। আমরা এখনও কেবল বাইরের দেশের জিনিসগুলোকে অনুসরণ করি। ওরা একটা ভালো কিছু করলে আমরা কেবল সেগুলোকে আমাদের দেশে প্রসার করি। তাই আমি এমন একটা সময়ের স্বপ্ন দেখি, যেখানে হয়তোবা আমাদের দেশের R&D তে আমরা এমন কিছু একটা করব, যেটা হয়তো বাইরের দেশগুলো তাদের দেশে প্রসার করবে। এমন একটা স্বপ্ন তো আছে অবশ্যই।